মণিমহেশ

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মণিমহেশ

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত : ১৩৭৮

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রা: লি:
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩

॥ ১ ॥

ছেলেবেলায় শেখা,—পঞ্চনদের দেশ, নাম তাই পঞ্জাব। ঝিলাম, চিনাব, রাভি, বিয়াস্ ও সাটলেজ। ভারতীয় নাম,—বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা ও শতদ্রু। হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আপন পথ বেয়ে নেমে আসে নদীগুলি।

শতদ্রুর দীর্ঘতম পথযাত্রা। জন্ম তার সুদূর মানস-সরোবর—রাক্ষসতাল অঞ্চলে—, হিমালয়ের পরপারে তিব্বতে। বিপাশা, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা যেন একই বাড়ির তিনটি মেয়ে। জন্ম তাদের হিমালয়ের যে-অংশে, এখন তার নাম হয়েছে হিমাচল প্রদেশ। বিতস্তা বা ঝিলামের জন্মভূমি কাশ্মীর।

নদীগুলির মধ্যে সবচেয়ে পূর্বদিকে শতদ্রু। পাঞ্জাবে নেমে এসে বিপাশা বা বিয়াস্ মিলিত হয় শতদ্রুর সঙ্গে। জলভারে স্ফীত হয়ে সাট্লেজ এগিয়ে চলে পশ্চিম পাকিস্তানে।

অপরদিকে, সবচেয়ে পশ্চিমে নামে কাশ্মীর-সুন্দরী ঝিলাম। চন্দ্রভাগাও হিমাচলপ্রদেশের লাহুল-স্পিতি অঞ্চল থেকে ঘুরে এসে প্রবেশ করে জম্মু-কাশ্মীরে। পরে পাকিস্তানে চন্দ্রভাগা ও বিতস্তার মিলন ঘটে। চন্দ্রভাগা আরও এগিয়ে চলেন। সঙ্গ পান ইরাবতীর। অপর দিক থেকে শতদ্রুও নেমে আসেন। পাকিস্তানের আরও দক্ষিণে পৌঁছে শতদ্রু ও চন্দ্রভাগার দুই ধারার সংযোগ হয়। পঞ্চনদীর জলভারে এইভাবে সম্মিলিত হয়ে নাম পায়—পঞ্চনদ। মাইল পঞ্চাশও যেতে হয় না। কৈলাস-মানস-সরোবরের সমীপবর্তী অঞ্চল থেকে উঠে হিমালয় পরিক্রমা শেষ করে বিরাট নদ সিন্ধু এসে হাজির হন। পঞ্চনদ ইনডাস-এর জলে হারিয়ে যায়। ইনডাসও যাত্রা সাঙ্গ করে আরব সাগরে। পশ্চিমে সিন্ধু, পূর্বে শতদ্রু,—যেন দীর্ঘ দুই বাহু মেলে অন্তর্বর্তী সব নদ-নদীর জলভার বুকে ধরে এক বিশাল নদ আত্মোৎসর্গ করে রত্নাকরের সুনীল বারিধিতে।

হিমালয়ের ধ্যানগম্ভীর স্তব্ধ মৌন প্রশান্ত রূপ। তারই বিরাট আবেষ্টনীর মধ্যে এই নদীগুলির হাস্যমুখর উচ্ছল চঞ্চল বাল্যজীবনের কাহিনী অতীব মনোহর।

ইরাবতীর ধারাপথ ধরে হিমালয়ে কয়েকদিন কাটানোর সুযোগ আসে। গন্তব্য প্রদেশে —মণিমহেশ। হিমগিরির তুষার-অঞ্চলে মনোমুগ্ধকর হ্রদ। তারই তীরে মণিমহেশ গিরিশিখর। কৈলাস শিখরেরই মতন স্বয়ম্ভু জ্যোতির্ময় লিঙ্গরূপী। স্থানীয় লোকেরা তার নাম দেয়, চম্বা-কৈলাস।

সেই তীর্থ-পথের এই কাহিনী।

॥ ২ ॥

পাঠানকোট স্টেশন। কলকাতা থেকে দীর্ঘ রেলপথ। হিমালয়ের পশ্চিম রাজ্যে প্রবেশ করার যেন সিংহদ্বার। বাস্, মোটর চলাচলের সুপ্রশস্ত রাজপথ। যাত্রী-ভরা যানবাহন দিকে দিকে ছুটে চলে। হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে। পঞ্চনদের বাল্যলীলা-নিকেতনে।

উত্তর-পশ্চিমে জম্মু হয়ে কাশ্মীরে। ঝিলাম চিনাবের দেশে।

পূবের দিকে খানিক গিয়ে এক শাখা-পথ ঘুরে যায় উত্তরে হিমালয়ের পানে। সেদিকে শৌখিন, অথচ শান্ত হিল্ স্টেশন—ডালহাউসি। তারই নীচে রাভি বা ইরাবতীর উপত্যকা। চম্বাভ্যালি।

আরও পূবে—ডালহাউসির পথ ছাড়িয়ে—বাস্ রাস্তা এগিয়ে যায়। আবার এক শাখাপথ হিমালয়ে প্রবেশ করে। সেদিকে সুন্দর পাহাড় হর ধরম্শালা।

ধরম্শালার পথ না ধরে আরও পূর্বাঞ্চলে এগিয়ে গেলে কাংড়ার উপত্যকা। তারপর কুলুভ্যালি। সেখানে বিয়াস্ বা বিপাশার যেন হিমালয়-রাজভবনে নাচের আসর। নীলশাড়ী পরে রূপবতী কন্যা নেমে আসেন তরঙ্গ-নূপুরে মধুর ঝঙ্কার তুলে।

বাস্ পথ ছড়িয়ে পড়ে। নূতন নূতন পথ জাগে। কুলুভ্যালির মণ্ডী ও আউট থেকে এগিয়ে চলে আরও পূর্বদিকে। পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করে। সিমলার হিল্ স্টেশনে এসে হাঁপ ছাড়ে। সেই পথে পড়ে শতদ্রু বা সাটলেজ নদ। ঘোলাটে জল। কেমন যেন রুক্ষ রূপ। দেখে মনে হয়, শাবল কাঁধে জোয়ান চলে, কাদামাখা গায়ে, আন্মনে, আপন কাজে।

দুর্গম হিমালয়ের নিভৃত গোপনপুরে পাহাড়ী নদ-নদীর কতো বিচিত্র বিভিন্ন রূপ!

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২।

ট্রেন ছেড়ে পাঠানকোটে নামি। একাই আসার কথা। কিন্তু যাত্রার মুখে হঠাৎ এসে যোগ দেন এক তরুণ সঙ্গী। নাম তার হিমাদ্রি। হিমালয়ের সঙ্গে সবে তার পরিচয় শুরু হয়েছে। বদরীনাথ ও হেমকুণ্ড ঘুরে আনন্দে মন মেতেছে। হিমালয়ের পথ চলার নেশা রক্তে লেগেছে।

এসে বলে, আমিও যাবো। পূজোর ছুটির সঙ্গে আরও কদিন অফিস থেকে ছুটি নিচ্ছি। মাসখানেক ঘোরা যাবে। শুনে জানাই, কিন্তু আমার ত সময়ের টানাটানি নেই, কতোদিন ওদিকে কাটাব, কি জানি। চম্বাভ্যালি দেখা নেই, সেইদিকে প্রথম যাওয়া। মণিমহেশ এতোদিনে টান্লেন মনে হয়। তারপর—কুলুর দিকে। পুরানো হলেও আবার যাওয়া। সেদিকের বন্ধুরা ডাকছেন। সেখান থেকে পাহাড়-পথে সিম্লা। সিম্লা থেকে পাহাড়ের হাঁটা-পথে মুসৌরি। তারপর ওদিকে পৌঁছুলে আবার গাড়োয়ালে যেতেই হয়। কেদারনাথজীর পুনর্দর্শন না করে যাত্রা সাঙ্গ করা ত চলে না। তাই পাঠানকোটে ট্রেন ছেড়ে ফেরবার ট্রেন ধরবার কথা দেরাদুন বা হরিদ্বারে।

হিমাদ্রি দমে না। বলে, এর মধ্যে যতোখানি পারি সঙ্গে ঘুরব। অফিস থেকে ছুটি এর বেশি দেবে না।

হিমাদ্রির বয়স বছর পঁচিশ। উৎসাহী, করিতকর্মা। কিন্তু জানি, চার-পাঁচ বছর চাকরি-জীবনে ঢুকেও এখনও শিশুসুলভ সব স্বভাব ছাড়তে পারে নি। মাঝে মাঝে হঠাৎ রেগে যায়। তখন গুম্ হয়ে বসে থাকে। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বলে, ক্ষিদে নেই, খাবো না।—অন্তরঙ্গ বন্ধুরা ঠাট্টা করে। নাম দেয়, খোকাবাবু। সে আরও রাগে।

বন্ধুরা সরে আসে, বলে, এখন আর ঘাঁটাস্নে ওকে। একটু পরেই আবার ঠিক হয়ে যাবে।

হয়ও তাই। যেন হঠাৎ-ওঠা ঝড় হঠাৎ থামে।

তাকে বলি, সঙ্গে যাবে, চলো। কিন্তু, দুটি শর্ত। পথে যখন যা বলব মেনে নিতে হবে।

অন্যায় কিছু বলব না, সে-বিশ্বাস রেখো। দ্বিতীয় কথা,—রাগ করতে পারবে না, কারও ওপর, যে কদিন আমার সঙ্গে থাকবে।

সে চোখ কুঁচকে বলে, বাঃ! তা কি করে হয়? রাগের কারণ হলে রাগ হবে না?

হেসে জানাই, সেই কথাই ত বলছি। রাগের কারণ না থাকলে রাগ ত হবেই না। কিন্তু কারণ ঘটলেও—অর্থাৎ তোমার মতে—তখনও রাগ করা চলবে না। সে সময়ে মনে করবে, এই ক'দিনের জন্যে যে প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছ, তারই পরীক্ষা চলছে, তাই হাসিমুখে মেজাজ ঠিক রাখতেই হবে।

এবার সে চিন্তিত হয়, তাই ত! এটা যে ভীষণ পরীক্ষা! কথা এখন দিতে পারি। রাখার চেষ্টাও করতে পারি। কিন্তু মনের ওপর অতোখানি জোর! সে কি থাকবে? ফট্ করে যদি রেগে যাই?

আশ্বস্ত করি, চেষ্টা ত তুমি কোরো, তখন দেখবে, যে-কোন কারণেই হোক্ না কেন, কারও ওপর রাগ না করে হিমালয়ের পথে যদি ঘুরে আসতে পার,—মনের সে কী গভীর আনন্দ। গঙ্গায় অবগাহন স্নানে যেমন তৃপ্তি। এই কয়টা দিনের কথা ত। বরং এক কাজ কোরো, নেহাৎ যদি কখনো রাগ এসেই যায়, আমার ওপরই কোরো, সে-রাগের ভার আমি নিতে পারব।

সে হেসে ফেলে। বলে, বেশ বললেন বটে আপনি! আপনার ওপর রাগ,—সে কি করে হতে পারে?—আচ্ছা, ঠিক রইলো এই কথা।

অতএব, সে-ও সঙ্গে আসে।

॥ ৩ ॥

দেশ-বিদেশে—বিশেষ করে বনে জঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানোর মহান্ লাভ,—কতো জায়গায় কতো মানুষের সঙ্গে নিত্য নূতন যোগাযোগ। অচেনা, তবুও যেন পরম আত্মীয়। কতো দিনের যেন দীর্ঘ পরিচয়। পথের আশেপাশে যেন আপন ঘর পাতা। বন-বিভাগের অফিসার, কর্মচারী—শহরের সদর দপ্তরে নয়, বনের নির্জন এলাকায়—সকলেই যেন আপন জন।

গাড়োয়ালী এক বন্ধু তখন মণ্ডির ফরেস্ট অফিসার। নিজে থেকেই তিনি লিখে দেন্ চম্বার দপ্তরে। পাঠানকোট স্টেশনে নেমে দেখি, সবুজ ইউনিফর্ম পরা ফরেস্ট গার্ড। যেন, গাছপাতার সবুজ রঙ্ মেখে অরণ্যদূত স্বাগত জানায়। এগিয়ে এসে বলে, চম্বার বাস্ এখনি ছাড়ে, সীট্ ঠিক করে রাখা আছে।

টিকিট কেটে তখনি উঠে পড়ি।

পাঠানকোট থেকে চম্বা বাস্ পথে ৭৬ মাইল।

ডালহাউসি পর্যন্ত আমার চেনা পথ। সমতল ভূমি ছেড়ে এসে প্রথমে সেই ছোট ছোট পাহাড়ের শ্রেণী। পিছনে মাথা তুলে গিরিরাজ হিমালয়—, ধওলাধর। এঁকে বেঁকে বাস্ ওঠে। পুরানো পথ অতীত স্মৃতি মনে টেনে আনে।

ডালহাউসির পাঁচ মাইল আগে রাণীক্ষেত। ডালহাউসির পথ ছেড়ে চম্বার বাস্

বাঁদিকে নতুন পথ ধরে এগিয়ে চলে। ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে থাকে নীচের দিকে ইরাবতীর উপত্যকায়।

বনের মধ্যে দিয়ে পথ। মাঝে মাঝে দু'একটা গ্রাম। বাস্ ছুটে চলে। হিমালয়ের গাছপালার —পাইনের স্নিগ্ধ সুবাস। প্রাণ জুড়ানো শীতল বায়ু। দেহ মন সজীব হয়ে ওঠে। চরণ চঞ্চল হয়। সভ্যতার যান ছেড়ে পায়ে হেঁটে চলার আনন্দলাভের আশায় মন উন্মুখ হয়ে থাকে। গিরিদেবতা যেন জানতে পেরে তখনি সুযোগ দেন।

হঠাৎ বাস্ থামে। পাহাড়ের প্রকাণ্ড এক অংশ ক'দিন আগে ধ্বসে পড়ে বাস্-পথ বন্ধ। মেরামতের কাজ চলে। প্রায় দু'মাইল ব্যবধান। ওদিকে আবার বাস্ পাওয়া যাবে, শুনি। পায়ে হাঁটার আকাঙ্ক্ষা এবার দুর্ভাবনা জাগায়। মালপত্রও তো নিয়ে যেতে হবে? হিমাদ্রি ছোটাছুটি করে লোক যোগাড় করে। বলে, একে নিয়ে আমি এগিয়ে যাই, ও-দিকেই বাস্-এ আবার জায়গা রাখতে হবে। ধীরে-সুস্থে আপনি আসুন। এ-লোকটা কত চায় জানেন? পাঠানকোট থেকে চম্বার যা বাস্ ভাড়া, তার চেয়ে বেশি! চলুক ত, তখন দেখব ওদিকে গিয়ে।

মনে করিয়ে দিই, রাগারাগি না হয় যেন দেখো। হিমাদ্রি হাসে।

নিশ্চিন্ত মনে আমি চলি।

ওদিকে বাস্ ধরে আবার পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে চলা। নীচে দেখা যায়, ইরাবতীর উপত্যকা। অপর পাড়ে উঁচু পাহাড়। রুক্ষ, শুষ্ক। কচিৎ কোথাও কয়েকটা গাছের সারি। সেই পাহাড়ের পায়ের কাছে, ইরাবতীর দক্ষিণ তীরে চম্বা শহর।

নদীর খানিক উপরে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। বহু ঘর বাড়ী। যেন সাজানো গোছানো সুন্দর খেলাঘরের শহর। নীচে একদিক থেকে নদীর সুনীল ধারা পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে পথ করে এগিয়ে আসে ; শহরের দুই দিক ঘিরে আপন মনে চলে যায় অপর দিকের পাহাড় ভেদ করে। নীচে নদীর উপর সুন্দর লোহার পুল। এপারেও খান কয়েক বাড়ী ঘর, স্তরে স্তরে পাহাড়ের গায়ে চাষের ক্ষেত। ওপর থেকে দেখা যায়, পুল পার হয়ে বাস্-পথ ঘুরে শহরে ওঠে।

এপারের পাহাড়ের উপর থেকে আরও একটা পথ এসে বাস্-পথে মেশে। ডালহাউসি থেকে খাজিহার হয়ে সে পথ নামে চম্বার উপত্যকায়। ঐ পথে ডালহাউসি থেকে চম্বার দূরত্ব প্রায় কুড়ি। এখন জীপও চলে সেই পথে।

ইরাবতীর কূলে পাহাড়ে ঘেরা চম্বা শহর উপর থেকে রমণীয় দেখায়। পাহাড়ের কোলে ঘুমন্ত প্রশান্ত শিশু, নদীর নীলধারা যেন তার কণ্ঠমালা।

॥ ৪ ॥

রাভিভিউ P. W. D. বাংলো। সেইখানে উঠি। পুরানো বড় বাড়ী। নদীর অল্প উপরে শান্ত মনোরম পরিবেশ।

মণিমহেশ-পথের খবর জানবার জন্য ফরেস্ট অফিসারের বাড়ী গিয়ে দেখা করি। সাদর অভ্যর্থনা করে আলাপ করেন। শুনে আশ্চর্য হই, চম্বা বন-বিভাগের দপ্তর চম্বাতে

নয়। ডালহাউসিতে। তাঁকে বলি, খবরটা জানা ছিল না। ডালহাউসি ঘুরে পারমিট নিয়ে স্বচ্ছন্দে আসতে পারতাম।

তিনি বলেন, তাতে ক্ষতি নেই। কাল টেলিফোনে সেখানে জানিয়ে দেব, আপনারা এখানে এসে গেছেন। পথে রেঞ্জারদের কাছে আপনাদের যাওয়ার খবর পাঠানো হয়েছে, আমি জানি। আপনারা রওনা হবার ব্যবস্থা করুন। দুর্ঘেটির বাংলোটা P. W. D.-র। কাল এখানে তাদের অফিসে গিয়ে পারমিট নিয়ে নেবেন যেন।

চা বিস্কুট খাওয়ান। অনেকক্ষণ বসে হিমালয়-পথের নানান গল্প শুনি।

চম্বা শহর দেখতে বড় হলেও ঘুরতে বেশি সময় লাগে না। শহরের মাঝখানে বিরাট ময়দান। স্থানীয় নাম চৌগান। মাঠ ঘিরে রাস্তা। নদীর দিকেও পাহাড়ের কোলে বড় বড় বাড়ী, সরকারী দপ্তর, দোকানপাটও। আরও একটু উপরে রাজপ্রাসাদ। এক পাশে রেফিউজিদের সারি সারি স্টল। পরিচ্ছন্ন শহর। প্রায় তিন হাজার ফুট উচ্চতা। তাই গরমও নেই, শীতও তেমন নেই।

ইংরেজ রাজত্বকালে চম্বা করদ রাজ্য ছিল। এই চম্বা শহর ছিল তার রাজধানী। চম্বার স্বাধীন রাজাদের প্রাচীন রাজধানী ভারমোর। হিমালয় পর্বত প্রদেশের আরও অন্তরালে অনেকখানি উপরে। মণিমহেশের পথে পড়ে। ইরাবতীর তীরে এই সুরম্য সমতল উপত্যকা এক রাজকুমারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কন্যার উৎসাহে রাজা সহিল বর্মা এইখানে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন—খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে। রাজকুমারীর নাম ছিল চম্পাবতী, এই রাজধানীর নামও হয় চম্পা, ক্রমে লোকমুখে চম্বা।

চম্বাতে প্রাচীন মন্দির আছে কয়েকটি। প্রাসাদের নিকটে পাশাপাশি ছয়টি। লক্ষ্মীনারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ, চন্দ্রগুপ্ত, শিব, পঞ্চমুখ-শিবলিঙ্গ, গৌরীশঙ্কর ও লক্ষ্মী-দামোদর। মন্দিরগুলিতে অতি সুন্দর সূক্ষ্ম কারুকার্য। লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির সবচেয়ে প্রাচীন—খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর।

এই সব মন্দির, বিগ্রহ ও শহর স্থাপনা নিয়ে নানান মনোহর ও করুণ কাহিনীর প্রচলন আছে। তাই স্মরণ করে এখনও চম্বায় বিভিন্ন মেলা বসে।

প্রবাদ, রাজকুমারী চম্পাবতী রূপবতী বিদুষী মহিলা ছিলেন। শাস্ত্রাদি আলোচনায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। সেই উদ্দেশ্যে এক মহাত্মার কাছে তিনি প্রতিদিন যেতেন। কন্যার এই নিত্য যাতায়াতে পিতার সন্দেহ জাগে। একদিন হঠাৎ গোপনে সেই মহাত্মার কুটিরে রাজা গিয়ে হাজির হন। কিন্তু মহাত্মা বা কন্যার কারও সাক্ষাৎ পান না। দৈববাণী শোনেন, এই অন্যায় সন্দেহের পাপের ফলে তিনি আর কখনো কন্যার দেখা পাবেন না। অনুতপ্ত শোকাতুর রাজা কন্যার দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে চম্বাতে এক মন্দির স্থাপন করেন। এখনও সেখানে নিত্য পূজা হয়। বৈশাখ মাসে এক মেলাও বসে।

চম্বাতে নতুন রাজধানী নির্মাণ সম্পর্কেও আর এক করুণ কাহিনীর প্রচলন আছে। নতুন শহর। কিন্তু জলাভাব। পাহাড়ের উপর থেকে নল কেটে জল আনার ব্যবস্থা হয়। তবু জল আসে না। স্বপ্নাদেশ হয়, মহারাণী বা তাঁর কোন পুত্র সেই নালায় প্রাণোৎসর্গ করলে জল নামবে। মহারাণী স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করেন। জলের প্রবাহও বইতে থাকে। মহারাণীর নাম ছিল নেন্না দেবী বা সুনয়না দেবী। তাঁরও স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। চৈত্রমাসের শেষভাগে সেখানেও মেলা বসে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে

ও রমণীদের নিয়ে এই মেলা। নাম হয়, সুহি মেলা।

লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির স্থাপনা নিয়েও আর এক ঘটনার প্রবাদ প্রচলিত। রাজা সহিল বর্মা নিঃসন্তান ছিলেন। তখন রাজার রাজধানী ভারমোরে। একদিন চুরাশীজন মহাত্মা সেখানে উপস্থিত হন। সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁরা সন্তান লাভের বরদান করেন। রাজার দশ পুত্র ও এক কন্যা হয়। সেই কন্যাই চম্পাবতী। রাজা সন্ন্যাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চুরাশীটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কন্যার অভিলাষ অনুযায়ী চম্বা শহরে নতুন রাজধানী গড়েন। লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরও ওঠে। দেবতার বিগ্রহ নির্মাণের জন্যে পাথরের সন্ধানে রাজকুমাররা যান। বিন্ধ্যগিরিতে ডাকাতের হাতে নয় রাজকুমারের প্রাণনাশ হয়। অবশিষ্ট একমাত্র পুত্র সেই পাথর এনে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে রাজা সহিল বর্মা সেই কুমার যুগাকরের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের নিকটে চর্পটনাথ নামে এক যোগীরও মন্দির আছে। চম্বাবাসীরা তাঁর পূজা করে নানান ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। শুনি পোলো খেলায় চম্বার টিম্ ভারতে সুনাম অর্জন করেছে।

এখন স্বাধীন ভারতে চম্বা হিমাচল প্রদেশের একটি জেলা মাত্র। ৩১২৫ বর্গমাইল বিস্তীর্ণ। জনসংখ্যা ২,১০,০০০। হিমালয়ের মধ্যে দু হাজার ফুট থেকে একুশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে এর বিস্তৃতি। জেলার প্রধান শহরও চম্বা।

চম্বারাজের রাজ্য গিয়েছে। তাই, রাজপ্রাসাদও শ্রীহীন। চাকচিক্য, ধনমর্যাদা কোন কিছুই নেই। রাজবাটীতে এখন স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী। চম্বার প্রাচীন গরিমা এখন মিউজিয়ামের মধ্যে সযত্নে রক্ষা পায়। চম্বার শেষ রাজা ভুরি সিং এই প্রতিষ্ঠান প্রথম গড়ে তোলেন, তাই তাঁরই নামে এর নামকরণ। কাংড়া, বসৌলী ও পাহাড়ী চিত্রকলার অতি-সুন্দর অনেকগুলি নিদর্শন এখানে দেখা যায়।

মিউজিয়ামের নিকটেই হাসপাতাল।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে শহর দেখা হয়। তারই এক ফাঁকে P. W. D.-র দপ্তরে গিয়ে দুর্ঘেটির বাংলোতে থাকবার পারমিট্‌ও আনি। সেখানে খবর পাওয়া যায়, আজকাল নাকি চম্বা থেকে ভারমোর পর্যন্ত জীপ চলে। ৪৪ মাইল পথ। একদিনেই পৌঁছে দেয়। সেখান থেকে মণিমহেশ মাত্র দুদিন লাগে হেঁটে যেতে। খবর শুনে হিমাদ্রি উৎফুল্ল হয়। বলে, তাহলে এদিকে দুদিন বেঁচে যাবে, ওদিকে আরও কোথাও যাওয়া যাবে।

জীপের লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিক করে দিতে দপ্তরের এক কর্মচারী আগ্রহ দেখান। দেড়'শ টাকা ভাড়া চায় শুনে আর কোন কথা তুলি না। মনে মনে স্বস্তি বোধ করি। পায়ে হেঁটে চলার আশায় মন আনচান করে।

পরে, ঐ পথে হেঁটে যেতে দেখি, চম্বা শহরে বসে এ-সব অফিসাররা সঠিক কোন খবরই রাখেন না। ভারমোর পর্যন্ত তখনও জীপ যাওয়ার রাস্তা তৈরী হয়নি। তবে চম্বা থেকে বাস্-এ ২২ মাইল দূরে গেহেরা পর্যন্ত ওপথে যাওয়া যায়। অতএব খোঁজ-খবর নিয়ে স্থির হয়, পরের দিন ভোরের বাস্-এ রওনা হতে হবে। পোর্টার এখন এখানে পাওয়া সম্ভব নয়। পথে করে নিতে হবে। P. W. D.-র এক কর্মচারী সঙ্গে গিয়ে বাস্-এর সীট রিজার্ভ করিয়ে দেন। সাগ্রহে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে চলেন। চা ও ভুট্টা খাওয়ান। অতিথিসেবায় নিজে আনন্দ পান, আমরাও তৃপ্তি পাই।

॥ ৫ ॥

ভোর ৫টা ১৫তে বাস্ ছাড়ে। চারটের মধ্যে উঠে তৈরি হই। দেখি মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে।

হিমাদ্রি চিন্তিত হয়, তাই ত! বাস স্ট্যাণ্ডে মাল নিয়ে যাবার জন্যে কুলিটার সাড়ে চারটেতে আসবার কথা। এই জলে আসবে ত?

বলি, ভেবে লাভ কি? দেখা যাক, আসে কি না। আসে ভাল, না এলে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বাস্ স্ট্যাণ্ড ত কাছেই।

কুলি আসে না। বর্ষাতি জড়িয়ে হিমাদ্রি বাস্ স্ট্যাণ্ডে যায়। ঐ জলে কেউই আসতে রাজি হয় না। অবশেষে টিকিট কাউণ্টারের লোকটির সাহায্যে একজনকে যোগাড় করে।

মাল সামান্যই। দুজনের অল্প বিছানা। কয়েকটা জামা কাপড়। বিস্কুট ইত্যাদি কিছু খাবার। বাকি মালপত্র ডাকবাংলোর চৌকিদারের কাছে রেখে যাওয়া হয়। দিন সাতেকের ত ব্যাপার।

বৃষ্টির জন্যে বাস্ ছাড়তে দেরি হয়। একটানা বৃষ্টি চলে। কখন কমে, কখন বা প্রচণ্ড বেগে নামে।

বাস্-এর মধ্যে বসে হিমাদ্রি বিষণ্ণ বদনে কি যেন ভাবে। জিজ্ঞাসা করি। বলে, এই দারুণ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল! ওপরে গিয়ে ত কিছুই দেখা যাবে না!

বলি, ভেবে লাভ কি বলো? আমার কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাস, মণিমহেশ পরিষ্কার দর্শন দেবেনই নিশ্চয়। হিমালয়ের করুণা অশেষ জেনো। সেপ্টেম্বরের এ-সময়ে নীচে বৃষ্টি পাওয়া, আশ্চর্য কি?

বাস্ চলতে থাকে। ইরাবতীর ধার দিয়ে। নদীর স্ফটিক স্বচ্ছ নীল জল বৃষ্টির ফলে ঘোলাটে হয়ে ওঠে। মাইল ১৪ যাবার পর বাস্ থেমে যায়। পথের নিকটে খানকয়েক ঘর। নদীর উপর পারাপারের লোহার ঝোলা পুল। জায়গার নাম বাগ্গা। পুলের উপর বাস্ চলে না। অপর পারে আর একটা বাস্ ধরতে হবে।

ভাগ্যক্রমে বৃষ্টিও থামে। ঝোলা নিয়ে সেই বাস্-এ ওঠা। হিমাদ্রি আবার তাড়াতাড়ি গিয়ে জায়গা দখল করে।

নদীর অপর পার দিয়ে আরও আট মাইল গিয়ে গেহেরা। বেলা সাড়ে এগারোটায় পৌঁছে যাই। কতকগুলি দোকানঘর, সরাইখানা। একটা পাহাড়ী নদী এসে ইরাবতীর সঙ্গে মেশে। পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে বাড়ী। ডাকবাংলো। খানিক উঁচুতে বনবিভাগের নতুন ছোট বাড়ী,—সারি সারি তিনখানা ঘর। সেইখানে উঠি। তাড়াতাড়ি দুপুরের কিছু আহারেরও ব্যবস্থা হয়। সঙ্গের মালপত্র নিয়ে যাবার জন্যে চৌকিদার একজন লোক ঠিক করে দেয়। দশ টাকা নেবে। ভারমোর পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।

এখান থেকে মাত্র ছয় মাইল দূরে দুর্ঘেটি। সেখানে আজ রাত কাটানোর কথা। দুর্ঘেটি থেকে কাল ১৫।১৬ মাইল গিয়ে ভারমোর। ভারমোর থেকে মণিমহেশ মাইল একুশ,—দুই দিনের পথ।

হিমাদ্রি বলে, এ আর কি? তিনদিনেই তাহ'লে ত পৌঁছে যাচ্ছি।

গেহেরাতে বেশিক্ষণ বিশ্রাম করতে মন চায় না। সামনে হাঁটাপথ। ছয় মাইল মাত্র হলেও আজকের মত পথচলা শেষ করে বিশ্রামস্থানে পৌঁছানোর স্বস্তি আছে। তাছাড়া, আকাশ মেঘে ভরা। আবার কখন বৃষ্টি নামে, কে জানে! তাড়াতাড়ি রওনা হই।

পথচলা শুরু হয়। মনে গভীর আনন্দ। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি। নদীর উপত্যকা ধরে পথ চলে। জলধারার মত এঁকেবেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে। চড়াই উৎরাই নেই। মামুলী পাহাড়ী পথ। পাহাড়ের গায়ে গাছপালা কম। ঝুরঝুরে মাটি, কাঁকর, ছোটবড় নানা আকারের পাথর। দু'দিকের পাহাড় খাড়া ওঠে। Gorge-এর মধ্যে দিয়ে নদী নামে।

নদী, পাহাড়, শান্ত প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরের সুর মিলিয়ে আপনমনে চলতে থাকি।

দুর্ঘেটি পৌঁছবার মাইলখানেক আগে আবার বৃষ্টি নামে। জলের মধ্যে বর্ষাতি গায়ে এগিয়ে যাই। ছাতা খোলা দুষ্কর। বাতাসের জোরে উড়িয়ে নিয়ে যায়। মুখে চোখে জলের ঝাপটা লাগে। পথের উপর দিয়েও জলের ধারা বহে চলে। এভাবে পথচলারও আনন্দ আছে। কিন্তু পথে একটিও জনপ্রাণী দেখি না। হিমাদ্রিকে বলি, এদিকে লোকালয় নেই নাকি?

দুর্ঘেটি যখন পৌঁছই তখন আরও জোরে জল নামে।

নদী থেকে ৫০।৬০ ফুট উপরে সুন্দর ডাকবাংলো। পি. ডবলিউ ডি-র। নদীর দিকে বারান্দা। বারান্দায় উঠে বর্ষাতি খুলে মাথা-মুখের জল ঝাড়ি। পাশাপাশি দুখানা ঘর। কয়েক হাত দূরে রান্নাবাড়ী। চৌকিদার আসে। একটা ঘর খুলে দেয়। পাশের ঘরেও লোক। সাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসেন। স্থানীয় অফিসার। সবে নতুন এখানে এসেছেন। আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন, কি করে এলেন?

কেন? হেঁটে।

এই বৃষ্টিতে!

পথে জল নেমে গেল। ছাতা বর্ষাতি রয়েছে। তাছাড়া, পাহাড়ে বৃষ্টি পাওয়ায় আশ্চর্য কি?

তিনি উদ্বেগ দেখিয়ে বলেন, কাজটা মোটেই ভাল করেন নি। পাহাড়ে বৃষ্টি যখন তখন আসে, ঠিকই। জলের মধ্যে পথও হাঁটতে হয়, দরকার থাকলে। কিন্তু যে-পথে এলেন, এদিকে বৃষ্টি হলেই ভীষণ পাথর গড়িয়ে পড়ে, ধ্বস নামে। তাই বৃষ্টি নামলে এ-পথে লোক চলে না।

আমি বলি, যাক্, ভাল ভাবে পৌঁছে গেছি। ভাগ্যে খবরটা জানা ছিল না, নইলে আজ আর দুর্ঘেটি পৌঁছানো হোত না। এ-বৃষ্টি আজ থামবার নয়। আরও ঘনঘটা করে আসছে।

কথা শেষ হতে না হতেই কাছাকাছি কোথায় পাহাড়ের ধ্বস্ নামার বিকট শব্দ ওঠে।

অফিসার চমকে ওঠেন, শুনছেন? খুব বেঁচে গেছেন আপনারা।

ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। নাম বি. এন. মেহেতো। চা খেতে খেতে গল্প হয়, কোথায় চলেছি।

বাইরে একটানা ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি চলতে থাকে। মেঘগর্জন ওঠে। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকায়। ইরাবতীর জলস্রোতের প্রচণ্ড শব্দ শোনা যায়।

॥ ৬ ॥

গেহেরাতে হিমাদ্রি হাঁটাপথের দূরত্ব শুনে বলে, তিন দিনেই ত মণিমহেশ পৌঁছে যাব।

কিন্তু, তিন রাত্রি কেটে যায় এই দুর্ঘেটিতেই।

আসার পর সেই যে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে, সারারাত চলতেই থাকে। সকালে উঠে দেখা যায়, থামবার কোনই লক্ষণ নেই। চারিদিক আবছা আঁধার। প্রচণ্ড বেগে তীক্ষ্ণ তীরের মত বৃষ্টির ধারা পাহাড়ের বুকে বেঁধে। কল্‌কল শব্দে চতুর্দিকে জলের তোড় নামে। নদীর বুকে অসংখ্য বুদ্বুদ ওঠে। যেন ফুটন্ত জল ছুটে চলে। ইরাবতীকে দেখে চেনবারই উপায় নেই। নীলবসনা উচ্ছল হাস্যময়ী অপরূপ সুন্দরীর মৃদু মন্দ চরণ ফেলে চলা নয়। উন্মাদিনী ভৈরবী মূর্তি! গৈরিকবসনা। সহস্র করে অগণিত শাণিত অস্ত্র। পাহাড়ের বুকে নিষ্ঠুর আঘাত হেনে কলহাস্যে ছুটে চলে। জলস্রোতেরও প্রচণ্ড বেগ। নদীর বুকে যে পাথরগুলি নিশ্চিন্তমনে আশ্রয় নিয়ে মাথা তুলে জেগে ছিল, যাদের ঘিরে ছোট ছোট ঢেউগুলি সাদা ফেনার মালা পরে খেলা করত, আজ আর সেগুলি দেখাই যায় না। জলের তলে অদৃশ্য হয়েছে। চারিদিকে ঘূর্ণিজল। চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে চলে। ডালপালা, চেরা কাঠ, গাছের গুঁড়ি,—এমন কি ডালপালাসমেত প্রকাণ্ড গাছও জলের তোড়ে ভেসে আসে। স্রোতের ঘূর্ণির মুখে ক্ষণিক ঘুরে-ফিরে নীচে নেমে চলে—চক্ষের পলকে। যেন, খড়কে কাটি! হঠাৎ কখনো দেখা যায়, দু'একটা জীবজন্তুর মৃতদেহ। জলের টানে হাতির দলও অনায়াসে ভাসিয়ে নিতে পারে, বেশ বোঝা যায়। নদীর জল ক্রমশ বেড়ে ওঠে চোখের সামনে,—দুই পাড়ের পাথর ও পাহাড়ের গা তারই সাক্ষ্য দেয়। পাহাড়ের মাথা থেকে ও গা বেয়ে অনবরত জলধারা নামে, নদীতে মেশে। যেদিকেই তাকাই,—জলপ্রপাত। কোথাও বা প্রচণ্ড শব্দ তুলে পাহাড়ের অংশ ভেঙে পড়ে। গোলাগুলির মত অসংখ্য পাথর কেবলি গড়িয়ে আসে উপর থেকে, ছিটকে নদীর বুকে পড়ে, জলের মধ্যে যেন বিস্ফোরণ হয়।

সারাদিন বারান্দা থেকে সকলে এই প্রলয়লীলা দেখি। একটানা দু'দিনব্যাপী পাহাড় ও নদীর এমন সংহারিণী মূর্তি আগে দেখি নি।

মেহেতা বলেন, অনেক ক্ষতি হোল দেশের। তবে একজনের দুর্ভাগ্য অপরের সৌভাগ্য। এই দু'দিনে যে কাঠগুলো ভেসে গেল, এদের উদ্ধার করার কোন উপায় নেই। সব চলে গেল পাকিস্তানে। লক্ষ টাকার বেশি আমাদের দেশের লোকসান হয়ে গেল এতে।

দু'মাস পরে পাহাড় থেকে নেমে এসে পঞ্জাবে সেই সময় প্রবল বন্যার দুঃসংবাদ শুনি।

দুর্ঘেটির সামনে নদীর দুই দিকে খাড়া পাহাড় কাছাকাছি থাকায় দুই কূলে জলের প্লাবন ক্রমশ বেড়েই চলে। দশ ফুটেরও বেশি উপরে ওঠে। মাত্র আর কুড়ি-পঁচিশ ফুট উপরে বড় রাস্তা। তারই নিকটে দু'তিনটে চালাঘর, দোকান। যেভাবে জল বাড়ে, দোকানদার ও স্থানীয় লোকেরা ভয় পায়। রাত্রে এসে বাংলোর বারান্দায় ও রান্নাবাড়ীতে আশ্রয় নেয়। তাছাড়া, পাথর পড়ারও আশঙ্কা আছে। ডাকবাংলোর এলাকা সেদিক থেকে খানিক নিরাপদ।

প্রাকৃতিক এই দারুণ দুর্যোগ, হিমাদ্রির মনেও গভীর উদ্বেগ। বলে, এইখানে এভাবে আটকে রইলাম, এক মাসের ছুটি যে!

বলি, হিমালয়ে এসে ও-সব নিয়ে ভাবে না। মনের আনন্দ হারিয়ে যায়।—কিন্তু নদীর চেহারা দেখছ? চেনাই যায় না। মনে রেখো, মানুষের রাগ হলেও এমনি তার চেহারা বদলায়,—যেন দু'জন ভিন্ন লোক।

হিমাদ্রি চোখ কুঁচকে তাকায়, প্রশ্ন করে, কেন? এর মধ্যে রেগেছি একদিনও?

বলি, মোটেই না। সেইজন্যই ত বুঝতে পারবে বলে বলছি।

এদিকে আর এক বিপত্তি ঘটে।

দুর্ঘেটি পৌঁছবার পরই সেদিন বিকেলে গেহেরার কুলি এসে জানায়, খোরাকি নেই, দশটা টাকা চাই।

বলি, দশ টাকাই ত তোমার ভারমোর পৌঁছে পাবার কথা। তাই পাবে। খাওয়ার জন্যে ভাবনা নেই, আমাদের যা রান্না হচ্ছে,—একসঙ্গে খাব।

সে তখন জানায়, তার কে আত্মীয় থাকে এইখানে কাছেই। তার কাছে গিয়ে রাত কাটাবে, পরের দিন ভোরে এসে আমাদের সঙ্গে রওনা হবে। টাকার দরকার তার আত্মীয়কে দেবার জন্যে।

কথা শুনে কেমন যেন সন্দেহ জাগে। আবার ভাবি, গরীব লোক। হয়ত হঠাৎ বিশেষ কি প্রয়োজন হয়েছে।

পাঁচটা টাকা দিই। বলি, দেখ, অতি ভোরে রওনা হব, যতো রাতই হোক, তুমি এখানে ফিরে এসে ঘুমিও।

তখন ত আর জানা নেই, এমনভাবে বৃষ্টি চলবে, এখানে আটকে থাকতে হবে। কিন্তু দু'দিনেও সে লোকটার দেখা নেই, কোন খবরও দেয় না।

দু'দিন পরে বৃষ্টি কমে, মাঝে মাঝে থামেও। তবু পাহাড়ের উপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়া চলতে থাকে, বাংলোতে বসে দেখতেও পাই।

পথ জনশূন্য। মেহেতো বলেন, আরও একদিন কাটিয়ে তবে রওনা হোন। কুলির ব্যবস্থা আমি একটা করে দেব। আপনারা চেষ্টা করলেও পাবেন না। এ-অঞ্চলের লোকেদের অদ্ভুত মনোভাব। অত্যন্ত গরীব। টাকা রোজগারের সুযোগও খুব কম। সুযোগ পেলেও খাটতে চায় না। বিশেষত গ্রাম ছেড়ে কোথাও যেতে চাইবে না,—যতো টাকাই দিন না কেন। আশ্চর্য!

এ-পথে এগিয়ে যেতে আমাদেরও সেই অভিজ্ঞতা হয়।

॥ ৭ ॥

২৩শে সেপ্টেম্বর। সকালে মেঘহীন সুনীল আকাশ দেখা দেয়। মনেরও মেঘ কাটে। গত তিন দিনের দুর্যোগ দুঃস্বপ্নের মত মনে পড়ে।

নতুন কুলি খাওয়া-দাওয়া সেরে তবে আসে। আমরাও চায়ের সঙ্গে রুটি তরকারি খেয়ে নিই। পথে দুপুরে খাওয়ার পাট রাখি না।

নয়টার সময় যাত্রা শুরু। নদীর ধার দিয়ে পথ। নদীর স্রোত ও জলভার কমে আসে। পাড়ের ভিজে পাথরগুলি তার প্রমাণ দেয়। জলের মধ্যে দু'একটা পাথরের মাথাও আবার উঁকি মারে।

পথের উপর গড়িয়ে পড়া ছোট-বড় বহু পাথর। এক জায়গায় পথের খানিক অংশ ভেঙে নীচে নদীতে পড়েছে। অনেকখানি পাহাড়ের উপর উঠে সে জায়গাটুকু পার হতে হয়। পথে লোকচলাচলও আরম্ভ হয়, দেখি। যেন রাত্রি ভোর হওয়ায় পাখিরা বাসা ছেড়ে ছেড়ে চলে।

হিমাদ্রি বলে, ঐ দেখুন, সামনে যেন বায়োস্কোপের ছবি। লোকগুলি আসছে—কি অদ্ভুত বেশভূষা! এ-যেন কোন আজব দেশে এলাম।

তাকিয়ে দেখি। দুদিকের গিরিশ্রেণী ভেদ করে নদী নামে। নদীর সমরেখায় পথও চলে। সেই পথ ধরে অপর দিক থেকে এক গদ্দী পরিবার আসে। তারাও যেন পাহাড় ভেদ করে নামে। পুরুষদের লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ দেহ। সুশ্রী রূপ। কারও মাথায় বিশাল পাগড়ি, কারও বা গোল টুপি। পরনে হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা আলখাল্লা মতন। কোমরে পাকের পর পাক দিয়ে জড়ানো কালো লোমের মোটা দড়ি। এগিয়ে আসে হেলে দুলে লম্বা পা ফেলে। কিন্তু, পথ চলতেও দলপতির হাতে প্রকাণ্ড হুঁকা। নল টেনে তামাক খেতে খেতে আসে। মনে হয়, হিমাচলের পথ চলা এদের কাছে যেন আরাম-কেদারায় বিশ্রাম নেওয়া! সঙ্গে মেয়েরাও আছে। এক যুবতীও।

তার গায়ের রঙও যেমন সুন্দর, চোখ-মুখেরও তেমনি সুশ্রী গড়ন। অপূর্ব সুন্দরী। গলায় নাকে কানে অলঙ্কার। কিন্তু পরনে ঠিক গদ্দীরমণীর বেশভূষা নয়। ফুলকাটা সিল্কের রঙিন ঘাঘরা, জামা। মাথায় ওড়না। পাঞ্জাবী মেয়েদের মত পরা। শহর-ফেরা আধুনিকা গদ্দী তরুণী হয়ত। অবশ্য, কোমরে জড়ানো লোমের দড়ি।

হিমাদ্রিকে বলি, ঠিকই বলেছ, ছবির মতনই দেখাচ্ছে। এদেরই দেশে তো আমরা এসেছি। চম্বা জেলার ভারমোর সাব্-তহশীল—এই গদ্দীদেরই বাসভূমি। তাই ঐ অঞ্চলের আর এক নাম গদেরাম্।

হিমাদ্রি কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে, কিন্তু কোমরে পাক দিয়ে জড়ানো ওটা কি—কোমর-বন্ধের মত? ছেলেমেয়ে, সবারই?

ঐটিই ত গদ্দীদের বেশভূষার প্রধান অঙ্গ। তোমার গলার পৈতার মত। ওকে বলে ডোরা। প্রকাণ্ড লম্বা উলের দড়ি। ৪০ থেকে ৬০ গজ নাকি লম্বা। ওজনেও দু'তিন সের ভারী। মেয়েরাও কোমরে জড়িয়ে রাখে, দেখছ! তাদের অবশ্য লম্বায় আরও ছোট হয়। পাহাড়ে থাকতে বা পথ চলতে নানান্ কাজে লাগে,—ভেড়াছাগল বাঁধা, পাহাড় থেকে পড়ে গেলে তাদের ঐটের সাহায্যে তোলা, তাঁবু ফেলা;—আবার দড়িগুলো এমনি শক্ত যে গাছে বা পাথরে বেঁধে নিজেরাও ঐ দড়ি ধরে দুর্গম পাহাড়ে ওঠা-নামা করতে পারে।

হিমাদ্রি বলে, দেখাচ্ছে যেন সন্ন্যাসীর জটা কেটে কোমরে জড়ানো।

বাঃ! চমৎকার ধরেছ ত! লোকে ওটাকে 'শিউজিকী জটা'-ই ত বলে। বলার কারণও আছে। সুন্দর এক উপাখ্যান। এরা সবাই শিবভক্ত। তাই ভারমোরের আর এক নামও—শিবভূমি। চলেছ মণিমহেশ—শিবের রাজ্যে। রাজ্যের নাম শিবভূমি, আশ্চর্য কি? কারও কারও মতে ঐ অঞ্চলই শিবের গদী—তাই থেকেই এদেরও নামকরণ গদ্দী।

হিমাদ্রি বলে, কিন্তু, এদের চেহারা ত পাহাড়ীদের মতন একেবারেই নয়। এখানে এরা এল কি করে?

ওদের ইতিহাস যতটুকু জানা আছে, শুনো পরে, এখন ওদের দাঁড় করাও দিকি। ফটো তুলতে দিতে আপত্তি হয়ত হবে না,—চেহারায়, বেশভূষায় জবর হলেও মুখচোখে বেশ হাসিখুশী, সরল ভাব।

নিকটে এলে আমরাও হাসিমুখে তাদের দিকে তাকাই। তারাও হেসে দাঁড়ায়। ভাষার অন্তরায় থাকে। তবু ইশারায় কথা চলে। ছবিও তোলা হয়।

সেদিন গদ্দী সম্বন্ধে হিমাদ্রির কৌতূহল সম্পূর্ণ মেটাতে পারি না, যেটুকু জানা ছিল তাই জানাই।*

রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে গদ্দীদের পূর্বপুরুষরা ছিল শকজাতি। আর্যদের সগোত্র। পুরাকালে মধ্য এসিয়ায় এরা ছিল ভ্রাম্যমাণ যাযাবর। ঘোড়া ও ভেড়ার দল নিয়ে সেখানে চারিদিকে ঘুরে বেড়াত। হঠাৎ একদিন তাদের শান্ত জীবনযাত্রার নির্মেঘ আকাশে প্রবল-পরাক্রম হূন জাতির আক্রমণের ঝঞ্ঝা দেখা দেয়। পশুদল নিয়ে শকেরা দিকে দিকে পালাতে শুরু করে। দু'হাজার বছরের আগের কথা। সেই শকেদেরই কয়েকটি দল চলে আসে দক্ষিণাঞ্চলে ভারতের দিকে। কোন কোন শাখা নেমে যায় ভারতের সমতল প্রান্তেও। বলশালী দলপতিরা সেখানে প্রবেশ করে রাজ্যস্থাপনাও করেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁদের নামও থেকে যায়,—মগ, কদাফিস, কণিষ্ক, হুবিষ্ক, বাসুদেব ইত্যাদি। কিন্তু পশুপালনের জাতিগত বৃত্তি যারা ছাড়ল না, তাদেরই বংশধরেরা আজও ঘুরে বেড়ায় হিমালয়ের পাহাড়ে পাহাড়ে পশুদল নিয়ে। রক্তে তাদের যাযাবরের সদাচঞ্চল স্রোত। এদেরই একদল হিমাচল প্রদেশের বুশাহারে ও টেহেরি অঞ্চলে এখনও ঘোরে,—ঘোড়ার দল নিয়ে নয়, মহিষের পাল নিয়ে। "গুজর" সম্প্রদায় বলে তাদের পরিচয়। তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। অপর আর এক শাখা বিচরণ করে বেড়ায় চম্বা, মণ্ডী, লাহুল ইত্যাদি এলাকায়। তাদের নাম হয় "গদ্দী"। এরাও পশুপালন করে, কিন্তু ঘোড়াও নয়, মহিষও নয়,—মেষ ও ছাগের পাল। ভারতের শক-সম্রাট্ কণিষ্কের পৌত্র বাসুদেবের অনুকরণে হিন্দুধর্মও গ্রহণ করে।

কালক্রমে যাযাবর গদ্দীদেরও অনেকে মাটির ডাকে সাড়া দেয়। পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকর্মেও তাদের মন ঝোঁকে। তাঁবু ছেড়ে ঘর তোলে। নিজেদের পৃথক সমাজ ও বাসভূমিও গড়ে ওঠে। ভারমোর অঞ্চল এই গদ্দীদেরই আবাসস্থান। কিন্তু এখনও এদের প্রধান সম্পদ,—পালিত পশুদল,—ভেড়া ছাগল। শীতকালে তুষারপাতের আগে পশুপাল নিয়ে গ্রাম ছেড়ে কাংড়া, সুকেত, মণ্ডী প্রভৃতি হিমাচলের নিম্ন এলাকায় এরা দলে দলে নেমে চলে। শীতের ভয়ে নিজেদের সুখ-সুবিধার লোভে নয়, ভেড়া ছাগলের চারণভূমির সন্ধানে। বছরের অন্য সময়ে চম্বা ও লাহুল অঞ্চলেই পশুদল চরায়। ভেড়া-

---

* সম্প্রতি প্রকাশিত ভারত সরকারের হিমাচল প্রদেশের সেন্‌সাস্ রিপোর্টগুলির মধ্যে—A village survey of Brahmaur ও W. H. Newell লিখিত Report on Scheduled Castes and Scheduled Tribes (A Study of Gaddi—scheduled tribe and affiliated castes)—পুস্তিকা দুখানি থেকে এই সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্য জানা যায়।

ছাগল চরাবার প্রয়োজনে এইভাবে ঘুরে বেড়ানোয় খেতের কাজে তাদের মনও তেমন থাকে না। আবার, আর এক দিকে গ্রামীণ জীবনের স্বাদ পেয়ে কেউ কেউ তাঁতের কাজে, সেকরার কাজে, কামারের পেশায়ও লেগে যায়। শেষোক্ত কাজগুলি ভারমোরে যারা করে তাদের জাতি হোল—সিপি ও রেহরা। কারও কারও মতে তারা গদ্দী-সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। নিম্নজাতি বলে গণ্য হয়। কিন্তু যেমন ব্রাহ্মণেতর জাতিও পৈতা পরে, এরাও তেমনি কোমরে 'ডোরা' পরতে শুরু করে।

হিমাদ্রি বলে, কিন্তু 'শিউজিকী জটা'র উপাখ্যানটা কি?

বলি, রাহুলের এই অভিমত হলেও গদ্দীদের নিজেদের বিশ্বাস, তাদের পূর্বপুরুষরা এখানে আসেন রাজস্থান থেকে। 'চম্বা বংশাবলী'তে চম্বার প্রথম রাজার নাম পাওয়া যায়— জয়স্তম্ভ। প্রবাদ, তাঁর জন্ম হয় রাজপুতানার এক রাজবংশে। পিতার সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটায় স্বদেশ ত্যাগ করেন। সন্ন্যাস নেবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু তাঁর গুরুদেব নিষেধ করেন। রাজপুত জীবনের আদর্শ অনুযায়ী চলবার আদেশ দেন এবং হিমালয়ের এই চম্বা অঞ্চলে সদলবলে চলে আসার নির্দেশও করেন। কুমার জয়স্তম্ভ এই পথে আরও একটু এগিয়ে 'খাড়ামুখে'র নিকটে পৌঁছুলে অগ্রচারী নামে এক ঋষির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সেই ঋষি শিবের নিকট থেকে আগেই স্বপ্নাদেশ পান—জয়স্তম্ভকে এই প্রদেশে স্বাগত জানাতে এবং শিবের অঙ্গসজ্জা—টোপ (টুপি), চোলা (ঝোলা আলখাল্লার মত জামা) ও ডোরা (কোমরে জড়ানো লোমের দড়ি)—তাঁকে উপহার দিতে। জয়স্তম্ভ সেই শিব-বেশ ধারণ করে ভারমোরে এসে তাঁর রাজ্যস্থাপনা করেন। তাঁরই সঙ্গে ব্রাহ্মণরা আসেন পৌরোহিত্য করতে। বহু রাজপুত বা ক্ষত্রিয়রাও আসেন যোদ্ধারূপে। এঁরাও সকলেই সেই শিবের বেশই গ্রহণ করেন। নিজেদের শিবভক্ত বলে প্রচার করেন। ক্রমে এই শিবভূমিতে—শিবের গদীতে—এঁদেরও নামকরণ হয় গদ্দী বলে।

আবার, ভিন্ন এক মতে, জয়স্তম্ভের পিতার নাম ছিল মরু ; তিনিই প্রথম ভারমোরে এসে অধিষ্ঠান করেন।

গদ্দীদের মধ্যে আরও এক ধারণা আছে, ৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা অজিয়বর্মণের রাজত্বকালে গদ্দীদের অনেক পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা দিল্লী ও পঞ্জাব থেকে এইখানে চলে আসেন।

হিমাদ্রি বলে, হয়ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এরা দলে দলে এ-অঞ্চলে এসেছিলেন।

বলি, তাই ঘটেছিল মনে হয়। মোট কথা, গদ্দীরা এখানকার আদি বাসিন্দা নয়। এক হাজার দেড় হাজার বছর বা তারও আগে বাইরে থেকে এসে এই অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করে। রাজপুতানা, পঞ্জাব বা দিল্লীর গ্রীষ্মপ্রধান সমতলভূমি ছেড়ে এসে এই সুদূর দুর্গম পার্বত্য হিমাঞ্চলে কিভাবে তারা নতুন স্বতন্ত্র এক জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে ভাবতে বিস্ময় বোধ হয়। ভারমোরে গদ্দীরা নিজেদের ব্রাহ্মণ, ঠাকুর, ক্ষত্রী, রাজপুত বা রাণা বলে। Newell কিন্তু মনে করেন, ব্রাহ্মণরা ঠিক গদ্দী জাতিভুক্ত নয়। ক্ষত্রী বা রাজপুতরাই আসল গদ্দী। অথচ, ভারমোরবাসী সবাই আজকাল গদ্দীর মর্যাদা চায়। গদ্দীদের পূর্বপুরুষেরা হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন, সন্দেহ নেই। এখানেও তারা হিন্দুধর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। কিন্তু সকলেই শৈব। প্রধান দেবতা,—শিব। নিজেদের বেশভূষাও শিব পার্বতীর অঙ্গসজ্জার অনুকরণে ধারণ করে বলে এখনও দৃঢ় সশ্রদ্ধ বিশ্বাস।

ভারমোরে অন্য দেবদেবীর মন্দির থাকলেও শিবপূজারই প্রাধান্য। অথচ, রাজস্থান বা পঞ্জাবে শৈবধর্মের এমন বহুল প্রচার বা প্রভাব ছিল না। হিমালয় শিবের আবাসস্থান। মণিমহেশ শিখরও চম্বা-কৈলাস নামে প্রসিদ্ধ। তাই মনে হয়, যে-সময়ে গদ্দীদের পূর্বপুরুষরা এখানে আসেন তখন এখানে যে আদিবাসীদের বাস ছিল, তাদের দেবতা ছিলেন শিব। হয়ত তারা অনার্য-ই ছিল। রাজকুমার জয়স্তম্ভ এই সুদূর পার্বত্য দেশে যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে দিয়ে রাজ্যস্থাপনার চেষ্টা না করে, স্থানীয় শৈবধর্ম মেনে নেন। সহজেই কার্যসিদ্ধিও হয়। রাজা দেবতারই প্রতিনিধি। অতএব, সেই দেবতারই বেশভূষায় সাজিয়ে জনগণও তাকে বরণ করে। এই হয়ত ঐ উপাখ্যানের মূল কথা। যে কারণেই হোক,—এদের বেশভূষার বৈশিষ্ট্য আছে, বিশেষ করে ঐ কোমরে জড়ানো ডোরা,—শিউজিকী জটা।

এ ত গেল ধর্ম ও বেশভূষা। পার্বত্য জীবনধারাও তারা ক্রমে সুন্দর ভাবে আয়ত্ত করে নেয়। মধ্য এসিয়া থেকেই নেমে আসুক, অথবা ভারতের সমতল প্রদেশ ঘুরে হিমালয়ে উঠুক, এদের ধমনীতে প্রকৃতই যাযাবরের রক্তধারার প্রবাহ। তাই স্বভাবতই কষ্টসহিষ্ণু। সব রকম আবহাওয়াই সহ্য করতে পারে। সৈনিক পেশা অবলম্বনও হয়ত এর আর এক কারণ। অপর দিকে পাহাড়ীদের মতনই এরা সরল প্রকৃতি, মনখোলা, হাসিখুশি, গান-বাজনা নাচে সহজেই মাতে। জীবননির্বাহের প্রয়োজনীয় সামগ্রীও অতি অল্প। যা কিছু একান্ত প্রয়োজন নিজেরাই করে নেয়।

গদ্দীদের জীবনযাত্রার ধারা যেন চোখের সামনে ফুটে ওঠে। পোশাকের বাহুল্য নেই। পুরুষদের মাথায় সাধারণত পাগড়ি, কখন বা টুপি,—বুসায়রি বা কুলুক্যাপ্-এর মত গোল, উপরে চ্যাপ্টা, সামনে রঙিন ভেলভেট। গায়ে সুতির সার্ট বা কুর্তা। তার উপর পট্টুর কোট অর্থাৎ চোলা, হাঁটুর নীচে পর্যন্ত ঝোলা। কোমরে জড়ানো সেই কালো লোমের দড়ি,—ডোরা। কোমরে দড়ি পাকিয়ে রাখার দরুন চোলা বা কোট পেটের উপর উপর থলির মত ঝুলে থাকে,—তাকে বলে খুখ্—সেই ঝোলার মধ্যে নিজেদের ছোটখাট খুচরা মালপত্র ত রাখেই, এমন কি ভেড়ার বাচ্চা বা ছাগলছানাও নিয়ে যেতে দেখা যায়,—পেটের কাছে মুখ বার করে উঁকি মারে কেঙ্গারুর বাচ্চার মতন। এক একটা চোলা করতে ২০।২৫ গজ পট্টু লাগে। পরনে পট্টুর পাজামা, নীচের দিকে আঁটসাঁট টাইট—যেন যোধপুরী ব্রিচেস। গরমের দেশে এলে হাঁটুর নীচে থেকে খালিই থাকে। পায়ে মোটা চামড়ার মজবুত দেশী নাগরা।

মেয়েদের পরনেও ঐ ধরনের পট্টুর চোলা, এদের বলে চোলু,—গাউনের মত সারাদেহ ঢেকে ঝুলে থাকে। কোমরে এদের দড়ির পাক বা ডোরা। চোলুর উপর অনেক সময় হাতকাটা 'ভেস্ট' পরে। মাথায় কাপড়ের ফেট্টি,—বলে চাদরু। সারা অঙ্গভরা অলঙ্কার। মনে হয়, যার যা কিছু সম্পত্তি দেহ-ই তার 'সেফ-ডিপোসিট ভল্ট'-এর কাজ দেয়। অবশ্য আজকাল বেশভূষার পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

গদ্দীদের জীবনযাত্রার ধারাও বৈচিত্র্যময়! শীতের সুরু হতেই অক্টোবরের প্রথমেই গদেরানের ঘর ছেড়ে দলে দলে নেমে চলে পাহাড়ের নীচের দিকে। এ-যেন গ্রীষ্মকালে তুষার গলে পাহাড়ী ঝরণা নামে। শীতকালে পাহাড়ের এ-অঞ্চলে সব কাজকর্ম বন্ধ।

ভারমোর—মণিমহেশ মন্দির

ডানচুর পথে

উপরে ঃ ডানচুর পথে

পাশে ঃ ভেড়ার পাল
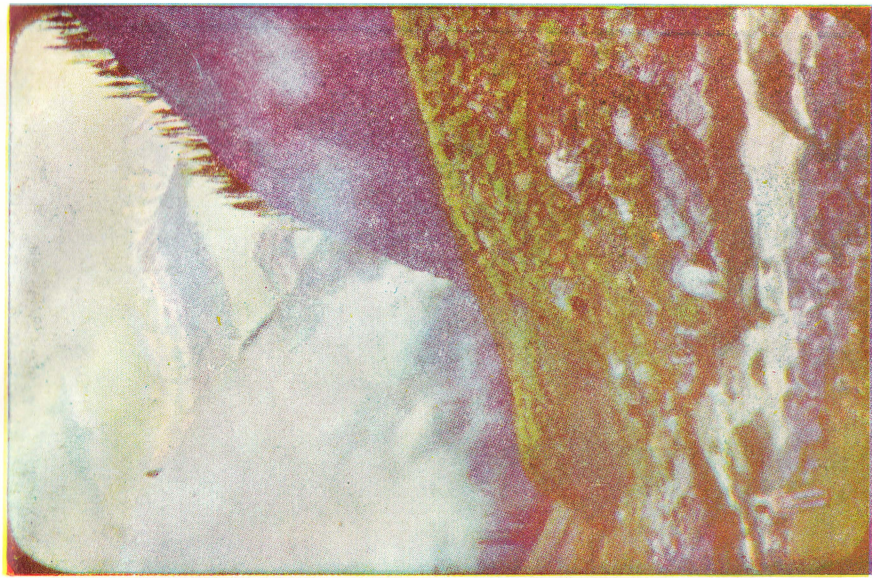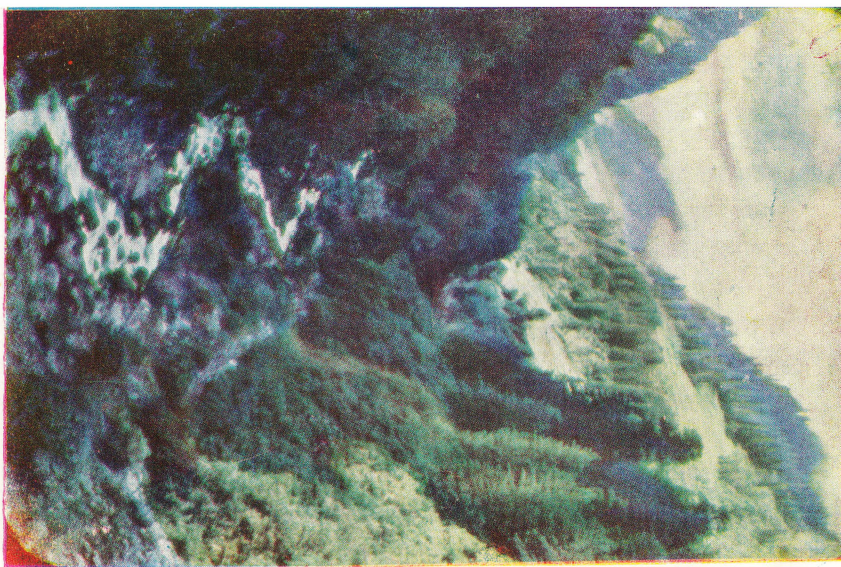
খেত খামারের কাজ নেই। চতুর্দিক বরফে ঢাকা। অন্য কোন কাজ করেও উপার্জনের সম্ভাবনা নেই। ভেড়া-ছাগলেরও চরে খাওয়ার এক কণা তৃণ নেই। কি হবে ঘরে নির্জীব হয়ে বসে দিন কাটিয়ে? 'চলো মুসাফির বাঁধো গাঁটরি'—যে যার মালপত্র নিয়ে ভেড়া-ছাগল তাড়িয়ে বেরিয়ে পড়ে পথে;—মালপত্র, তাই বা কি? সাজ-সজ্জা পোশাক? সে ত দেহেই আছে। নিজেদেরই হাতে বোনা। নিজেদেরই পালিত পশুদের লোম থেকে। তাই, এক চমৎকার প্রথাও এদের গড়ে ওঠে। যার ভেড়া-ছাগল যে রঙের উল দেয়, পট্টুর জামা পরবে সে সেই রঙেরই। দেখায়ও সুন্দর। নিজেদের ধনরত্নসম্ভার ঐ পালিত পশুদল। তাদেরই রঙে রঙ মিশিয়ে থাকবে না ত থাকবে কার? পথের আশ্রয়? সে-ও সঙ্গে চলে। ঐ পশুদেরই লোমে তৈরি কম্বল, গর্দু। গরম ত বটেই, তোশকের কাজ দেয়, বৃষ্টিও আটকায়। পথে পাহাড়ের গুহা মেলে, ভালই। না পাই, ঐ ত গাছের আচ্ছাদন। তাও নেই? পথ ত রয়েছে কোল পেতে। ঐ গর্দু জড়িয়ে পরম সুখশয্যায় আনন্দে বিশ্রাম করি, চল। মাথার উপর নীল আকাশে তারার চুমকি-বসানো সামিয়ানা। হঠাৎ যদি বৃষ্টি নামে? কেন, গর্দুর নির্ভয় আশ্রয়! খাদ্য? তারই বা ভাবনা কি? খেতে ফসল ফলে অপর্যাপ্ত ভুট্টা। তারই ছাতুতে সারা বছর কাটে। পথেও সঙ্গে চলে থলে ভর্তি,—চামড়ার ব্যাগে—স্কল্টুতে। নদী বা ঝরণা দেখে নিকটে আশ্রয় নেওয়া। জলের অভাব নেই। শুধু দু'একটা রাঁধবার বাসন সঙ্গে রাখা। শীত বোধ হয়? বা, বন থেকে শাক তুলেছ? পাথর সাজিয়ে বাতাস বাঁচিয়ে উনুন পাতো। আগুন জ্বালাও। বন জঙ্গল,—কাঠের আবার অভাব কি? এই ত কোমরে ডোরায় গোঁজা কাস্তেখানা, নাম জান না? দ্রাট্। এই দিয়ে এখনই আনছি কেটে কাঠ।

এলে ফিরে বন থেকে? কোমরে গোঁজা লম্বা ওটা কি রয়েছে? ঘুঙুর বাঁধা?—ওঃ! বাঁশুরী? জানালা—'লারি' রান্না চড়াক। চলো, গাছতলায় ঐ পাথরে বসে বাঁশুরী শোনাও। মাঠের সবুজ ঘাসের গদির উপর ভেড়া-ছাগল নিবিড় হয়ে ঝিমুতে থাক। তোমার কালো ভয়ঙ্কর কুকুরটা জড়সড় হয়ে শুয়ে আছে তোমার পায়ের কাছে। হয়ত তোমার বাঁশুরীর তান ওরও মনে সাড়া জাগায়। তবু, কি সজাগ ওর দৃষ্টি। কি যেন অল্প শব্দ শুনেই চমকে ওঠে। কান খাড়া করে মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখে,—ভেড়া-ছাগলের দলের পানে। নাঃ! সবই ঠিক আছে। আবার কুণ্ডলী পাকিয়ে মুখ গোঁজে।

বাঁশুরী থামল কেন? ওঃ। গান ধরবে? ধরো। তোমাদেরই লোকসঙ্গীত,—হাল আমলের সিনেমার গান যেন না হয়।

"কপ্ড়ে ধোআঁ কন্নে রোআঁ কুন্জুআঁ
মুক্খোঁ বোল জবানী ও,
মেরে কুন্জুআঁ মুকখোঁ বোল জবানী ও।
হত্খাঁ বিচ রেশমী রমাল চন্চলো।
বিচ্চ ছল্না নশানী ও
মেরিএ জিন্দ, বিচ্চ ছল্না নশানী ও।

* * *

"ও কুন্জুয়া! অঝোরে মোর অশ্রু ঝরে 'কপ্ড়ে' কাচতে,—চলে এস, এস কাছে,

ওগো, কও কথা মোর সাথে।"

"ও চন্‌চলো! হাতে তোমার রেশমী রুমাল, আঙুলে ঐ আংটি,—আমারই দেওয়া চির-প্রেম-উপহার।"

"কুন্‌জুয়া ও! দেখ—কাজল উজল সেই আঁখি আমার, তোমার মন ভোলাতো কতো! এখন বিষাদ-ঘন অশ্রুভরা মোদের বিফল-প্রেমের চিহ্ন এ ত!"

"ও চন্‌চলো! তোমার রাঙা হাতে রাঙা চুড়ি, তারই মাঝে মোর প্রেমের নিশান, ঐ যে সোনার বালাখানি!"

"ও কুন্‌জুয়া! আজ গভীর রাতে এস না যেন আমার কাছে! পাঁচ-পাঁচটা বন্দুক গাদা— উঁচিয়ে আছে বাড়ীতে—তোমারই বুক লক্ষ্য করে!"

"চন্‌চলো রে চন্‌চলো! আসবই আমি মাঝরাতেতে। অমর মোর ভালবাসা তোমারই তরে। করবে কি আর সামান্য ওই বন্দুকে!"

"ও কুন্‌জুয়া! চলেছ তুমি বহুদূরে। প্রেমের চিহ্ন একটা আংটি যেও গো দিয়ে যাবার আগে।"

"চন্‌চলো রে চন্‌চলো! নগণ্য ঐ চিহ্ন নিয়ে করবে কি? সোনায় ভরা এই চম্বাদেশ, সাজাব তোমায় গয়না দিয়ে।"

"কুন্‌জুয়া! রাখো কথা;—কাল দিনশেষে যেও না চলে মোরে ফেলে। তোমায় ধরে রাখতে কাছে, এ প্রাণই আমার করব দান।"

"ও চন্‌চলো! কাল দিনশেষে দূরদেশে যেতেই আমার হবেই হবে—কাজ রয়েছে ভারী ভারী,—যেতেই হবে তাড়াতাড়ি।"

প্রেম সঙ্গীত। তবু তারই মাঝে বন্দুকের উল্লেখ। গদ্দীদের পূর্বপুরুষরা এ-অঞ্চলে আসে যোদ্ধবেশে। পাঞ্জাব ও রাজস্থান ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান উৎস। জয়স্তম্ভও সঙ্গে আনেন সেই সৈন্যদলই। পরে চম্বা-রাজাদের মধ্যে যাঁরা বিজয়-অভিযানে যান ও রাজ্যসীমা বিস্তার করেন, গদ্দী সেনাদলই ছিল তাঁদের মুখ্য বল। এমন কি ভারমোর থেকে চম্বা শহরে রাজধানী স্থানান্তরিত হলেও সেখানেও চম্বারাজের সব সেনাদেরই "গদ্দীসেনা" নাম থেকে যায়। ইংরেজ আমলেও বৃটিশ সৈন্যদলে 'গদ্দী আর্মি' স্থান পায়। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব দেখায়। গৌরবও অর্জন করে। তাই এদের ঘরেও বন্দুক, গানেও বন্দুক। আবার আর একদিকে যাযাবরের রক্ত,— পথের আকর্ষণ, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা—প্রেমেরও আবেদন মানে না। প্রেয়সী ছেড়ে চলে দূরদেশে।

ভেড়া-ছাগলের পাল নিয়ে নেমে চলে। মেয়ে পুরুষ—এমন কি ছোট ছেলেরাও পিঠে যা পারে বোঝা বয়। পথশ্রান্ত বালক বা শিশুকে বসিয়ে নেয় সেই পিঠের বোঝার উপর। বাহকের কাঁধের দুদিক থেকে পা ঝুলিয়ে আরামে শিশু বসে থাকে, চোখে ঘুম নামলে ঢুলতেও থাকে। দিনের পর দিন পথ ধরে নেমেই চলে। মাসখানেক লাগে আপন ঠিকানায় পৌঁছাতে। সব দলই যে একই দিকে যায়, এমন নয়। কিন্তু, সবারই নির্দিষ্ট স্থান থাকে। কেউ নেমে যায় কাংড়া অভিমুখে, কেউ বা কাশ্মীর অঞ্চলে, অনেকে আবার পাঠানকোটের কাছাকাছি গ্রামগুলিতে। মাস চারেক সেখানে থাকা। আলস্যে বসে থাকা নয়। গ্রামবাসীদের কাজেকর্মে লেগে যায়,—কেউ বা গৃহস্থের বাড়ীর কাজে, নয়ত ক্ষেতখামারে বা অন্য কোন কাজে সাহায্য করে। আবার ছোটখাট ব্যবসাও চলায়। পাহাড়ে অজস্র

আখরোট ফলে, বন থেকে মধু সংগ্রহ হয়, তা ছাড়া গর্দু—মোটা মোটা কম্বল, পট্টু পশুলোম থেকে তৈরি হচ্ছেই। গ্রামের লোকদের কাছে এইসব বিক্রী করে। লাভও থাকে প্রচুর। নিপুণ ব্যবসাদার বলে গদ্দীদের নাম আছে। যতই হোক, রাজস্থান ও পঞ্জাবের রক্তধারার প্রভাব যাবে কোথা? পাহাড়ী অঞ্চলের একটা প্রবাদ,—'গদ্দী মিত্তর ভোলা, দিন্দা টোপি মাংতা চোলা'—গদ্দী বন্ধু এমনি ভোলা, দিয়ে টুপি মাগে চোলা,—অর্থাৎ সেই প্রকাণ্ড ঝোলা কোট!

মার্চ মাস এল। আবার, বাঁধো গাট্‌রি। চল ফিরে পাহাড়ে গদেরানে। সেখানে শীত গেছে। বরফ গলছে। আবার ক্ষেতের কাজ। ঘরের ডাক। মাসখানেক আবার কাটে পথে। গ্রীষ্মের মুখেই ফিরে আসে ভারমোর অঞ্চলে। আবার গ্রামগুলি মুখর হয়ে ওঠে। পাখির কুলায়ে যেন পাখিরা ফেরে। শস্যক্ষেত্র সবুজ ওড়নায় মুখ ঢেকে আবার হাসতে থাকে। সভ্য জগৎ থেকে সঙ্গে আনা—ছোটখাট শৌখিন জিনিসপত্র,—কিছু অর্থসঞ্চয়ও। গ্রামে গ্রামে মেলা শুরু হয়, নাচগান, নানান উৎসব, দেবতার পূজাও।

Newell গদ্দীদের সম্বন্ধে মন্তব্য করেন : "an extremely sensitive and religious people whose simplicity conceals an extremely deep national character."

কিন্তু মহাকালের চক্র ঘোরে। আধুনিক সভ্যজগতের জীবনধারার দুর্বার প্রবাহ হিমালয়ের এইসব দুর্গম অঞ্চলেও অনুপ্রবেশ করে। গদ্দীদেরও জীবন-প্রণালীর পরিবর্তন আনে। আজকাল ভারমোরে গভর্ণমেন্টের নানান্ দপ্তর। আধুনিক কালের দৃষ্টিভঙ্গিতে বহুবিধ উন্নতির প্রচেষ্টা! মোটর চলাচলের রাজপথও তৈরি হয়। তাই, গদ্দীদেরও অনেকে এখন ঐসব কাজে চাকরি পায়, উপার্জনও করে। শীতের সময় পাহাড়ের নীচের দিকে নেমে আসার, হয়ত, প্রেরণা থাকলেও আর প্রয়োজন বোধ করে না। যাযাবরের রোমাঞ্চকর জীবন ক্রমে স্বপ্নে মিলায়।

আজ, পথের উপর সাক্ষাৎ পাওয়া এই গদ্দী পরিবারও হয়ত চলে নিজেদেরই কোন প্রয়োজনে।

॥ ৮ ॥

আমরাও এগিয়ে চলি পথ ধরে সেই গদ্দীদেরই আজব দেশে,—গদেরানে—ভারমোরে। দেখতে চলি তাদের শিবভূমি। কেমনই বা সেই শৈলশিখর,—মণিমহেশ—চম্বার ছোট কৈলাস, —কোলে যার তুষার হ্রদ!

নদীর ধারা ধরে পথ চলে সর্পিল ভঙ্গিতে। নদী কখনো নিকটে কখনো বা কিছু উপরে। পূর্ব দিকে নদী ঘোরে, পথও বেঁকে যায়। এবার দুদিকের পাহাড় কাছাকাছি নয়। বিস্তীর্ণ উপত্যকা। ইরাবতীও যেন হাঁফ ছেড়ে হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নেন। পথের পাশেই জলপ্রপাত। কয়েকদিনের বৃষ্টির ফলে প্রবল বেগে জল পড়ে। কাঠের পুল। বাতাসে জলকণা উড়ে এসে চোখে মুখে লাগে।

চড়াই নেই। পথ চলার শারীরিক ক্লেশও নেই। রোদের তাপও সকালে স্নিগ্ধ মনে হয়।

সানন্দে এগিয়ে চলি। মাইলচারেক আসার পর বাঁ দিকে নদীর উপর বড় পুল। ভারমোরের রাস্তা পুল পার হয়ে অপর পারে যায়। আর এক পথ নদীর এই ধার দিয়ে পূর্বদিকে চলে। শুনি, সে-পথ সামনের পাহাড় পার হয়ে আজু রোড্ সরাই পাশ দিয়ে যোগীন্দ্রনগরে পৌঁছয়।

পুল পার হয়ে আমরা অপর পারে আসি। কাছাকাছি লোকবসতি দেখি না। দু-একজন পথচারীর সাক্ষাৎ মেলে। জায়গায় নাম বলে খাড়ামুখ।

হিমাদ্রি বলে,—এই সেই খাড়ামুখ, যেখানে প্রবাদ, রাজকুমার জয়স্তম্ভ অগ্রচারী ঋষির সাক্ষাৎ পান।

হেসে বলি, এগিয়ে চল, দেখ তোমাকে আবার হয়তো কেউ স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছেন!

এপারে এসে পথ আবার বাঁ দিকে ঘোরে, ইরাবতীর দক্ষিণ তীর দিয়ে চলে। কিছু দূর যাবার পর দেখা যায় ডান দিক থেকে এক পাহাড়ী নদী এসে ইরাবতীতে মেশে। আমাদের পথও সেই নদীর যাত্রাপথ ধরে ডাইনে ঘোরে। ইরাবতীর মূল ধারার সঙ্গে এইখানেই ছাড়াছাড়ি। নতুন সঙ্গী—এই নদীর নাম বুধল, ভুডল বা ভুগুল। ইরাবতীর উপনদ। কুগ্‌টি পাশ-এ (Kugti Pass) এর উৎপত্তি। মাইল ত্রিশ দীর্ঘ উপত্যকা দিয়ে বহে আসে— ভারমোর বা ভুডল ভ্যালি নামে তার পরিচয়। নদীর বাঁ দিকের খাড়া পাহাড়ের গা কেটে পথ। কালো পাথর। মাথার উপরও সাপের ফণার মত কালো কালো পাথর ঝুলে থাকে। সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে যেন চলা। স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার ভাব। ওপারেও নীচের দিকে পাহাড়ের খাড়া গা। মধ্যিখানে নদীর Gorge। ওদিকের পাহাড়ের উপর অংশ কিন্তু তেমন খাড়া নয়, ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে যায়। সেদিকে মাঝে মাঝে গাছের ঝোপ, সবুজ ঘাসে ছাওয়া মুক্ত আবহাওয়া। সকালের রোদে উজ্জ্বল দেখায়। নদীর দুই তীরে দুই ভিন্ন রূপ।

ক্রমে নদীর সঙ্কীর্ণ ধারাপথ অতিক্রম করে গিরিশ্রেণীর উন্মুক্ত অঙ্গনে পৌঁছুই। তখন বোঝা যায়, ক্রমশ ধীরে ধীরে পথ পাহাড়ের উপর উঠে এসেছে। বহু নীচে নদীর উপত্যকা। চারিদিকে ঘিরে বিস্তীর্ণ শৈলমালা। আকাশপানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে দূরের পাহাড়গুলির শিখরদেশে তুষারের শুভ্র প্রলেপ।

ভুডল নদীর সঙ্গ পাবার পর মাইল তিনেক এসে পথের ধারে ছোট দোকান। আশেপাশে ভুট্টার ক্ষেত। পথের অপর দিকেও ধাপে ধাপে ক্ষেতের জমি পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে ওঠে। সেদিকে কয়েকটা ঘরও দেখা যায়। গ্রামের নাম লাহুল।

দোকানদারের সঙ্গে হিমাদ্রি আলাপ করে। মিলিটারীতে ছিল। বারাকপুরেও কিছুদিন কাটিয়েছে। তাই কলকাতা থেকে আসছি শুনে যেন তার কত জানাশোনা অঞ্চল থেকে এসেছি তারই প্রমাণ দেখিয়ে বলে,. হাওড়ার পোল দেখেছি, কালী মাকে দর্শন করেছি, বড়বাজার গিয়েছি।

দোকানে আর একজনও বসে। গ্রামের স্কুলমাস্টার। মণিমহেশের যাত্রী। শুনে দুজনেই দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেন। বলেন, যাত্রা ত ক'দিন আগে এ-বছরের মত শেষ হয়েছে। এখন ও-পথে লোক চলাচল বন্ধ। বরফ পড়তেও সুরু হয়েছে। দেখুন না, ঐ সব পাহাড়ের মাথা, বরফে সাদা হয়ে আছে। মণিমহেশ ত আরও উঁচু। আপনাদের কষ্ট করাই সার

যে। পৌঁছুতে পারবেন না। বুঝতে পারি, গত কয়েকদিনে বৃষ্টিতে পাহাড়ের উপর অংশে সম্ভবতই তুষারপাত ঘটেছে। এখন আবার রোদ ফুটেছে, আকাশও পরিষ্কার। অন্তত কয়েকদিন আবহাওয়া ভাল থাকবেই। নতুনপড়া বরফও অনেক গলে যায়।

তাই বলি, দেখি, এতোদূর এলাম,—বুঝছেন ত সেই কলকাতা থেকে। চেষ্টা করে দেখা যাক্, যতোদূর যাওয়া যায়। মণিমহেশ দর্শন যদি না দিতে চান্ পাব না।

মাস্টারজী বলেন, হাঁ, উ-তো ঠিক বাত। কালীমায়ের মন্দির আমাদের এদিকেও আছে, জানেন?

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখান, ভুডল নদীর অপর পারে পাহাড়ের গায়ে এক রাস্তা। বলেন, ঐ পথ সোজা চলে যায় তন্দা কালীদেবীর মন্দিরে। কুড়ি মাইল দূরে কালীছো পাশ। সেদিক থেকে উঠে অপর পারে পঙ্গীতে নেমে চন্দ্রভাগার ভ্যালিতে ত্রিলোকনাথের মন্দির।

কথা শুনে উৎসুক নয়নে তাকাই। ত্রিলোকনাথ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা বহুদিনের। ভাবি সে-আশা আর এ-শরীরে পূর্ণ হবার নয়।

কিন্তু তা-ও হয় আরও কয়েক বছর পরে। চম্বার এদিক থেকে গিয়ে নয়। কুলু হয়ে রোটাংপাশ পার হয়ে লাহুলের ভিতর দিয়ে। হিমাদ্রির দৃষ্টি অন্য দিকে। লোলুপ নয়নে তাকায়, দোকানের পাশে ক্ষেতে তাজা পুষ্ট ভুট্টাগুলির দিকে।

বুঝতে পারি। জিজ্ঞাসা করি, দুটো কিনে পুড়িয়ে নেওয়া যাবে। দোকানে উনানে আগুনও রয়েছে দেখছি।

দোকানদার কিন্তু দিতে রাজি হয় না। গম্ভীর মুখে জানায়, ক্ষেত থেকে এখন মকাই তোলা চল্‌বে না—সময় হয়নি।

হিমাদ্রি আশ্চর্য হয়ে বলে, কেন? খাওয়ার মত যথেষ্ট বড় হয়েছে।

দোকানদার বলে, খাওয়ার মত কথা বল্‌ছি না। এখানকার প্রথা মকাই তৈরি হলে দেবতাকে আগে উৎসর্গ করতে হয়, তারপর লোকে খায়।

হিমাদ্রি বলে, ভালই নিয়ম। তাহলে দেবতাকে এখনি দুটো ভোগ দিয়ে আমাদের প্রসাদ দাও, প্রণামীও পাবে।

সে বলে, তা কি করে হয়? পূজা আছে, উৎসব আছে,—গ্রামের সবাই মিলে করি। ও এখন পাওয়া যাবে না।

হিমাদ্রি হাল ছাড়ে না। জিজ্ঞাসা করে, এদিকে জঙ্গলে শুনেছি অনেক ভালুক আছে?

দোকানদার বলে, বহুৎ। ক্ষেতের কম লোকসান করে? মকাই পাকলে ত কথাই নেই। রাতভোর পাহারা দিতে হয়। এখন দিচ্ছিও।

হিমাদ্রি শুনে কূল পায়। বলে, তাই নাকি? মাঝে মাঝে লুকিয়ে এসে খেয়েও যায় বোধহয়?

দোকানদার জানায়, তা যায় বইকি। এই তো দুদিন আগে ক্ষেতের ঐদিকে ক'টা খেয়ে গেছে।

হিমাদ্রি হাঁফ ছেড়ে বলে, তা' হলে আজও না হয়, আরও দুটো ঐভাবে খেয়েছে মনে করো।

মাস্টারজী হাসেন। দোকানদারকে বলেন, দুটো তুলে আন, দিয়ে দাও—যাও। গ্রামের

ছেলেরাও ত ভাঙ্ছে খাচ্ছে।

অবশেষে দোকানদারও হাসতে হাসতে যায়। গোটা ছয়েক তুলে আনে। আগুনে ভাল করে পোড়ান হয়। কোন মতেই দাম নেয় না। তাজা, গরম ভুট্টা চিবোতে চিবোতে আবার পথ চলি। কুলিও ভাগ পায়। অতি সুস্বাদু, রসাল। ক্ষুধাতৃষ্ণা দুই মেটায়। হিমালয়ে পথ চলার আনন্দ স্বাদ রসনাও গ্রহণ করে। হিমাদ্রিকে বলি, এই তো, তোমারও সাদর অভ্যর্থনাই হোল দেখছি। দেশজয় নয় ভুট্টা বিজয়।

সারা চম্বায় ভুট্টাই প্রধান খাদ্য। সর্বত্রই ভুট্টার ক্ষেত। ফসল ফলেও প্রচুর। গ্রামে গ্রামে প্রতি বাড়ীর ছাদে পাকা ভুট্টা শুকায়। দূর থেকে দেখে মনে হয়, সোনার পাত দিয়ে ঘরগুলি ছাওয়া! ভুট্টার আটা করে। তারই রুটি খাওয়ার সর্বত্র প্রচলন। বারোমাস এদেশের লোক এই খেয়ে কাটায়।

লাহুল থেকে আরও মাইল তিনেক যাবার পর চেল্ড় ঘর। মাস্টারজী সাবধান করিয়ে দেন, চেল্ড় ঘরে বিরাট পাহাড় ধ্বসেছে, পথ বন্ধ। ওখানে পৌঁছুবার কিছু আগে, বাঁ দিকে একটা সরু পথ দেখবেন নীচে নেমে গেছে নদীর দিকে। সেই পথ ধরে নামবেন, মাইল দুই তিন ঘুরে আবার বড় রাস্তায় এসে উঠবেন।

পাহাড়ে বাঁক ঘুরে চেল্ড় ঘরের সেই প্রকাণ্ড ভাঙা অংশ দেখি। কে যেন খাবল মেরে পাহাড়ের বিরাট অংশ তুলে নিয়েছে।

চারিপাশে সবুজ গাছপালার মধ্যে পাহাড়ের যেন ক্ষতবিক্ষত দেহ।

বাঁ দিকের সেই সরু পথও আসে। দেখি, প্রায় পাঁচ ছয়শত ফুট নীচে ভ্যালিতে সে-পথ নেমে যায়, সেখানে গ্রামের কয়েকটা ঘরবাড়ী।

দূরে দেখি, কুলির দল রাস্তা মেরামতের কাজ করে। ভাবি, আবার নীচে অতোখানি নামা, চড়াই ওঠা, মাইল তিন আরও বেশি ঘোরা,—দরকার কি? ভাঙা পথেই এগিয়ে যাই, প্রয়োজন হলে মজুরদের সাহায্য নেওয়া যাবে।

বিরাট্ ধ্বস্। দু' এক জায়গায় খাড়া পাথর। তারই গায়ে ঝরণার জলের ধারা। কাদাগোলা ঘোলাটে জল। মজুররা নিজে থেকেই এগিয়ে আসে। হাত ধরে বিপদ্সঙ্কুল স্থানগুলি পার করে দেয়।

নিশ্চিন্ত মনে আবার চলতে থাকি। পথের উপর একপাল ভেড়া ছাগল। প্রকাণ্ড বড় লোম। আঁকাবাঁকা শিং। নিকটে পাথরের উপর বসে কয়েকটি গদ্দী। কোমরে সেই পাকানো দড়ি। হাতে হুঁকা।

আরও তিন মাইল গেলে দূরে দেখা দেয়—ভারমোর। প্রায় সাত হাজার ফুট উঁচুতে পাহাড়ের উপর অধিত্যকা। বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। চাষের ক্ষেত। বড় বড় ঘরবাড়ী। মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে গাছের সারি। দূরে শহরের পিছনে বরফের পাহাড়। মনে হয়, অতি নিকটে। শহরের উপরে পাহাড়ের গায়ে চীরগাছের বন।

হিমালয়ের নিভৃত দুর্গম অঞ্চলে রাজধানী গড়ার মতই সুন্দর পরিবেশ।

বিকাল সাড়ে চারটায় পৌঁছুই।

শহরে প্রবেশ করার মুখে ঝরণা। কয়দিন বৃষ্টির পর জলের স্রোত বেগে চলে। দূর থেকেই দেখি, রঙ্গিন কাপড় গায়ে কে যেন এখানে ঘোরেন। কাছে এসে দেখি, ঝরণার জলের তোড় ক্ষেতের অংশ ভেঙেছে, তিন চারজন লোক ভাঙা অংশ মেরামত করার

কাজে ব্যস্ত। পাশে দাঁড়িয়ে এক সাধুজী। গেরুয়াবসন। দীর্ঘ সবল দেহ। উজ্জ্বল বর্ণ। ঘুরে ঘুরে লোকগুলিকে নির্দেশ দেন, কোথায় কি করতে হবে। নিজেই হয়ত একটা পাথর সরান, কোথাও বা পাথর বসান। স্বামীজীর তত্ত্বাবধান দেখে আনন্দ পাই। সাধারণ হুকুম করা নয়, কর্তৃত্বের লেশমাত্র প্রকাশও নয়; যেন মূর্তিমান অনুপ্রেরণা।

ভারমোর মণিমহেশ তীর্থক্ষেত্রের দ্বারদেশ। ভাবি, মন্দিরের সিংহদ্বারে সাধু সন্দর্শন। সৌভাগ্যেরই নিদর্শন।

॥ ৯ ॥

এগিয়ে এসে শহরে ঢুকি। পথের পাশে সারি সারি ঘরবাড়ি। বনবিভাগ দপ্তরে খোঁজ নিই। এখানকার রেঞ্জ অফিসারের বাড়ি পাহাড়ের কিছু উপরে। সেখানে নিয়ে চলে। একতলা লম্বা বাড়ি। সামনে ফুলের বাগান। দূরে বরফের পাহাড়ের পটভূমি। নীচে শহরের ঘরবাড়ি। বড় বড় দেওদার গাছের ছায়াতলে কয়েকটি মন্দির।

বাগানে চেয়ার পেতে অফিসার বিকালের পড়ন্ত রোদ পোহান। আমাদের দেখে উঠে আসেন। স্বাগত জানান। নাম, হেমরাজ সুড়্। জানান, ডালহাউসির দপ্তর থেকে খবর পেয়েছেন। যাত্রার ব্যবস্থা সব হয়ে যাবে, কোন চিন্তা নেই। এখন সুস্থির হয়ে বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করেন।

জিজ্ঞাসা করি, ফরেস্ট বাংলো কোন্ দিকে? সেইখানে গিয়ে একেবারে বসলে হোত?

তিনি জানান, সেখানে চৌকিদারকে বলা আছে বটে, কিন্তু শহর থেকে মাইলখানেক দূরে একটু বাইরে। আমাদের আপত্তি বা অসুবিধা না থাকলে তাঁর এই বাড়ীতেই থাকতে পারি। ঘর খালি পড়ে রয়েছে। তিনি এখন একাই আছেন। এখানে থাকার মস্ত সুবিধা, ছোটাছুটি করার হাঙ্গামা থাকবে না, যাত্রার সব আয়োজন এইখানে বসেই পরামর্শ করে হয়ে যাবে।

আমি জানাই, কিন্তু আপনার কোন অসুবিধে করতে চাই না। কালই সকালে যাত্রার ব্যবস্থা করিয়ে দিন। সবাই বলছে দেরি হয়েছে, ওদিকে বরফ পড়তে সুরু করেছে, যাওয়া যাবে না।

তিনি হেসে আশ্বাস দেন, পাহাড়ীরা ঐ রকমই ভয় পায় সাধারণত। কোন চিন্তা করবেন না। স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসবেন। আকাশের উত্তর-পূর্ব দিকে ফিরে তাকান। আকাশ-জোড়া বরফের পাহাড়। বিকালের পড়ন্ত রৌদ্রে ঝল্‌মল করে। সুড়্ বলেন, ঐ তো মণিমহেশ শিখর!—তাকিয়ে দেখি। মনে পুলক জাগে। যেন কাছে টানে। সুড়্ আশ্বাস দেন, বরফ কিছু গত ক'দিনে পড়েছে, তা তেমন বেশি কিছুই নয়। লোকজনের ব্যবস্থা এখনি হয়ে যাবে। কিন্তু থাকার ব্যবস্থা আমার এখানেই হোক। আমাদের অসুবিধে হওয়া ত দূরের কথা। জঙ্গলে পড়ে থাকি, আপনাদের কাছে পেলে কতো আনন্দ। আসছেন কতো দূর থেকে, কোথায় থাকবেন সেই বাংলোতে? ছাড়ছি না আপনাদের কোনমতেই।

তাঁর লোকজন ডাকেন। চা, খাবার আসে। আগামীকাল সকালে যাত্রার আয়োজন সেইখানে বসেই তখনি হয়েও যায়। প্রয়োজনীয় মালপত্র নিয়ে একজন ভারবাহক যাবে।

বাকি জিনিস এইখানে থাকবে। তিন দিনের জন্যে নেহাৎ যা না হলেই নয়, তাই শুধু সঙ্গে রাখা।

সুড় বলেন, আমার ফরেস্ট গার্ডদেরও বলে দিয়েছি, তারা নিজেদের এলাকার মধ্যে প্রত্যেকে যেন আপনাদের সঙ্গে থাকে। কাল এখানকার গার্ড সঙ্গে চলবে।

এইবার নিশ্চিন্ত মনে স্থির হয়ে বসে পরিচয় সুরু হয়। জিজ্ঞাসা করেন, কোথা থেকে আসছি?

কলকাতা।

কলকাতা থেকে? এখানকার ডাক্তারসাহেবও যে বাঙালী।

পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি, পাহাড়ীরা অনেক সময় উত্তর ভারতের বাসিন্দাকেও বাঙালী বলে ভুল করে। তাই জিজ্ঞাসা করি, উপাধি কি বলুন তো?

চ্যাটার্জি।

নিঃসন্দেহ হই। সুড় মুখ বাড়িয়ে পাহাড়ের অল্প নীচের দিকে তাকান। উল্লসিত হয়ে বলেন, ঐ ত উনি চলেছেন। ওঁর বাড়ী যে এই পাশেই।—চেঁচিয়ে ডাকেন, ডাক্তার সাহাব, ডাক্তার সাহাব—ইসারা করে জানান্ উপরে আসতে।

কাঁচা পাকা চুল। টক্‌টকে ফর্সা রঙ্। দোহারা চেহারা। পরনে কোট, প্যাণ্ট। ধীরে পা ফেলে ভদ্রলোক্ উপরে উঠে আসেন। গম্ভীর মুখ। বাগানের গেটে ঢুকে অল্প দূর থেকেই সুড়কে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করেন, ডাকছ কেন?

চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে যাই। হাত তুলে নমস্কার করি। বলি, আসুন, আলাপ করা যাক, হিমালয়ের এতো দূরে হঠাৎ বাঙালীর দেখা পাব, ভাবিনি।

তিনি অবাক হয়ে তাকান। বলেন, আরে! আপনি বাঙালী? ঘরে বসে দেখছিলাম বটে আপনাদের আসতে। আমার ধারণা হয়েছিল, পাঞ্জাবী। সুড়-এর কাছেই শুনেছিলাম, কে পার্টি আসছে মণিমহেশ যাবে বলে। বাঙলাদেশ থেকে আসছেন,—তা ত ভাবিনি। এই বয়সে দুর্গম পথে চলে এলেন? সাহস আছে ত! সঙ্গে কি একটি সঙ্গী? ক' বছর এখানে আছি, বাঙালী কাউকে এভাবে আসতে দেখিনি।

ভদ্রলোকের মুখে হাসির রেখা ফোটে। নিজেই চেয়ার টেনে নিয়ে বসেন। সুড়কে বলেন, গরম চায়ের আবার অর্ডার করতে। তারপর বলেন, বলুন শুনি, কোথা থেকে আসছেন? নামটাও ত এখনো জানা হয়নি।

প্রশ্ন করি, আপনি কোথাকার তাই আগে শুনি।—সুড়-এর দিকে তাকিয়ে বলি, সুড় সাহেব, আমরা বাঙ্‌লায় যদি একটু বাত চিৎ করি, আপত্তি নেই ত?

সুড় বলেন, না, না, মনে করব কেন? আপনার দেশের লোক বলেই ত ডাকলাম।

ডাক্তার জানান, বাড়ী আর কোথায় হবে? কলকাতায় ভবানীপুরে। লেখাপড়াও ঐখানে। আপনার?

শুনে সংশয়ে পড়ি। পথে নিজের পরিচয় সহজে কাউকে দিতে চাই না, দেবার প্রয়োজনও দেখি না। তবু, নামটা বলতেই হয়। ডাক্তার চিনে ফেলেন। আনন্দিত হয়ে বলেন, দেখুন অদ্ভুত যোগাযোগ! দুজনের অতো কাছাকাছি বাড়ি, অথচ কলকাতায় কখনো পরিচয় হোল না— হোল কোথায়? হিমালয়ের এই নির্জন, সুদূর, দুর্গম অঞ্চলে।

সুড় আশ্চর্য হয়ে তাকান। বলেন, ডাক্তারসাহেবের মুখে এই প্রথম হাসি দেখছি।

আগে জানাশুনা ছিল নাকি?

তারপর হেসে বলেন, দেখুন ত ডাক্তারসাহেব সম্বন্ধে কোন কিছু বার করতে পারেন কিনা। পাশাপাশি এখানে থাকি। রোজই দেখা হয়। এতো জানাশুনা, তবু বাড়িতে একবারও ডাকেন না, যেতে চাইলেও দেন না। নিজে চলে আসেন—এইখানে আমার ঘরে। একা থাকেন, কি করেন কে জানে! কখনও কলকাতায় যান না, এখানে ওঁর কাউকে আসতে দেখি না,—অথচ ক'বছর হয়ে গেল এখানে রয়েছেন। এখানেও লোকজনের সঙ্গে মেশামেশি করেন না, এক আমার সঙ্গেই যা একটু ভাব, কিন্তু তাও ত নিজের সম্বন্ধে আমাকেও কিছু জানতে দেন না।

গম্ভীর প্রকৃতির লোক হলেও ডাক্তারের সঙ্গে বেশ আলাপ জমে, হাসিঠাট্টাও চলে। সুড় দেখে আরও আশ্চর্য হন। ডাক্তার বলেন, দেখুন তো মশাই! নিজের সম্বন্ধে আবার কাকে কি শোনাব? বলবার আছেই বা কি? চাকরি নিয়ে চলে এসেছি এখানে—এই দূরে। দিন কেটে যাচ্ছে মন্দ কি? নিরিবিলি জায়গা, কোন হাঙ্গামা হুজুগ নেই, নিজের কাজ করে যাই। মাসে মাসে বাড়িতে নিয়মিত টাকা পাঠানো,—তাও ঠিকমত পাঠাই। আবার কি? এখানে এতো দূরে কারও আসা কি সহজ কথা? এলেও তাদের থাকাও তো সম্ভব হবে না—ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া রয়েছে। গত বছর একবার দিল্লী যেতে হয়, সেই সময়ে সেখানে তারাও আসে, দেখাও হয়।—ছেড়ে দিন্ ও-সব কথা। মণিমহেশ যাত্রার কি ব্যবস্থা হচ্ছে শুনি। সুড় সাহেব, একজন হুঁসিয়ার লোক সঙ্গে দিচ্ছ নিশ্চয়?

সুড় সব ব্যবস্থার কথা জানান্। ডাক্তার ও সুড়-এর কাছে ভারমোর ও মণিমহেশের নানান্ গল্প শুনি।

॥ ১০ ॥

সুড় বলেন, চলুন, নীচে শহরে যাব এখনি নাগাবাবার কাছে। আপনারাও দর্শন করে আসবেন। বিরাট যোগী।

জিজ্ঞাসা করি, এক স্বামীজীকে দেখলাম শহরে ঢোকবার মুখেই। তিনি অবশ্য নাগা নন্, গেরুয়াধারী।

সব শুনে সুড় বলেন, তাহলে তাঁকেই দেখেছেন। তিনিই ত এখানকার—শুধু ভারমোর কেন, সারা চম্বার প্রাণ। গত ক'দিনের বর্ষায় হয়ত কারও ক্ষেতের জমি ভেঙে পড়েছে, খবর পেয়েই নিশ্চয়ই গেছেন লোকজন নিয়ে সাহায্য করতে। তারপর গল্প শুনি স্বামীজীর। যোগী শ্রীশ্রীজয়কিষণ গিরি মহারাজ। এখানে লোকে বলে, নাগা বাবা। বয়স কতো কেউ বলতে পারে না। হিমালয়ের তুষার-রাজ্যে বহুকাল কঠোর তপস্যা করেন। তখন বিবস্ত্র অবস্থাতেই থাকতেন। তারপর এই ভারমোরে আসন নেন্। প্রায় ষাট্ বছর এইখানেই আছেন। লোকালয়ে থাকলে সামান্য বস্ত্রখণ্ড বা কৌপীন ব্যবহার করেন। সারা বছর বরফ গলা জলে স্নান করেন,—শীতের সময় চারিপাশ বরফে ঘিরে থাকলেও। অসীম শক্তিশালী, তেজস্বী পুরুষ। সারা চম্বাতে এমন কেউ নেই যে, তাঁর নাম শোনেনি। সকলেই দেবতার মত ভক্তিশ্রদ্ধা করে। ছোট বড় সব কাজেই তাঁর পরামর্শ নেয়, আশীর্বাদ

চায়। নিজের যোগ সাধনায় দিন রাত্রি কাটালেও মানুষের বিপদে আপদে প্রয়োজন হলেই নিজে থেকে এগিয়ে আসেন, সাহায্য করেন। লোকে বলে চম্বা রাজ্যে ঘাসের সামান্য শিষ পর্যন্ত নড়ে না, তাঁর নির্দেশ না পেলে। সুড্ বলেন, আজ ঐ মাঠে সামান্য মেরামতের কাজ আর কী দেখলেন? চম্বার ও ভারমোরের যা কিছু উন্নতি সবই নাগাবাবার জন্যে। সংস্কারের অভাবে ভারমোরে প্রাচীন মন্দির ধ্বংস হতে বসে, মেরামত করান, আবার শ্রী ফিরে আসে। মণিমহেশের যাত্রীরা এসে আশ্রয় পায় না, থাকবার ব্যবস্থা নেই,—ধর্মশালা ওঠে। পাহাড়ের দুর্গম রাজ্যে লোক চলাচলের অশেষ কষ্ট, প্রাণহানির আশঙ্কা,—যাত্রাপথ তৈরী হয়। ছেলেদের লেখাপড়া হয় না, স্কুল বসে। জলের অভাব ঘোচাতে পাহাড়ের মাথায় ঝরণার মুখে নল বসে, জল আনার ব্যবস্থা হয়। রোগীর চিকিৎসা হয় না, হাসপাতাল খোলেন। মণিমহেশ যাত্রীদের নানা রকম অসুবিধা, কোনই বিধিব্যবস্থা নেই, অথচ পুণ্যকামী যাত্রীদের ভিড় হয়, সাধু সন্ন্যাসী অনেক ত আসেনই। প্রতি বছর যাত্রার সব কিছু আয়োজন ইনি করিয়ে দেন। এ-সব কাজ করতে প্রচুর টাকার প্রয়োজন। কোথা থেকে আসে, কি করে এত বড় বড় কাজ সুশৃঙ্খলার সঙ্গে হয়ে যায়,—সবাই অবাক হয়ে দেখে। চম্বাবাসী এঁকে নামেই শুধু নাগাবাবা বলে না, মনেপ্রাণে নিজের পিতা বলে মানে, ভক্তি করে, ভালবাসে, সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে সব সময়েই চরণে আশ্রয় নেয়। তিনিও যেন বুকে করে ধরেন। এমন কঠিন কঠোর সন্ন্যাস-ব্রত, তবু কী গভীর স্নেহ-ভালবাসা। চলুন দেখবেন গিয়ে।

কথামৃত শুনি। মন আনন্দে ভরে ওঠে। ভাবি কিছুই ত জানা ছিল না এঁর সম্বন্ধে। অথচ, দূর থেকেই আজ প্রথম দর্শনেই তাঁর মঙ্গলময় আলোর স্নিগ্ধ স্পর্শ অজানিতভাবেই অনুভূত হয় কেমন ক'রে।

সুড্ বলে চলেন, সারা চম্বাতে নাগাবাবার কী বিরাট প্রভাব, তার বহু ঘটনা বলতে পারি। একটা ছোট ঘটনা শোনাই। সাধারণ লোকের কথা ছেড়ে দিন, চম্বার স্বাধীন রাজা, এমন কি বড় বড় ইংরেজ অফিসাররাও এখানে এসে এঁর দর্শন করে যেতেন, পায়ের ধূলা নিতেন। নিজেদের বড় বড় কাজেও পরামর্শ চাইতেন। একবার ভারমোরে মদের একটা দোকান খোলার অনুমতি পায় এক বড় ব্যবসাদার। জায়গাও ঠিক হয়। ঐখানে মন্দিরগুলির নিকটে। সেইখানেই ত লোকদের বসতি, সকাল সন্ধ্যায় মেলামেশা। দোকান খোলা নিয়ে পাহাড়ীদেরও মহা উৎসাহ। অথচ স্থানীয় জনকয়েক ভাল লোকের আপত্তি। ওদিকে গভর্ণমেন্ট সদর দপ্তরে ব্যবসাদারটির প্রবল প্রভাব। অর্থবল ত আছেই। তাই কোন আপত্তি টেকে না। তিনি বুক ফুলিয়ে এখানে দোকান খোলার আয়োজন করেন। দাঙ্গাহাঙ্গামার সূত্রপাতও দেখা দেয়। অগত্যা সাহেব কমিশনার নিজেই চলে আসেন এখানে অনুসন্ধানে। এসেই জিজ্ঞাসা করেন, নাগাবাবা কোথায়? সোজা তাঁর কাছে যান। সব ঘটনা বলেন। নাগাবাবা শুনে অভিমত জানান, নেহাৎ দোকান যদি খুল্‌তেই দাও, মন্দিরের কাছে ত নয়ই, বাজারের মধ্যেও নয়—শহরের একদম বাইরে।

সাহেব আর কাউকে কিছু না জিজ্ঞাসা করে তখনি সেইমত অর্ডার দিয়ে ফিরে যান। বলেন, নাগাবাবার আদেশ। তার ওপর আর কারো কোন কথাই চল্‌তে পারে না। —অথচ, খাস সাহেব কমিশনার! এখন মদের দোকান পাঁচ মাইল দূরে।

ডাক্তার গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে ছিলেন, এইবার কথা বলেন, আশ্চর্য দেশ, মশাই,

এসব। আমাদের বিচার বুদ্ধি দিয়ে এদের নাগাল পাওয়া যায় না। নাগাবাবা ত অসীম শক্তিশালী পুরুষ বটেই, এদেশের রাজাও বলা চলে। কিন্তু সাধারণ ঘটনাও যে-সব ঘটে দেখি, তার কার্য-কারণ ধরতে পারি না। তাই, এখন এ-সবে বিশ্বাসও করতে সুরু করেছি। আপনারা এলেন মণিমহেশ যাত্রায় অসময়ে। এই ক'দিন আগে রাধাষ্টমী তিথিতে যাত্রা হয়ে গেল। জন্মাষ্টমীতে হয় শুরু, রাধাষ্টমীতে শেষ। সে সময়ে এলে আরও কতো কী দেখতেন।

আমি জানাই, ভিড়ের মধ্যে আমার ভাল লাগে না, তাই ইচ্ছে করে যাত্রার সময় এড়িয়ে সব জায়গায় যেতে চেষ্টা করি।

ডাক্তার স্বীকার করেন, সুস্থির হয়ে একান্তে দর্শন করতে হলে তাই করতে হয়। কিন্তু যাত্রার সময় কি রকম অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে, আমার নিজের যা দেখা তাই বলি শুনুন। যাত্রীরা সকলে এইখানে ভারমোরে জমায়েত হয়। সে-সময়ে ক'দিন ধরে যাত্রার আনুষঙ্গিক যেমন হয়ে থাকে নাচ গান উৎসব হৈ হট্টগোল চলতে থাকে, সে-সব কথা ছেড়ে দিন। এই নাগাবাবাকে ঘিরেই সব কিছু আয়োজন, কোথায় কি করতে হবে, না হবে,—পুঙ্খানুপুঙ্খ আদেশ সব তিনিই দেন্। যাত্রা করার ক'দিন আগে থেকে অনুষ্ঠানাদি সুরু হয়। পূজাদি চলে। একজনের ওপর তখন দেবতার ভর হয়,—বলা হয় চেলা নাচানো। সহজ সাধারণ মানুষ, সম্পূর্ণ বদ্‌লে যায় দেবতা তার মধ্যে আবির্ভাব করার পরই। মূর্ছা হয়, তারপর ফুলতে থাকে, উঠে নাচতে সুরু করে, ভিন্ন স্বরে কথা বলে,—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। সেই দেবতার কাছ থেকে তখন সব যাত্রীদের একে একে অনুমতি নিতে হয়, যাত্রায় কে যাবে, না যাবে। 'না' বললে যাবার আর উপায় নেই। প্রথম যখন এখানে আসি, এই সব নিয়ম-কানুন প্রথা শুনি। আমার এখানে থাকা, সরকারী ডাক্তার হিসাবে। যাত্রাতেও যেতে হবে 'ডিউটি'তে। তাই যাওয়া-না-যাওয়ার অনুমতি চাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবু প্রথা অনুযায়ী যাত্রীদের সঙ্গে দাঁড়াতে হয়। দেবতা দেখে বলে ওঠেন, ওর যাওয়া হবে না। শুনে মনে মনে হাসি! আমার যাওয়া আবার আট্‌কায় কে? সব ব্যবস্থা করি যাওয়ার। যাত্রার আগের দিন। এইখানে পথ দিয়ে চলেছি। হঠাৎ পা মচ্‌কে এমনভাবে পড়ি, আর দাঁড়াবার উপায় নেই। পায়ের হাড় ভাঙে। যাওয়া তখন মাথায় ওঠে। ক'মাস প্লাস্টার করে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকা।—বিশ্বাস না করে উপায় কি বলুন? পরের বছর অনুমতি পাই, যাত্রা দর্শন সবই ভালভাবে হয়।

সুড্ বলেন, কেন, গত বারের ঘটনাটা শোনান্।

ডাক্তার বলেন, সে-ও এক ব্যাপার। নিজের চোখের ওপর না ঘটলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। চেলা-নাচানো যথারীতি চলেছে। একজন দেবতার কাছে জান্‌তে চান্— এবারকার যাত্রা কেমন হবে?—দেবতা উত্তর দেন্ মোটের ওপর ভালই। তবে চারজনের মৃত্যু আছে।—আশ্চর্য! ঘট্‌লোও তাই। হঠাৎ পথে 'ল্যাণ্ডস্লাইড্', ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ে। হৈ-চৈ! লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক। কয়েকজনের আঘাতও লাগে, এবং মৃত্যুও ঘটে— তিনজনেরও না, পাঁচজনেরও নয়, ঠিক চারজনেরই!

বলি, আশ্চর্য হবার কথাই বইকি।

সুড্ বলেন, মণিমহেশের গল্প জানেন তো? নাগাবাবার কাছে শোনা। আপনারাও তাঁর মুখে শুনবেন নিশ্চয়। কাশ্মীরে মুসলমানদের ঘোর অত্যাচার দেখে অমরনাথ

এইখানে চলে আসেন। নতুন নাম নেন্—মণিমহেশ। হিমালয়ের তুষার-রাজ্যে থাকেন। লোকে সন্ধান পায় না। একবার এক গদ্দী ভেড়া চরাতে ঐদিকের পাহাড়ে গিয়ে হাজির। শিবের নিজের পছন্দ করা নতুন কৈলাস, অপরূপ তার প্রাকৃতিক শোভা। গদ্দী দেখে তন্ময় হয়। মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখতে থাকে। হঠাৎ আকাশবাণী শোনে, কে যেন জিজ্ঞাসা করেন, এদিকে কোথায় চলেছিস্, তোর কি চাই? চম্‌কে উঠে গদ্দী চারপাশ দেখতে থাকে, মানুষও নেই, অথচ কথা বলে কে?—হঠাৎ সুমুখে এসে দাঁড়ান্ জটাজূটধারী এক বিরাট পুরুষ। আবার গদ্দীকে প্রশ্ন করেন, সে কি চায়।—গদ্দী হতভম্ব হয়ে যায়। বলে ফেলে, এক হাজার ভেড়া। সেই মহাপুরুষ তখনি বলেন, তথাস্তু। তাই পাবি। কিন্তু দেখিস, কখনো কাউকে এ-সম্পর্কে কিছু বলবি না। বললে আর আমার দেখা কখনো পাবি না। —মহানন্দে গদ্দী ফিরে চলে। এসে দেখে তার হাজার ভেড়া হয়েছে। কিন্তু, এ কী! তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, অথচ তার ভেড়ার দিকে আর কোনই আকর্ষণ নেই। তাদের দিকে তাকায় না, যত্ন নেয় না। সব সময়ে উন্মনা ভাব। ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। একদিন এক মহাত্মা আসেন মণিমহেশ দর্শনে। পথ খুঁজে পান না। গদ্দীকে দেখে পথের সন্ধান করেন। গদ্দী বলতে রাজী হয় না। বহু অনুরোধের পর সঙ্গে নিয়ে দেখাতে চলে। তার ভেড়ার পাল ও একটা কুকুরও তাদের সঙ্গ নেয়। পাহাড়ের অর্ধেকের ওপর ওঠবার পরে হঠাৎ দৈববাণী হয়, আমার নিষেধ সত্ত্বেও এদের পথ দেখিয়ে আনছিস? থাক তুই ঐখানে। —গদ্দী না পারে এগোতে, না পারে পেছুতে। ভয়ে একে একে মণিমহেশের উদ্দেশে ভেড়াগুলি বলি দিতে থাকে। দুটো ভেড়া অবশিষ্ট থাকতে আবার বাণী শোনে, যেমন আছিস তোরা, তেমনি পাথর হয়ে ঐখানে থাক।—সেই থেকে গদ্দী, দুই ভেড়া, কুকুর ও মহাত্মা পাথর হয়ে ঐখানে আছেন। একটা সাপ ও একটা কাক অজানিতভাবে তাদের সঙ্গে আসে। তারাও পাথরে পরিণত হয়। এর পর থেকে গদ্দীরা মেলার সময় হাজার হাজার ভেড়া মণিমহেশের উদ্দেশে হ্রদের ধারে বলি দিতে থাকে। আপনাদের সঙ্গে যে ফরেস্ট গার্ড থাকবে সেই দেখাবে সেইসব পাথরের মূর্তি। ভেড়ার শিঙ্ ত দেখতেই পাবেন হ্রদের তীরে ছড়িয়ে আছে।—কিন্তু, আর দেরি নয়, নীচে চলুন। নাগাবাবার দর্শন করবেন, রোজ বিকেলে আমরা সবাই তাঁর কাছে গিয়ে বসি। চমৎকার সময় কাটে। মনও শান্তিতে ভরে থাকে।—আপনারা যখন কাল সকালেই যাত্রা করছেন, শহরও আজ ঘুরে দেখে নিন।

ডাক্তার চেয়ার থেকে ওঠেন। নিজের কাজে যান্। বলেন, পরে আবার দেখা হবে।

সুড্ বলেন, ডাক্তার সাহেব, রাত্রে আজ সবাই একসঙ্গে আহার করা যাবে। কোন আপত্তি শুনছি না, আসতেই হবে।

ডাক্তার গম্ভীর মুখে বলেন, দেখা যাবে।

পরে, রাত্রে আসেন বটে, কিন্তু খান না।

॥ ১১ ॥

সুডের বাংলো থেকে পাহাড়ের প্রায় দু'শো ফুট নীচে ভারমোর গ্রামের কেন্দ্র। ব্রাহ্মণীর অরণ্য মধ্যে সঙ্গোপনে লুকিয়ে রাখা যেন এক মহামূল্য প্রাচীন রত্ন।

পাহাড়ের ঢালু গায়ে স্তরে স্তরে ঘরবাড়ী। পাথর ও কাঠ দিয়ে তৈরী। স্লেট পাথরে ঢাকা ছাদ। নীচে নেমে এসে এক ভিন্ন রাজ্য। ৭০০৭ ফুট উঁচুতে পাহাড়ের কোল জুড়ে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ। বিশাল বৃদ্ধ দেওদার-এর নিবিড় ঘন ছায়া। তারই আলো-আঁধারে এখানে-ওখানে ছড়ানো মন্দির। স্থাপত্য শিল্পকলার উজ্জ্বল উদাহরণ। যেন, তপোবনের তরুচ্ছায়ায় দীর্ঘ-দেহী প্রশান্ত মূর্তি যোগিগণ ধ্যানে মগ্ন। উন্নতশির, স্থির, নিশ্চল, চির মহামৌনী। নির্মল পরিচ্ছন্ন আবেষ্টন। মন্দিরগুলির একপাশে কয়েকটি দোকান। বসবাসের ঘরবাড়ীও। গ্রামের এই কেন্দ্রের নাম শুনি—চৌরাশী। নামকরণ সম্পর্কে জনপ্রবাদও আছে।

ব্রাহ্মণীদেবীর বাটিকা ছিল এই অঞ্চলে। পাহাড়ের অনেকখানি উপরে এখন যেখানে তাঁর মন্দির, সেইখানে তিনি থাকতেন। ব্রাহ্মণীনালার উৎসমুখের নিকটে। দেবীর এক পুত্র ছিল। তার পোষা চকোর পাখিটিকে গ্রামের এক কৃষক মেরে ফেলে। শোকে অভিভূত হয়ে বালকের মৃত্যু ঘটে। তার চিতানলে জননী ব্রাহ্মণীও নিজের প্রাণ বিসর্জন করেন। তারপর থেকে গ্রামবাসিদের উপর সেই মৃত জননীর ও চকোরের প্রেতাত্মার উপদ্রব সুরু হয়। গ্রামের লোকেরা ভয় পায়। 'দেবী' বলে তাঁর পূজা দেয়। ঐ মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করে। কিছুকাল পরে মহাদেব ৮৪ জন সিদ্ধ পুরুষদের সঙ্গে নিয়ে মণিমহেশ যাত্রায় আসেন। বাটিকার নিকটে আশ্রয় নেন। ধুনি জ্বেলে বিশ্রাম করেন। ব্রাহ্মণীদেবী তাঁর এলাকার মধ্যে এই অনধিকার প্রবেশ দেখে কুপিতা হন। বিরাট রূপ ধারণ করে তাঁদের সামনে প্রকট হন। শিবকে তখনি আস্তানা গুটিয়ে চলে যাবার আদেশ করেন। ভোলানাথ সবিনয়ে অনুমতি চান, রাতটুকু শুধু কাটিয়ে যাবেন। সম্মতি দিয়ে দেবী নিজ মন্দিরে যান। ভোর হলে দেখা যায়, সেই ৮৪ জন সিদ্ধপুরুষ লিঙ্গমূর্তি পরিগ্রহ করে অধিষ্ঠান করছেন। সেই থেকেই এই ক্ষেত্রের নাম হয়ে যায় চৌরাশী। এখনও ৮৪টি ছোট বড় মন্দির ওখানে দেখা যায়।

শিব কিন্তু ব্রাহ্মণীদেবীকে বর দেন, মণিমহেশের সব তীর্থযাত্রী প্রথমে ব্রাহ্মণী-ধারায় স্নান করবে, ব্রাহ্মণীদেবীর পূজা দেবে, না হলে তীর্থফল পাবে না।

এই অঞ্চলের সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রাহ্মণীর নাম থেকেই ব্রহ্মপুর ও ক্রমে ভারমোর নামেরও উৎপত্তি।

পাহাড়ের উপর ব্রাহ্মণীনালার ধারা থেকে নল বসিয়ে ভারমোরের জল সরবরাহ হয়। সারা বছরই জলের প্রবাহ বইতে থাকে। এখন সেই স্রোত থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের আয়োজন চলে শুনি।

সুড্‌কে হিমাদ্রি প্রশ্ন করে, দেবীর অনুমতি নিয়েছেন তো?

চৌরাশীর চত্বরে এসে দাঁড়াই। ঘুরে ঘুরে মন্দিরগুলি দেখি।

এ তো হিমালয়ের নিভৃত দুর্গম অরণ্যময় অঞ্চলের রোমাঞ্চিত আবেদন নয়। এ যেন ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির গ্রন্থশালার কুলুঙ্গি থেকে নামিয়ে দেখা চিত্রবিচিত্র এক অমূল্য পুঁথি। প্রস্তরফলকে লেখা শিলালিপি, নিপুণ শিল্পীর হাতে গড়া প্রস্তর ও দারুময় মন্দির। অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য। চম্বার প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারে এই লিখনগুলি সাহায্য করে। এ ছাড়া, ''চম্বা বংশাবলী''তে ও কুলুর ইতিহাসে মরু বা জয়স্তম্ভের স্থাপিত রাজবংশের অনেক নৃপতিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুদীর্ঘ এই রাজবংশের ধারা। চম্বা সহরে দশম শতকে নতুন রাজধানী স্থাপনার পূর্বে অন্তত তিন চার শ' বছর ধরে এই ভারমোর থেকে রাজ্য শাসন করতেন চম্বার রাজারা। প্রায় দেড় হাজার বছর ব্যাপী এই রাজবংশের ইতিহাস। জগতের আর কোন ইতিহাসে একই রাজবংশের এমন সুদীর্ঘ জীবন ছিল কিনা জানি না। ইউরোপে অস্ট্রিয়ার হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ (Hapsburg) রাজবংশ ৬০০ বছর স্থায়ী ছিল।

তাম্র ও শিলালিপি রচিত বংশাবলী, রাজ-প্রশস্তি-বচন ও জনপ্রবাদ,—সব মিলে ভারমোরের যে পুরানো কাহিনী গাঁথে, আজ এই তপোবনের সভাতলে দাঁড়িয়ে মন্দিরগুলি যেন তারই আবৃত্তি শোনায়।

প্রাচীন রাজাদের মধ্যে ৬২০ খ্রীষ্টাব্দে আদিত্যবর্মণ বা আদিবর্মণ রাজ্যভার পান। তিনিই প্রথম 'বর্মণ' উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু এই বংশের প্রথম যে রাজার নাম ও কীর্তি বিপুল খ্যাতিলাভ করে, তিনি আসেন ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে। নাম তাঁর মেরুবর্মণ। যুদ্ধ জয় করে তাঁর রাজ্যসীমা তিনি সুদূর প্রসারিত করলেও তাঁর স্থায়ী কীর্তি রেখে যান—এই ভারমোরে কয়েকটি অপরূপ মন্দির। দীর্ঘকাল পরেও এখনও সেই মন্দিরগুলি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মণিমহেশ বা হরিহর, লক্ষ্মণাদেবী, গণেশ ও নরসিংহদেব—এই মন্দিরগুলি তাঁরই আমলের। মণিমহেশ মন্দিরের সামনে পিতলের জীবন্ত প্রমাণ প্রকাণ্ড বৃষমূর্তি,—তাতে শিলালিপিও আছে। সূর্যমুখ মন্দিরও তাঁরই সময়ের বলে প্রচার। চম্বার রাজা কেউ ভারমোরে এলে প্রথমে এই সূর্যমুখ মন্দিরে পূজা করে তবে প্রাসাদে উঠতেন—এই প্রথা ছিল। লক্ষ্মণাদেবীর মন্দির ছাড়া অন্য মন্দিরগুলি ও কয়েকটি মূর্তি বিদেশী আক্রমণকারী 'কিরা' দলের অত্যাচারে কিছু কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শিলালিপিতে এই মন্দিরগুলি নির্মাণের শিল্পীগুরুর নামেরও উল্লেখ আছে—গুগা। দেবালয়গুলির সৌন্দর্যই তাঁর একমাত্র পরিচয়, অন্য কোন পরিচয় তাঁর জানা নেই। ভগবতী লক্ষ্মণাদেবীর মন্দিরের সুমুখভাগে কাঠের উপর কারুকার্য অতীব মনোহর। গণেশের মন্দিরে গজাননের অষ্টধাতুর মূর্তি। এ ছাড়া চতুর্দিকেই শিব-মন্দির। একটি বাঁধানো কুণ্ডও আছে। প্রবাদ, একদিন শিবপার্বতী গণেশকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণ করছেন। হঠাৎ পার্বতীর মনে পড়ে, সেদিন গয়ার তীর্থ জলে স্নানের পুণ্যতিথি। গয়ায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু এখনি আবার হিমালয় ছেড়ে গয়াযাত্রা! শিব সম্মত হন না। পার্বতী বিমর্ষ হন। মাতৃভক্ত গণেশ তখনি ভূমিতে শরনিক্ষেপ করেন। সপ্তধারায় জল নির্গত হয়। ভারতের সকল পবিত্র নদ-নদীর বারিধারা দিয়ে এই কুণ্ডের সৃষ্টি হয়। নামও হয়ে যায়—অর্ধগয়া।

এই সকল মন্দিরের বিস্তারিত বর্ণনা Hermann Goetz-এর Early Wooden Temples of Chamba-তে দেওয়া আছে।

৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন অজিয়বর্মণ। কারও-কারও বিশ্বাস, এঁরই রাজত্বকালে দিল্লী অঞ্চল থেকে যে ব্রাহ্মণ ও রাজপুতরা এখানে আসেন তাঁরাই গদ্দীদের পূর্বপুরুষ।

৮২০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হলেন মুষণবর্মণ। এর জীবন ইতিহাস ঘটনা-বৈচিত্র্যময়। অষ্টমশতকের শেষভাগে এঁর পিতা লক্ষ্মীবর্মণ কিছুকালের জন্য রাজা হন। কিন্তু বিদেশী 'কিরা' আক্রমণকারীগণ তাঁকে হত্যা করে রাজ্য অপহরণ করে। মুষণবর্মণ তখন মাতৃগর্ভে। রানীকে পালকির মধ্যে নিয়ে ওয়াজীর ও রাজপুরোহিত কাংড়া অভিমুখে পালিয়ে চলেন। পথিমধ্যে গর্ভযন্ত্রণায় কাতর হয়ে রানী এক গুহায় আশ্রয় নেন্ ও সন্তান প্রসব করেন। শত্রুদের হাতে প্রাণনাশের আশঙ্কায় সন্তানকে গুহায় ফেলে রেখে ফিরে আসেন। ওয়াজীর ও পুরোহিত প্রশ্ন করে ঘটনা জানতে পারেন। গুহায় গিয়ে দেখেন অনেকগুলি মূষিক রাজপুত্রকে ঘিরে পাহারা দিচ্ছে। শিশুটিকে তুলে নিয়ে তাঁরা চলে আসেন। এই কারণেই তাঁর নামকরণও হয় মুষণবর্মণ। পরে রানী ও পুত্র কাংড়ায় এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আশ্রয় নেন্ এবং সেই ব্রাহ্মণকে গুরুপদে বরণ করেন। একদিন হঠাৎ সেই বালকের পদচিহ্ন চোখে পড়ায় ব্রাহ্মণ বিস্মিত হয়ে দেখেন রাজপদচিহ্নের লক্ষণ। রানীকে প্রশ্ন করেন। প্রকৃত বৃত্তান্তও অবগত হন। সুকেতের রাজার কাছে গিয়ে সব কথা জানান। সেই থেকে সুকেত রাজপরিবারে তাঁরা আশ্রয় পান। পরে সুকেত রাজকুমারীর সঙ্গে মুষণবর্মণের বিবাহ হয় এবং সৈন্যবল সংগ্রহ করে আবার ব্রহ্মপুর—ভারমোরে এসে তাঁর নিজের রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। মুষণবর্মণ রাজ্যভার ফিরে পাবার পর তাঁর রাজ্যকালের আর কোন ঘটনা জানা যায় না বটে, তবে তাঁর রাজ্য হবার পর থেকেই তাঁর রাজ্যে মূষিক হত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয় এবং চম্বা রাজবংশে আধুনিক কালেও সেই নিয়ম মেনে চলা হোত। প্রাসাদে বা আবাসস্থলে মূষিক দেখলেও মারা নিষেধ।

মনে পড়ে, রাজস্থানে বিকানীর জেলায় দেশনোকগ্রাম। সেখানে করনীমাতার প্রসিদ্ধ সুবিশাল মন্দির। শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু কিলবিল করে ঘুরে বেড়ায় মূষিকের দল,—চত্বরে, গর্ভগৃহে চতুর্দিকে। অথচ ইঁদুর মারা নিষেধ। যাত্রীদের পায়ের উপর দিয়ে ইঁদুর চলে যায়। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আধো অন্ধকারে অতি সাবধানে পা টেনে টেনে চলতে হয়,—পাছে অজানিত ভাবে পায়ের ভারে কোন মূষিকের প্রাণনাশ ঘটে।

জানি না, এই দুই বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞার মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে কিনা।

৯২০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন সহিলবর্মণ। চম্বার ইতিহাসে ইনি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এঁরই রাজত্বকালে ভারমোর থেকে রাজধানী উঠিয়ে চম্বা শহরে স্থাপিত হয়। তাঁর কন্যা চম্বাদেবীর ও অন্যান্য আরও কয়েকটি প্রচলিত কাহিনী পূর্বেই বলেছি। তিনি বহু যুদ্ধে জয়ী হন। চম্বা রাজ্যের সীমানাও বিস্তৃত হয়। সহিলবর্মণের যুদ্ধ অভিযানে নিত্যসঙ্গী থাকতেন চর্পটনাথ নামে এক যোগী। রাজ্যপরিচালনায় ও নতুন রাজধানী স্থাপনার সকল কার্যেও সহায়ক ও উপদেষ্টা ছিলেন সেই যোগী। চম্বা সহরে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের নিকটে চর্পটনাথেরও এক মন্দির পরে স্থাপিত হয়। সহিলবর্মণ যে মুদ্রার প্রচলন করেন তাতেও এই যোগীর প্রতিকৃতি মুদ্রিত হয়।

সহিলবর্মণ পুত্র যুগাকরের হাতে রাজ্যভার দিয়ে আবার এই ভারমোরেই ফিরে আসেন ও এইখানেই চর্পটনাথ ও অন্যান্য যোগীদের সঙ্গে সন্ন্যাসজীবন যাপন করেন।

ভাবি, ভারমোরেরও কি বিচিত্র পরিণতি! রাজার এককালীন রাজধানী, আবার সিংহাসনত্যাগী সেই রাজারই সন্ন্যাসজীবনের যোগাশ্রম।

ভারমোরে রাজাদের প্রাচীন প্রাসাদ এখন নিশ্চিহ্ন। চৌরাশীর অল্প উপরে এক ময়দান—চৌগান। সেইখানেই প্রাসাদ ছিল বলে প্রচার।

চৌরাশীর প্রাঙ্গণে পুরানো কয়েকটা বাড়ীতে এখন সরকারী দপ্তর বসে। ১৯০৫ সালের ভূমিকম্পে সে-গৃহগুলিরও জীর্ণ অবস্থা। নতুন সরকারী ঘরবাড়ী এখন তৈরি হচ্ছে। সহর-সভ্যতারও অনুপ্রবেশ ঘটছে। এখন লোকসংখ্যা ৭২০। পুরুষ ৩৮১, মহিলা ৩৩৯।

॥ ১২ ॥

নরসিংহদেবের মন্দির সংলগ্ন নাগাবাবার আশ্রম। তিনিই এখন এই নির্বাপিতপ্রায় দেবস্থানের যেন শেষ জ্যোতি।

সুড় খবর নিয়ে আসেন, 'বাবা' এইমাত্র দর্শন দেওয়া শেষ করে অন্দরে গেছেন, আপন সান্ধ্যক্রিয়াদিতে বসতে।

মনে মনে প্রণাম জানাই। বলি, কাল সকালে যাত্রার আগেও বোধহয় দর্শনের সময় থাকবে না। ফিরে এসে নিশ্চয় দর্শন মিলবে।

নিকটেই পুরানো কয়েকটি বাড়ি। জীর্ণ ম্লান অবস্থা। এখন সেখানে সরকারী তহশীলখানা ও ডাকঘর। রাজার পান্থশালায় এখন হাইস্কুল বসে। প্রাচীন গরিমা ও স্থাপত্য-সৌন্দর্য আধুনিককালের প্রয়োজনীয়তার যূপকাষ্ঠে প্রাণ হারায়।

ভারমোরের প্রধান মন্দির কিন্তু এখানে নয়। সহর থেকে দূরে পাহাড়ের বেশ খানিক উপরে। ব্রাহ্মণীদেবীর অতি প্রাচীন মন্দির। সেখান থেকেই জলের ধারা নীচে সহরে নেমে আসে। ভারমোরের প্রাচীন নাম ব্রহ্মপুর। এই ব্রাহ্মণীদেবীর নাম থেকে নামকরণ।

ব্রহ্মপুর লোকমুখে ভারমোর হয়।

ঘুরে ঘুরে প্রাচীন তীর্থগুলি দেখি।

নাগাবাবার এখন দর্শন না পাওয়ায় মনে দুঃখ থাকে না। ভাবি, সহরে প্রবেশ করার সময় অজানিত ও অযাচিত দর্শনে, কেন জানি না, মন তখনি শ্রদ্ধায় নত হয়েছিল। আবার যথাসময়ে নিশ্চয় দেখা হবে।

হয়ও তাই। তিনদিন পরে। মণিমহেশ যাত্রা শেষ করে এসে। তাঁর দর্শন যেন মণিমহেশ তীর্থযাত্রার এক অভিন্ন অংশ। সেদিন বিকালে সময়মত যাই। সুড়ই নিয়ে চলেন। ছোট হলঘরের মত চালা। সাজান গোছান কিছু নয়। কিন্তু পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। পাথর বসানো ও মাটি-নিকানো মেঝে। আসবাবপত্র নয়,—আসন ও কম্বল বিছানো। ঘরে ঢুকেই মনে হয় শূন্য ঘর, কিন্তু অদৃশ্য কীসে যে পূর্ণ হয়ে আছে। নাগাবাবা সামনে বসে। গায়ে একটা কম্বল জড়ানো। মাথা দাড়ি গোঁফ সব কামানো। দেহের উজ্জ্বল বর্ণ। চোখের প্রখর দীপ্তি, যেন আলো ঠিকরে আসে। অথচ, মুখের দিকে চেয়ে যখন কথা বলেন, সুস্নিগ্ধ কোমল দৃষ্টি। মনে হয়, অন্তর থেকে স্নেহের ধারা ঝরে পড়ে। সেই ধারাস্নানে শ্রোতার দেহ-মন

নির্মল পরিতৃপ্তিতে ভরে ওঠে। স্থির হয়ে তাঁর কথাগুলি শুনি। বিদ্যাবত্তার প্রকাশ নয়। চিরন্তন ধর্মের মূল কথা,—তারই সহজ সরল ব্যাখ্যা। শুনতে প্রাণে আনন্দ জাগে।

প্রসাদ বিতরণে নাগাবাবার মহা উৎসাহ। যে যায়, তাকে বসিয়ে ভূরিভোজন করান। বিশুদ্ধ ঘি দিয়ে তৈরি হালুয়া, কিস্‌মিস্ বাদাম দেওয়া। অপূর্ব স্বাদ। অফুরন্তও তাঁর ভাণ্ডার। শুনি, যতো দর্শনপ্রার্থীই আসুক, প্রসাদ বিতরণ চলতেই থাকে। গেলাস ভরা চাও আসে। চা ত নয়, যেন সে-ও এক সুখাদ্য। এলাচ, লবঙ্গ ইত্যাদি মেশানো। মণিমহেশের গল্প শোনান। বাঙলা দেশ থেকে আসছি শুনে শ্রদ্ধেয় শ্রীদিলীপকুমার রায়ের কথা জিজ্ঞাসা করেন। প্রয়াগকুম্ভে দুজনের সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁর প্রাণমাতানো ভজন শুনে কি অপরিসীম আনন্দ পান্ নাগাবাবা সেই কথা বলেন। তখন মনে পড়ে, শ্রদ্ধাভাজন দিলীপকুমার ও ইন্দিরা দেবীর রচিত কুম্ভ সংক্রান্ত বইখানির কথা ঃ—Kumbha India's ageless festival, তাতে পড়েছি বটে, চম্বাবাসী এক মহাত্মার সঙ্গে প্রয়াগে সাক্ষাৎকারের মর্মস্পর্শী বিবরণী। বই-এ ফটোও ছাপা হয়। কিন্তু, সে তো ভিন্ন সাজ অন্য মূর্তি। দাড়ি গোঁফ জটাধারী।

পরের দিন, ভারমোর ছেড়ে ফেরার আগে, নাগাবাবার নিকট বিদায় নিতে চলি। সে-সময়ে তাঁর যে জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখি, সে দৃশ্য ভোলবার নয়।

নাগাবাবার সাধন কক্ষ। উঁচু ছাদ, মন্দিরের মত। ঘরের কোথাও কিছু নেই। পাথরের মেঝের মাঝখানে মস্ত হেমকুণ্ড। তারই সামনে বিছানো বিশাল ব্যাঘ্রচর্ম। সেই আসনে বিরাজ করেন যোগী জয়কিষণ মহারাজ। পরনে শুধু কৌপীন। অনাবৃত দেহ। কপালে ভস্মের প্রলেপ। যেন, পাথর কেটে শিল্পীর গড়া মূর্তি। শক্তিমান্ তেজোদীপ্ত। উন্নতশির। কথা বলেন না। ধীরে কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি! তাকিয়ে দেখেন। নিস্পন্দ দেহ, শুধু মনে হয়, ঠোঁটের কোণে স্নিগ্ধ মধুর হাসির অস্ফুট রেখা। নয়নকোলে স্নেহাশীর্বাদের করুণাধারা। মাথা নত করে বেরিয়ে আসি। আনন্দে মন ভরে থাকে। যেন না-বলা কতো বাণী প্রাণের গোপনপুরে শুনি।

কয় বছর পরে তাঁর তিরোধানের সংবাদ আসে। মনে হয়, কোথায় অমূল্য কি-যেন হারিয়ে যায়।

॥ ১৩ ॥

২৪শে সেপ্টেম্বর। সকাল আটটায় মণিমহেশপানে যাত্রা সুরু। সুড় ও স্থানীয় নতুন বন্ধুরা এগিয়ে দিতে কিছুদূর সঙ্গে চলেন। গ্রাম ছাড়িয়ে মাইল খানেক আসেন। ফিরে যেতে অনুরোধ করলে বলেন, চলুন, আরও একটু সঙ্গে যাই।

সামনে প্রকাণ্ড ধ্বস। রাস্তা ভাঙা। সেই পর্যন্ত এসে দেখিয়ে দেন, পাকদণ্ডীর কোন্ পথ ধরে পাহাড়ের চড়াই পথে চলতে হবে। সেইমত পথ ছেড়ে উঠতে থাকি। তাঁরা শুভেচ্ছা জানিয়ে ফিরে চলেন।

পাইন বনের মধ্যে দিয়ে চলা। গাছ ত নয়, যেন কতো পরিচিত বন্ধুদের সমাবেশ। সুমিষ্ট সুবাস। সরু পথ। ঘুরে ঘুরে ওঠে। সকালের মধুময় আবহাওয়া। বাতাসের শীতল

স্পর্শ। ধীরে ধীরে চড়াই উঠি, এগিয়ে চলি। সঙ্গে সুড়্-এর ব্যবস্থা করে দেওয়া একজন কুলি ও ফরেস্ট গার্ড। অনেকখানি আসার পর দুই দিকে দুটো পথ। ফরেস্ট গার্ড থম্‌কে দাঁড়ায়। কোন্ পথে যাবে, সন্দেহ লাগে। ভাগ্যক্রমে আর এক ফরেস্ট গার্ড হঠাৎ হাজির হয়, ঠিক পথ বলে দেয়।

ভারমোর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে ভ্রুঙ্গলা গ্রাম। পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলি ঘরবাড়ি। ভারমোরের ফরেস্ট গার্ড এখান থেকে ফিরে যায়। নতুন গার্ড সঙ্গে চলে। সঙ্গের কুলিও আর যেতে চায় না। বলে নিজের গ্রাম থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। ফিরে যাব।

হিমাদ্রি বখশিশের লোভ দেখায়। কোনই কাজ হয় না। কেবলি বলে, অনেক দূরে এসেছি গাঁও ছেড়ে, আর এগোব না।

হিমাদ্রি প্রশ্ন করে, তবে যাবে বলে এসেছিলে কেন? মণিমহেশ কি তোমার ঘরের পাশে এসে থাকবেন?

ফরেস্ট গার্ড আর একটা লোককে আনে—এই গ্রাম থেকে।

নতুন ফরেস্ট গার্ড—নাম শেরচাঁদ। দেখতে সুশ্রী। সাহেবের মত রঙ। বেশভূষারও চাকচিক্য আছে। ভাল গরম ফুলপ্যান্ট। ডোরাকাটা রঙিন পশমী জ্যাকেট। লাল হলুদ কালো রঙ। হিমাদ্রি হেসে বলে, শেরচাঁদ, বাঘের মতনই তোমাকে লাগছে।

মাথায় ফরেস্ট গার্ডের সবুজ ক্যাপ। মুনিয়াল পাখীর পালক গোঁজা। মালপত্র, যতো সামান্যই হোক না, নিজে বয় না। আপন সরকারী পদের মর্যাদা সম্পর্কে সব সময়েই সজাগ। দেখে হিমাদ্রিকে বলি, তোমার এ-ডি-সি চললো সঙ্গে।

বনের পথ ধরে আবার চলা। পথে লোকজন খুবই কম। দূরের বরফের পাহাড়গুলি আরও নিকটে আসে। শুনি, মণিমহেশের শিখর কাছের পাহাড়ে ঢাকা পড়ে আছে।

আরও মাইল চার গিয়ে পথের অল্প উপরে সাণ্ডি ফরেস্ট রেস্ট হাউস। সুন্দর বাংলো। ফুলের বাগানও। চৌকিদারকে ডাকাডাকি করেও পাওয়া যায় না। ঘরে তালা লাগানো। অগত্যা বারান্দায় বসে সঙ্গে-আনা পরোটা ও সবজি খাওয়া হয়। কিন্তু তৃপ্তি হয় না। ক্ষুধা মেটে, তৃষ্ণা যায় না। খোঁজাখুঁজি করেও এক ফোঁটা জলের সন্ধান মেলে না। গাছ ভরতি, টমাটো। তাই তুলে খাওয়া হয়। গলাও ভেজে।

এখনও নীচের দিকে পথ ভাঙা। জঙ্গলের রাস্তা ধরে ঘুরে চলি। পথঘাট শেরচাঁদের ভালভাবে জানা দেখি। পথের ভাঙা অংশ এড়িয়ে আবার পথে নামি। শেষের দিকে বড় ঝরণা।

বেগে জল সোজা নামে। চারিপাশে পাথর। জলে ভিজে পিছল হয়ে আছে। কোথাও বা পাথরের গা বেয়ে ধারা নামে। পাথরগুলির উপর দিয়ে জলস্রোত ডিঙিয়ে চলা। শেরচাঁদ এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে সাহায্য করে।

মাইলখানেক সোজা পথ। নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে চলি। হাড়্‌সার গ্রাম দেখা যায়। এ-পথের শেষ গ্রাম ও লোকালয়। বড় গ্রাম। মনে হয় আট হাজার ফুট-এর উপর উচ্চতা। পথের ডানদিকে সামান্য উপরে মন্দির। সব বাড়ীর ঢালু ছাদের উপর ভুট্টা শুকায়। যেন গেরুয়া চাদরে ঢাকা। বেলা দুটো বাজে। ডান্‌চু আরও পাঁচ মাইল।

শেরচাঁদকে বলি, চলো, এগিয়ে যাই; সেইখানেই আজ রাত কাটাব। কাল মণিমহেশের

শেষ চড়াই সকালে ওঠার অনেক সুবিধা হবে।

সে জানায়, দেখি এখানে কতোক্ষণ সময় লাগে। দুদিনের খাওয়ার জন্যে আলু, চাল, আটা সংগ্রহ করতে হবে, নিজের ও কুলির জন্যে কম্বলও ভাড়া নিতে হবে। তা'ছাড়া মণিমহেশের পাণ্ডাদের গ্রাম এইটে। একজন পাণ্ডাও সঙ্গে যাবে এখান থেকে। খাবার ও কম্বল যোগাড় হয়। পাণ্ডাও যোগ দেয়। আশ্চর্য হই শুনে, তার দাবি দাওয়া কোন কিছুই নেই, যে যেমন দেয়, তাই খুশি মনে নেয়। যাত্রীদের সঙ্গে যাওয়া তাদের কর্তব্য, তাই পালন করে।

ভাবি, অজানা পথ। সবাই ভয় দেখাচ্ছে, এখন যাওয়া সম্ভব হবে না,—সঙ্গে দু'একজন বেশি লোক থাকা,—মন্দ কি!

ব্যবস্থা সবই ঠিক হয়। কিন্তু হঠাৎ আবার বৃষ্টি নামে। শেরচাঁদ চিন্তিত হয়। বলে, পাহাড়ের ওপরে ডান্‌চুতে বরফ পড়তে সুরু হবে, পৌঁছুতে পারা যাবে না, বিপদ ঘটতে পারে।

তার সুন্দর বেশভূষা জলে না ভেজে তাই ঘরের দাওয়ার কোণে আশ্রয় নেয়।

আমার ভাবনা অন্য দিকে। হিমালয়ের বৃষ্টি যখন হয় হঠাৎ নামে, আবার হঠাৎ থামে। যেন, দেবতার খেয়ালখুশি। বিচারবুদ্ধি দিয়ে সব সময়ে নাগাল মেলে না। এ-বৃষ্টি হয়ত এখনি থেমে যাবে। হাতে প্রচুর সময়। সামনে পথ পড়ে। কাল যদি আরও দুর্যোগ নামে! সাময়িক আরামের লোভে বা অবহেলায় বসে থাকি কেন?

শেরচাঁদকে উৎসাহিত করি, তুমি সঙ্গে রয়েছ। ভয় করি না কিছুই। চলো এগিয়ে যাই, এমন কিছু জল নয়। পৌঁছে যাব ঠিক।

আড়াইটের মধ্যেই যাত্রা করি। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি চলতে থাকে। অল্প পরেই থেমে যায়।

মাথার উপর নীল আকাশ উঁকি মারে। চারিদিকের গাছপালা জলে ভিজে ঝলমল করে। হিমাদ্রি আনন্দে বলে, এ-যেন ছোট ছেলেদের খেলা। এই ভাব; এই বিবাদ। এই হাসি, এই কান্না!

হাড়্‌সারের নীচে ভুডল নদী। নদীর অপর পারে, শুনি, চোবিয়াগ্রাম। পাহাড়ের মাথায় চোবিয়া পাশ্‌। সেখান থেকেও লাহুল যাওয়া যায়।

ভুডল নদী নীচে বাঁ হাতে রেখে এগিয়ে যাই। খানিক পরে পথ দু'ভাগ হয়। বাঁদিকের পথ নেমে যায় নদীর তীর ধরে, দূরে বরফের পাহাড়ের দিকে চলে। শেরচাঁদ বলে, ঐ রাস্তা ধরে মাইল বারো গেলে কুগ্‌তি গ্রাম। সেদিকেও কুগ্‌তি পাশ্‌ হয়ে লাহুলে নামবার পথ। চন্দ্রভাগার উপত্যকায় ত্রিলোকনাথের নিকটে পৌঁছে দেয়। আমরা ধরি ডান দিকের পথ। পাহাড়ের গা দিয়ে মাইল খানেক এসে নীচে এক ছোট নদীর ধারে নামি। ডান্‌চুনালা। ভুডল নদীতে গিয়ে মেশে। এই ডান্‌চুনালা ধরে আমাদের যাত্রাপথ। ভুডল নদী বাঁদিকে পড়ে থাকে।

ডাইনে আমাদের পথ ঘোরে। ডান্‌চুনালা সুন্দরী পাহাড়ী বালা। কলস্বনে বহে চলে। পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে। কখনো জলের একেবারে কিনারায় পথে এসে নামে, কখনো বা নদী ছেড়ে কিছু ওপরে ওঠে। সঙ্কীর্ণ উপত্যকা। দুই তীরে ঘন সবুজ গাছপালা। সামনে অল্প দূরেই বরফ ঢাকা পাহাড়ের চূড়া। দেখা যায়, উপর থেকে নদী নেমে আসে

গিরিসোপান বেয়ে। সবুজ বন যেন তার উত্তরীয়। সাদা ফেনা যেন পায়ের রূপার নূপুর।

নদী নামে। পথ ওঠে। ধীরে ধীরে আনন্দে আমরাও চলি। মেঘহীন আকাশ। চিন্তাশূন্য মন।

পথের বাঁক ঘুরে হঠাৎ সামনে দেখি, এক সাধু পথের উল্টো দিক থেকে নেমে আসেন। একা। মাথায় অল্প জটা। গায়ে কম্বল। খালি পা। হাতে চিমটা। মুখে, চোখে, গায়ের রঙে নিদারুণ শীতভোগের সুস্পষ্ট চিহ্ন। কালচে ঝলসানো ভাব। ঠোঁট গাল ফাটা।

অভিবাদন করে প্রশ্ন করি, দর্শন করে এলেন?

বলেন, হাঁ। এই ত নামছি। তোমরা এদিকে কোথায় চলেছ?

উদ্দেশ্য শুনে গম্ভীর হন। হাত নেড়ে বলেন, মণিমহেশ! তাগৎ নেই হ্যায়। বহোৎ বরফ। লৌট যাও, লৌট যাও।

কথা শুনে মনে ভয় জাগে না। যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়ে। হেসে বলি, যতোটুকু পারি এগিয়ে ত যাই। ভাগ্যে কি আছে দেখা যাক।

তিনি আবার ভয়াবহ পথ, নিদারুণ শীত ও প্রচুর তুষারপাতের উল্লেখ করেন। বারংবার হাত নেড়ে নিষেধ করেন এগিয়ে যেতে। গম্ভীর মুখে পাহাড় থেকে নেমে চলেন।

ভাবি, এ-সবই দেবতার পরীক্ষা মাত্র। অভীষ্ট লাভের পথে বাধার সুস্বাদ।

তিনদিন পরে এই সাধুজীর সঙ্গে আবার হঠাৎ-ই দেখা। মণিমহেশ দর্শনান্তে ভারমোরে ফিরে চলেছি। সাণ্ডি ফরেস্ট বাংলোতে চৌকিদারের ঘরের সামনে দেখি সাধু ভোজন করেন, একমনে, পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে। আবার অভিবাদন করি। হিমাদ্রি এগিয়ে যায়, হেসে জানায়, স্বামীজী, ঘুরে এলাম যে! শিউজী খুব ভাল দর্শন দিলেন!

সাধু কোন কথা বলেন না। মুখ গম্ভীর করে অন্যদিকে তাকান। দুদিন এখানে বিশ্রাম ও চৌকিদারের সেবা পেয়ে তাঁর চেহারা ফেরে দেখি।

ডানচুনালার শেষ অংশ যেন স্তরে স্তরে জলপ্রপাত। নদীর জল পাথর থেকে পাথরে লাফাতে লাফাতে নামে, আর আমরাও পাহাড় বেয়ে উঠি।

কিন্তু শারীরিক ক্লেশভোগেরও আনন্দ আছে। বেলা পাঁচটায় পাহাড়ের মাথার কাছাকাছি পৌঁছই। হাঁফ ছাড়ি, মনে তৃপ্তি পাই। বিস্তীর্ণ মালভূমি। উন্মুক্ত উদার ময়দান সবুজ গালিচা পেতে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। মাঠের মাঝে মাঝে জলের ধারা। ক্ষীণকায় ডানচুনালাও। চারিদিকে ফুল। গাছপালার চিহ্ন নেই। শুধু একদিকে অনেক নীচে ডানচুনালার যে উপত্যকা ছেড়ে আসি,—সেইখানে গাছের ভিড়। মাঠের তিনদিক উঁচু পাহাড়ে ঘেরা, সবারই মাথা সাদা বরফে ঢাকা। মণিমহেশ শিখরের খোঁজ করি। শেরচাঁদ জানায়, এখান থেকেও দেখা যায় না। হঠাৎ দেখতে পাবেন, কাল হ্রদের কাছাকাছি গিয়ে।

মাঠের এক অংশ—নদীর অপর পারে—লম্বা কাঠের ছাউনি। ধর্মশালা। সেইখানে আজ রাত্রিবাস। কাছে গিয়ে দেখি, দোতলা। পাহাড়ের গা দিয়ে ঘুরে উঠে দোতলায় ঢুকতে হয়। উপরে হেলানো কাঠের ছাদ, কাঠের মেঝে। সারি সারি তক্তা পাতা, মাথার উপরও পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে সাজিয়ে রাখার তক্তার সারি—সূক্ষ্মকোণে, Acute angle-এ। ফলে ঘরের ভিতর এমনই নীচু, ঢুকলে দাঁড়াবার উপায় ত নেই-ই, হামা দিয়ে

চলাফেরা করা চলে। যেন কোন রকমে মাচানে ঢুকে রাত কাটানো। তাতেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু প্রমাদ গণি, যখন দেখা যায়, মাথার উপরকার চালার তক্তাগুলির মধ্যে পরস্পরে সদ্ভাব নেই, বিচ্ছিন্নভাবে সাজানো, লম্বা লম্বা ফাঁক, শুয়ে বেশ আকাশ দেখা চলে। সৌন্দর্য উপভোগের পক্ষে ভালই, কিন্তু রাত্রে নিশ্চিন্ত সুস্থির বিশ্রাম—সুদূরপরাহত। বৃষ্টি নামলে বা তুষারপাত হলে বসে বসে ভেজা। অতএব নীচে থাকাই ঠিক হয়। সেখানেও একদিকে পাহাড়ের গা, অপর তিনদিক খোলা। হু-হু করে কনকনে বরফের বাতাস ঢোকে। সাধারণতঃ ভেড়াছাগল সেখানে আশ্রয় পায়, তাই মেঝে ভরতি তাদের বিষ্ঠা ও শুকনা ঘাস। শেরচাঁদ জানায়, এরই ওপর কম্বল বিছিয়ে আরামে রাত কাটান, বেশ গরমে থাকবেন!

হিমাদ্রি বলে, এমন গদি, নরম ও গরম হবে নিশ্চয়, কিন্তু গন্ধটা যে প্রাণান্তকর।

শেরচাঁদ কোথায় চলে যায়। একটু পরে ফিরে আসে। সঙ্গে একজন গদ্দীর পিঠে কিছু কাঠ, লোটাভরা দুধ। বলে, এখানে কয়মাসের জন্যে ভেড়াছাগল চরাতে যে-সব গদ্দীরা এসেছিল, সবাই এখন ফিরে গেছে। এরা দু-তিনজন এখনও রয়েছে, কাল-পরশুর মধ্যে এরাও নেমে যাবে।

ভেড়ার দুধ। তা হোক। কফি দিয়ে গরম গরম খেতে অপূর্ব লাগে, ঘরের মধ্যে আগুনও জ্বলে। আরাম পোহানো যায়। বাইরে বৃষ্টিও শুরু হয়।

হিমাদ্রি বলে, সব প্রোগ্রাম যেন সাজিয়েগুছিয়ে রাখা। পথ চলতে এ-বৃষ্টি নামলে আমরা ত ভিজতামই, বিছানাপত্রও শুকনো থাকত না। এখন আরামে শোয়া যাক। কিন্তু যা বিকট দুর্গন্ধ!

মাঝ রাতে প্রচণ্ড শীতে ঘুম ভাঙে। আগুন নিবেছে। পায়ের দিক থেকে ঘরে হু-হু করে হাওয়া ঢোকে। গরম গেঞ্জি, পুলওভার, মঙ্কি-ক্যাপ, গরম মোজা, গরম প্যাণ্ট—যা কিছু আছে সব পরে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকেছি,—তবু মনে হয়, খালি গায়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডাজলে ভাসছি। হাড়ের মধ্যে বরফের বাতাস প্রকৃতই হুল ফোটায়।

দুজনে হি-হি করে কাঁপি। কোনরকমে রাতটা কাটলে হয়। দেহের এমন অস্বস্তি, অথচ মন-ভরা অসীম আনন্দ। বাইরে দেখা যায় গাঢ় নীল আকাশ, অযুত তারার হীরক-হাসি, তুষার-শিখরের রহস্যময় হাতছানি।

মণিমহেশ!—কাল দর্শন পাব।

।। ১৪ ।।

হিমাচলের আশ্চর্য মহিমা। সারারাত ঘুম নেই। তবু দেহের গ্লানি বা অবসাদও নেই। প্রসন্ন মনে পূর্ণ উদ্যমে যাত্রার আয়োজন হয়। ফেলে-আসা পথ—সে যেন কোন্ অতীত যুগের জগৎ। আজ এক নবীন মানুষ নতুন জগতে জাগে।

সকাল আটটায় যাত্রা। ছয় মাইল দূর—মণিমহেশ হ্রদ।

সকালের শীতের প্রকোপ ত আছেই, তার উপর হিমাচলের তুষার-শীতল বাতাস। চারিদিকের পাহাড়ের মাথায় কাল রাত্রে পড়া আরও নতুন বরফ। সকালের শীতে যেন

সাদা চাদর আরও টেনে মাথা মুখ ঢেকে, রোদের আশায় অতি-বৃদ্ধদের সাগ্রহ প্রতীক্ষা। আমরা চলি প্রথম দিকে কয়েক-পা দ্রুতপদেই। সহজে শরীরে তাপ নামে। শীতবোধও দূর হয়। কিন্তু সামনেই মণিমহেশের প্রসিদ্ধ শেষ চড়াই। তাই, আবার যথারীতি ধীরপদে চলতে থাকি। আকাশ নির্মেঘ। মনেও গভীর আনন্দ। ভাবনা-চিন্তা শূন্য। পাথর বিছানো পথ। কেবলই উঠে চলে। খাড়া পাহাড়, পাথর কেটে ধাপ করা। কোথাও বা পাথরের উপর পাথর সাজানো,— সিঁড়ির মতন। এক এক জায়গায় এক হাঁটুর উপর উঁচু হাতে ভর রেখে উপরের ধাপে ওঠা। কখনো কখনো আলগা পাথর, অসমানও। অতি সাবধানে পা রেখে উঠতে হয়। কালো বড় বড় শিলা। জল ও বরফের সংস্পর্শে এসে কোথাও বা অতীব মসৃণ। উঠবার পথে তেমন ভয়ের কারণ থাকে না। কিন্তু বুঝতে পারি ফেরবার পথে সতর্কতার প্রয়োজন হবে। এসময়ে পাথরের উপর মাঝে মাঝে ক্বচিৎ জলের ধারা পেলেও বরফ কোথাও নেই। বৃষ্টির সময় এ-পথের দুর্গমতা কল্পনা করা যায় না। বরফে ঢাকা পড়লে হয়ত চলাই যায় না। পথের এই অংশের নামও তাই বান্দরঘাঁটি। মানুষ চলার উপযোগী জায়গা নয়। হাতে পায়ে ভর রেখে ওঠা। তবুও, উঠতে তেমন কিছু কষ্টবোধ হয় না। অতি ধীরে—যতো ধীরেই হোক না কেন—না থেমে এক এক পা করে উঠতে থাকলে অতি দুরূহ চড়াইও এক সময়ে শেষ হয়ই। বান্দরঘাঁটির চড়াইও দেখতে দেখতে নিঃশেষ হয়। পিছনে দূরে দেখা যায়, ডানচুর মালভূমি, ধর্মশালা নদীর শীর্ণ রেখা। ডানদিকে সামনের পাহাড়ের এক অংশে ডানচু নদীর জলধারা পাহাড়ের উপর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে। ওখানে নদীর নাম অমরগঙ্গা। সুন্দর জলপ্রপাত। শেরচাঁদ বলে, যাত্রার সময় ঐ ধারার নীচে মাথা পেতে স্নান করার প্রথা। লোকে বলে একসময়ে জলের তোড়ের মুখে মেয়েরা পাশের পাথর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ত, প্রাণও দিত। ঐ ধরনের আত্মদানের নাকি মর্যাদা ছিল, মহান পুণ্যকর্ম বলে যাত্রীরা মানত। এখন অবশ্য সে-সব ধারণা গেছে।

বান্দরঘাঁটির পরও আবার চড়াই। ভৈরবঘাঁটি। মনে সঙ্কল্প ও স্ফূর্তি রেখে উঠলে কোন চড়াই অসাধ্য নয়। এ-চড়াইও শেষ হয়। বিশাল এক পাহাড় ধ্বসার অতীত চিহ্ন দেখি। বড় চড়াই-এর পর খানিকটা সমতলভূমি। পথ চলায় পায়ের পাতা সোজা পড়ে, স্বস্তি বোধ করি। কিন্তু, দেহের আরাম, ক্লেশ সবই সাময়িক। সুমুখে আবার পাহাড়ের শ্রেণী। পাথরের পর পাথর। তারই মধ্যে দিয়ে ঘুরে পথ ওঠে। গিরিশ্রেণীর মাথায় আসি। গিরিপথের মত দেখতে লাগে। মনে করি, এই বুঝি চড়াই-এর সমাপ্তি। গুরু-গম্ভীর হিমালয়েরও বিচিত্র পরিহাস-স্পৃহা। উপরে উঠে দেখা যায়—সামনে আরও উঁচু পাহাড়।

হোক আবার চড়াই, মনে ভয়-ভাবনা নেই। পরম আনন্দ জাগে—নতুন জগতের স্বাদ পেয়ে। বরফের রাজ্যে এসে পৌঁছুই। চারিদিকে শুধু পাথর, বরফ ও জলের ধারা; নিকটেই ছোট হ্রদ। পাণ্ডা বলে, গৌরী কুণ্ড, এইখানে মণিমহেশ তীর্থযাত্রী সকলেরই স্নান করা বিধি। পথের পাশে তুষার-গলা ছোট নদী। নীল স্বচ্ছ ধারা। জলের ভিতর প্রতি বালুকণাটি দেখা যায়। নদীর উপর ছোট তক্তা ফেলা। সেতুর কাজ করে। ওপরে আবার চড়াই। বিশেষ কিছু নয়। ঢালু পাহাড়ে গা। নতুন পড়া বরফে ছেয়ে আছে। পায়ের চাপে কাঁচের মত বরফ ভাঙে। আনন্দে উঠে চলি। আর অল্প উঠে সুমুখের ঐ চড়াইটুকু শেষ হলেই মণিমহেশ হ্রদ। শেরচাঁদ বলে, ফিরে তাকান—ওদিকে ঐখানে মণিমহেশ শিখর।

এখন মেঘে ঢাকা, কিছুই দেখা যায় না।

ফিরে তাকাই। দেখি, হালকা ফগ্-এ আচ্ছন্ন সেদিকের দিগন্ত। হিমাদ্রি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। অতি বিষণ্ণ বদনে বলে, কিছু যে দেখি না ওদিকে! এতো কষ্ট করে আসা,—শেষে কি—

থামিয়ে দিই কথার মাঝে। উৎসাহ দিই, এগিয়ে চলো, ভাবনা কিসের? করুণাময় হিমালয়, যাত্রা কখনই ব্যর্থ হবে না, দেখো।

দেখতে দেখতে হ্রদের ধারে উঠে আসি। বেলা সাড়ে বারোটা। ছয় মাইল পথ—চার ঘণ্টার উপর লাগে আসতে। হ্রদের নিকটে নতুন ফরেস্ট-বাংলো। সবে সম্পূর্ণ হয়েছে। হিমাদ্রি বলে, এর কথা ত কেউই বলেনি। আমাদের সুড্ সাহেবও নয়। জানা থাকলে এইখানেই রাত কাটানোর ব্যবস্থা করা যেতো। এ-যে স্বর্গরাজ্য!

প্রায় চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে হ্রদ। মাইলখানেক হয়ত পরিধি। চারি পাশে বরফের পাহাড়। হ্রদের তীরেও মাঝে মাঝে বরফ পড়ে। হ্রদের জলের উপরও তুষার আচ্ছাদন, কোথাও মনে হয় আধ ইঞ্চি পুরু হবে। যেন ঘন দুধের উপর সাদা মোটা সর। কোথাও কোন মন্দির নেই, দেব-মূর্তিও নেই। হ্রদের একপাশে জলের নিকটে মাটিতে কয়েকটি ত্রিশূল পোঁতা; কয়েকটি শিবলিঙ্গও। শেরচাঁদ বলে, যাত্রীদের রেখে যাওয়া। যাত্রার সময় যাত্রীরা হ্রদের তীরে তাঁবু খাটায়। সারারাত ভজন ও কীর্তন চলে। গদ্দীরা দলে দলে বহু ভেড়া বলি দেয়।

দেখি তাই, ভেড়ার শিঙ অনেক ছড়িয়ে আছে চারিধারে।

হ্রদের আশপাশে ঘুরে ফিরে দেখি। হ্রদের উপর মেঘের ম্লান ছায়া।

হঠাৎ মেঘ চিরে রোদ ফোটে। হ্রদের ও চারিদিকের শুভ্র তুষারের লক্ষ-প্রদীপে আলোক শিখা যেন কাঁপতে থাকে।

হিমাদ্রি উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, দেখুন, দেখুন—তাকিয়ে দেখুন!

সামনের ফগ্ অকস্মাৎ উড়ে চলে। দিগন্তের আবরণ মুক্ত হয়। যেন দেবতার মন্দিরের রুদ্ধ দুয়ার খোলে।

চারি পাশের তুষার-কিরীট গিরিপ্রহরী। তারই মাঝে নীল আকাশে মাথা তুলে, মণিমহেশ-শিখর। সবার মধ্যে বিরাজ করেও স্বতন্ত্র। উন্নত-শির, ধ্যান-গম্ভীর। ত্রিকোণ আকৃতি। যেন, শিবলিঙ্গ।

সাগরবক্ষ থেকে ১৮,৬৫৪ ফুট উঁচু। শিখরের গায়ে কোথাও তুষার, কোথাও বা পাথর। যেন পূজা-শেষে শ্বেত পদ্ম ও বিল্বপত্রের পুষ্পাঞ্জলির নিদর্শন। পাথরগুলি এমনি বিচিত্রভাবে সাজানো, দেখায় যেন শিখরের গায়ে সহস্র ত্রিশূল গাঁথা। কোথাও বা মনে হয় জীব-জন্তুর আকার। চূড়ার অনেক নীচে তুষারাবৃত সেই ধরণের কয়েকটি পাথর দেখিয়ে শেরচাঁদ বলে, ঐ হোল গদ্দী, ভেড়া, মহাত্মা, কাক ও সাপের পাথরে পরিণত মূর্তি। মনে পড়ে, সুড্-এর বলা কাহিনী।

তিব্বতে কৈলাস-শিখর যেন দেবতার প্রতীক, এখানেও তেমনি মণিমহেশ-শিখরই স্বয়ং শিবলিঙ্গের প্রতিকৃতি। তারই পাদদেশে তুষার-গলা নির্মল হ্রদের প্রশান্ত বিস্তৃতি। যেমন, কৈলাসের কোলে গৌরীকুণ্ড।

হ্রদের একপাশে একটি পাথরের উপর একা স্থির হয়ে বসি। অদৃশ্য নিম্ন-উপত্যকা

থেকে আবার পুঞ্জীভূত মেঘকুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে থাকে। মণিমহেশের অঙ্গ ঘিরে ধীরে বায়ুভরে ওঠে। দেখায় যেন, বেদিমূল থেকে ধূপ-ধূনার ধূম ঘুরে ঘুরে ওঠে। মণিমহেশ সেই ধূমের আবরণে অদৃশ্য হন। বাতাসে সে ধূমরাশি পুনরায় ভেসে যায়। মণিমহেশও আবার প্রকাশ পান। সূর্যের আলো পড়ে, রুপার অলঙ্কারে সজ্জিত-দেহ গিরিরাজ উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করেন। হ্রদের অপর অংশে স্বচ্ছ জলে মণিমহেশের প্রতিবিম্ব কাঁপে।

শব্দহীন মহান নিস্তব্ধতা। স্বর্গীয় অনুপম শোভা। শান্ত সমাহিত ধ্যানমগ্ন বিরাট হিমালয়। একদৃষ্টে দেখতে থাকি। আবার হারিয়ে যাই অসীমের মাঝে। পৃথিবীর সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধন, যশ, মান, অভিমান সবকিছুই নিরর্থক মনে হয়। অতি স্নিগ্ধ সুগভীর প্রশান্তি অন্তর উজ্জ্বল করে রাখে। হিমালয়-পথের এই অপার্থিব অমূল্য দান নতশিরে প্রাণভরে গ্রহণ করি।

পাহাড়-পথে সিম্‌লা থেকে চক্‌রাতা

॥ ১ ॥

সাজানো শৌখীন হিল-স্টেশনের সৌন্দর্য আছে। আধুনিক সভ্যজগতের রুচিসুলভ বহু আকর্ষণও থাকে, ঠিকই। কিন্তু, আমার তাতে মন ভরে না।

মানুষের হাতে সাজানো পরিপাটি বাগান। কাঠি দিয়ে সোজা করে রাখা গাছের সারি। তাতে ফুলের বাহার।—এর শোভা,—এক প্রকার।

আবার, পাহাড়ের কোলে ঝরণার ধারা। চারিপাশে ছড়ানো শিলা। জলের ধারে কচি সবুজ ঘাস। তারি মাঝে ছোট ছোট চারার মাথায় ফুল। বাতাসে হেলে দুলে দোলে।—সে-ফুলের সৌন্দর্য, ভিন্ন রকম। অনুপম।

সে-বছর ঠিক পূজার মুখেই সিমলা শহরে পৌঁছুই। ট্যুরিস্টদের ভিড় শুরু হয় উদ্দাম বেগে—যেন গঙ্গায় বান আসে। সবাই ব্যস্ত হয়ে বাসা খোঁজেন। আমি তখন সিমলা থেকে দু-দিনের আশ্রয় ছেড়ে হিমালয়ের অজানা নতুন পথে পা বাড়াই।

লোকে সিমলা আসে কালকা হয়ে। ট্রেনে অথবা মোটর, বাস্‌-এ। আমার আসা ভিন্ন পথে। ক'দিন আগে পাঠানকোটে ট্রেন ছাড়ি। চম্বা উপত্যকা অতিক্রম করে তুষার-রাজ্যে মণিমহেশ হ্রদ ও শিখর দর্শন হয়। আবার পাঠানকোটে ফিরে বাস্‌ ধরে কুলু ভ্যালিতে যাই। সেখানে মণ্ডিতে এক গাড়োয়ালী বন্ধু তখন ফরেস্ট অফিসার। হিমালয়ের মধ্যে বন্ধুর সাদর আমন্ত্রণ যেন গিরিদেবতারই অলঙ্ঘ্য আদেশ। তাই আগে দেখা থাকলেও কুলু ভ্যালিতে আবার চলি। বন্ধুর সঙ্গে ঘুরি। পুরানো জায়গাও নূতন বেশে মনে আবেশ আনে।

তারপর মণ্ডি থেকে বাস্‌-এ পাহাড়-পথে সিমলা আসা। এ-পথও আগে দেখা। তবু আসার উদ্দেশ্য,—হাঁটাপথে সিমলা থেকে পাহাড়ের উপর দিয়ে মুসৌরী পৌঁছানো। আমার কাছে তাই সিমলার আকর্ষণ নেই। পথ চলার মাঝপথে এই হিল স্টেশন যেন রাত্রিবাসের সরাইখানা।

নতুন পথের ব্যবস্থার জন্যে একদিন বেশি-ই কাটাতে হয়। তবুও ভাগ্য ভাল,—এসে দেখি, যাত্রাপথের প্রায় সবই আয়োজন করে রাখেন স্থানীয় প্রবাসী এক বন্ধু।

আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়ে তিনি বলেন, ক'দিন ঘোরাঘুরি করে এলেন। দুদিন সুস্থির হয়ে এখানে বিশ্রাম করুন। পরশু থেকেই ত পূজো শুরু। পূজোর পর রওনা হবেন। প্রবাসী বাঙালীদের পূজার আনন্দ-উৎসবটা দেখুন। বহু লোকজন আসে। থিয়েটারের রিহার্সাল চলেছে। তা ছাড়া, আপনাদের হাঁটাপথের খানিকটা অংশ এখন এখান থেকে বাস্‌ চলে,—হয়ত জুব্বল পর্যন্ত ; তাতে তিন-চারদিন হাতে থাকবে।

রাজী হই না। বলি, জানেনই তো, শহরের লোকজন, হট্টগোল—এ-সব ছেড়েই তো আসা। এখন হিমালয়ের নির্জন শান্তপথে পায়ে হাঁটার আনন্দ-লোভে মন উদ্‌গ্রীব। পরশুই রওনা হই।

বন্ধু বোঝেন। হাসেন। নিজেও ঘুরেছেন পাহাড়ের পথে। তাই আমার কল্পনা-লোকের আনন্দ তাঁরও মনে সুমধুর দীপ্তি ছড়ায়। যেন, সকালে ঘরের জানলা খুলতেই এক ঝলক রোদ এসে পড়ে।

বন্ধু জানান, চলুন, একবার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অফিসে। সেখানে এখন এক বড় অফিসার—বাঙালী। এ-সব পথ তাঁর নখদর্পণে। পথঘাট সম্বন্ধে পরামর্শ নিয়ে নেবেন।

অফিসারও যাওয়ার কথা শুনে উৎসাহ দেন। বলেন, এখান থেকে মুসৌরী—পাহাড়ের হাঁটাপথে—এককালে সাহেবদের খুব 'ফেভারিট্ ট্রেকিং' ছিল, আজকাল ত কেউ-ই যায় না। দেখে আসুন—পাহাড়, ভ্যালি, গভীর জঙ্গল—খুব আনন্দ পাবেন। যাত্রাপথের প্রথম অংশটা হিমাচল প্রদেশে, তারপর উত্তরপ্রদেশ। হিমাচল প্রদেশের রেস্ট হাউসগুলির পারমিট এখান থেকেই পেয়ে গেছেন, উত্তরপ্রদেশের বাংলোগুলির পারমিট দেরাদুন থেকে পাওয়া যায়,—সেগুলি নিশ্চয় আপনাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি? দরখাস্ত পেয়ে তারা হয়ত চৌকিদারদের কাছেই সোজা ওখান থেকে খবর পাঠিয়েছে। তবু, এক কাজ করুন, একটা চিঠি লিখে দিই ও-পথের সব ফরেস্টার ও রেঞ্জারদের উদ্দেশ করে,—যাতে পথে কোন অসুবিধে না হয়। পারমিটগুলি দেরাদুন থেকে না এলেও এতে কাজ দেবে।

চিঠি সই করবার সময় হেসে বলেন, উত্তরপ্রদেশ অঞ্চল আমার এলাকায় নয়,—এখানে আসার আগে দেরাদুনে ক'বছর ছিলাম,—তাই চিনবে, খাতিরটাও এখনও নিশ্চয় করবে। তবে, পাহাড়ে ঘুরতে সর্বত্রই দেখেছেন, লোকগুলি কতো ভাল, আর ও-পথে বাংলোতে জায়গা সব সময়েই পাওয়া যায়।

ভদ্রলোক প্রকাণ্ড ম্যাপ ছড়িয়ে হিমালয়ের কোন্ দিক দিয়ে পথটা গিয়েছে ভাল করে বুঝিয়ে দেন। ম্যাপ-এর উপর কতকগুলি হাতে-টানা মোটা লাইন দেখি। জিজ্ঞাসা করায় মন্তব্য করেন, ও আর বলেন কেন? 'বাউণ্ডারি ডিসপিউট' (boundary dispute) চলেছে। পঞ্জাব, হিমাচল ও উত্তরপ্রদেশ—এই তিন স্টেটের মধ্যে—হিমালয়ের পাহাড়-রাজ্যে ঠিক কোন্‌খানে কার সীমা! কমিশন বসেছে আজ ক'বছর। কয়েক লক্ষ টাকাও বোধ হয় খরচ হয়ে গেল। স্বাধীনতা পেয়ে নিজেদের মধ্যেই এলাকা নিয়ে বিবাদ!

সিমলা থেকে মুসৌরী হাঁটাপথে প্রায় ১৫১ মাইল। তার মধ্যে সিমলা থেকে জুব্বল—৪৮ মাইল—এখন বাস্ চলে, শুনি। একদিনেই পৌঁছানো যায়। হাঁটাপথের দূরত্বও, অতএব, একশো মাইলের একটু বেশি থাকে।

সঙ্গী হিমাদ্রি বলে, দেখুন, আবার আমার জন্যেও ওদিকেও মাইল চল্লিশ আরও কমে না যায়। হয়ত চকরাতা থেকেই দেরাদুনে নেমে যেতে হবে। ১১ই অক্টোবর সেখানে আমাকে ট্রেন ধরতেই হবে, নইলে ছুটির পর খোলবার দিনে অফিসে যোগ দেওয়া হবে না। ক্ষতি হবে।

বলি, ক্ষতি যাতে না হয়, সেইমতই করবে। আমার অবশ্য ইচ্ছা, মুসৌরী পর্যন্ত হাঁটবার। শেষটুকু না হয়, না হবে। একবার মুসৌরী থেকে চকরাতার ঐ পথে এসেছিলাম—যমুনার পুল পর্যন্ত। তাই সেদিকটা খানিক দেখা। চমৎকার লেগেছিল। সেই যমুনোত্রীর পথে দেখা যমুনা,—নদীর সে-রূপ, যেন বালিকা বয়স। নীল ঘাগরা পরে ছুটে ছুটে নামে। পাহাড়ের সোপান বেয়ে। রূপার নূপুর পায়ে। আর মুসৌরী চকরাতার

মাঝপথে যমুনার সে আর-এক রূপ। হিমালয়ে পিতৃগৃহের অন্দরমহলের দিনগুলি শেষ হয়ে আসে। নদীর বিস্তৃতি বাড়ে, জলভারে টলমল করে—যেন, যৌবনমদমত্তা। সমতলভূমিতে ছড়িয়ে পড়ার আগে উদ্বেল চঞ্চলতা!—দেখলে তুমিও আনন্দ পেতে!

হিমাদ্রি গম্ভীর হয়। কি যেন ভাবে। বলে, যাক গে চাকরি,—চলুন শেষ পর্যন্তই যাব।

হেসে বলি, তা হয় না। চাকরির টান! মন খুঁতখুঁত করবেই। অথচ হিমালয়-পথে চলার সত্যিকার আনন্দ থাকে তখনি যখন কোনই পিছুটান থাকে না। ভাবনা-লেশহীন মনেই এ-পথে আসতে হয়। শূন্য মন ভরে ওঠে মধুময় প্রশান্তিতে।—চলো, দেখা যাক, যতোদূর তুমি নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারো। ভয় নেই, ক্ষতি তোমার হতে দেব না।

॥ ২ ॥

৪ঠা অক্টোবর, ১৯৬২।

ভোরে সিমলা থেকে বাস্ ছাড়ে। শহর ছাড়িয়ে পাহাড়ের নিস্তব্ধতা ভেঙে ছুটে চলে। পরিচিত পথপল্লী পুরানো স্মৃতির দুয়ার খোলে। কতো ছবি মনে ফোটে।

সিমলা ছাড়িয়ে আসি, সানজৌলী টানেলের মধ্যে দিয়ে। অল্প এগিয়ে বাঁ দিকে মাসোবরার বাস্ পথ। সিমলা থেকে পাঁচ মাইল। মোড়ের মাথায় দোকান, ঘরবাড়ি। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে বাস্ আবার চলে—হিন্দুস্থান-তিব্বত রোড ধরে।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে থাকি। এই ত মাত্র ক'বছর আগেকার কথা। পাহাড়ের ঐ বাঁ দিকে বাঁক ঘুরে যে পথটি বড় বড় গাছের ভিড়ে লুকিয়ে গেল,—ঐদিকেই মাসোবরার বসতি। সে-বছর এসে এক বন্ধুর কাছে কয়েক দিন আনন্দে কাটাই। ঐখান থেকেই সে-বার এই বাস্-পথ ধরে চিনিভ্যালিতে যাই। কিন্নর দেশ দেখে আসি।

হঠাৎ মনে পড়ে, এই মাসোবরাতে একদিন এক বাঙালী ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হয়। সরকারী কাজে ঐখানে থাকেন। বয়স অল্প। কলকাতা থেকে পাস করা। ছোট একখানা ঘরে বাস করেন। আসবাবপত্র কোন কিছুই নেই। চারপাশেই সংযম ও কৃচ্ছ্রসাধনার কঠোর চিহ্ন। জিজ্ঞাসা করি, একেবারে এই দূরদেশে হিমালয়ের নির্জন অঞ্চলে এসে পড়লেন? ব্যাপার কি? বাড়ির পানে টান নেই?

মুচকে হাসে। তারপরেই গম্ভীর হয়। ধীরে ধীরে বলে, একেবারে প্রথম পরিচয়েই নিজের কথা বলব? তা বলি। আপনাকে শোনাতে, কেন জানি না, মনে সঙ্কোচ জাগছে না,—বিশেষ করে এই হিমালয়ে। বাড়ির টান, বলছেন? তা আছে বলেই ত এখানে আসা। আছেন সেখানে সবাই—শুধু বাবা-ই নেই।

মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তা বলে যা ভাবছেন,—সে-সব এখন কিছু হয় নি। যে-সঙ্কল্প নিয়ে আসা, শেষ না করে ও-সব কথা ভাববও না। ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনা ভাল লাগতো। ভাল ছাত্র বলে নামও ছিল। মনে মনে ইচ্ছা ছিল, ভাল ভাবে পাস করে বিলেত যাব—উচ্চশিক্ষার জন্যে। পাসও ভাল ভাবেই করি বটে। কিন্তু, বিলেত যাওয়ার ইচ্ছা মনেই মিলিয়ে যায়। বাবা হঠাৎ মারা যান। সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে। বাঙলা দেশেই চাকরির চেষ্টা করি। পাই না। বড় বড় কর্তাদের গিয়ে ধরি। তাঁরা বড় বড় কথা

শোনান,—এই তো সবে পাস করলে।—এখনি ভাল মাইনের চাকরি আর কোথায়? ডাক্তার হয়েছ—ভাল ভাবে পাসও করেছ—গ্রামে গিয়ে বোসো,—দশজনের উপকার হবে। টাকা রোজগার তেমন নাই বা হল। দেশের জন্যে 'সাকরিফাইস' করতে শেখ,—ইয়ং ম্যান! আর নেহাৎ সরকারী চাকরি যদি চাও-ই, এখন শ'খানেক টাকার মত একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে।—নিরাশ হয়ে ফিরে আসি। একদিন কাগজে হঠাৎ চোখে পড়ে হিমাচল প্রদেশের এই সরকারী চাকরির বিজ্ঞাপন। দরখাস্ত পাঠাই। পেয়েও যাই। অগত্যা দেশ ছেড়ে চলেও আসি এই দূরদেশে।

মুখ তুলে আমার দিকে তাকায়। ম্লান হাসিমুখে বলে, কিন্তু এটা হল বাইরের কথা। মনে করছেন হয়ত টাকার লোভেই এখানে আসা। কিন্তু তা নয়। অর্থের আমার প্রয়োজন ঠিকই। কিন্তু, নিজের জন্যে নয়, আমার ভাই-এর জন্যে। বি. এস্-সি পরীক্ষায় সে অনার্স পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে পাস করেছে, এখন এম. এস্-সি পড়ছে, এরই মধ্যে কিছু রিসার্চও আরম্ভ করেছে। প্রোফেসাররা তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক আশা রাখেন। আমারও বিশ্বাস, জীবনে নিশ্চয় সে উন্নতি করবে। তার বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা—আমার চেয়ে অনেক বেশি, আমি জানি। আমার নিজের বিলেত যাওয়া হয় নি। না হোক। কিন্তু তাকে উচ্চশিক্ষার জন্যে সেখানে পাঠাতেই হবে। তাই টাকাও জমাচ্ছি।

তার কথাগুলি শুনে আনন্দ পাই।

আজ বাস্-এ বসে তার সেদিনের মুখচ্ছবি মনে ফুটে ওঠে, ঠোঁটের কোণে চোখের তারায়, মুখের রেখায় তার দৃঢ় সঙ্কল্পের এই শান্তগম্ভীর অভিব্যক্তি। হিমালয়ে বসে এ-ও ত এক সাধনা।

জানি না আজ সে কোথায়, তার সেই ভাই-ই বা কোন্খানে!

॥ ৩ ॥

মাসোবরার পথ ছাড়িয়ে হিন্দুস্থান-তিব্বত রোড-এ আরও চার-পাঁচ মাইল গিয়ে কুফরি। পাহাড়ের মাথার দিকে বাস্ বেশ খানিক উঠে আসে। খানকয়েক ঘরবাড়ি, দোকান, সুন্দর ডাকবাংলো। পাহাড়ের মাথায় ঢেউখেলানো মাঠ। আট হাজার ফুটেরও উপর উঁচু। শীতকালে প্রচুর বরফ পড়ে। যেন সাদা কাপড়ে চারিদিক ছেয়ে থাকে। ট্যুরিস্টরা তখন দলে দলে আসেন—বরফের উপর সিয়িং (ski) করতে। সে-সময়ে এখানে নীরব শান্ত প্রকৃতির নির্মল শুভ্র তুষার আবরণ। আর, রঙ-বেরঙের বিলাতী সাজ-পোশাক-টুপি পরা ট্যুরিস্টদের ভিড়। স্টিক হাতে, লম্বা কাঠ পায়ে বেঁধে বরফের উপর সবেগে ছোটাছুটি,—উচ্ছ্বসিত কলহাস্য। যেন শান্তমূর্তি সদ্যবিধবার কোলে শিশুদের দুরন্তপনা।

এ-সময়ে কুফরির ভিন্নরূপ। সবুজ গাছপালা। পাহাড়ের বুকে ফুলের মেলা। নিস্তব্ধ শান্ত প্রকৃতি। জনবিরল পথ। শুধু শব্দ তুলে ছুটে চলে যাত্রীভরা বাস্।

সিমলা থেকে বারো মাইল দূরে ফাগু (৮৩২৮ ফুট)। আরও ছয় মাইল গিয়ে থিয়োগ (৭৪২১ ফুট)। সিমলা-তিব্বত রোড-এর সঙ্গে এইখানে ছাড়াছাড়ি। সে-পথ চলে যায় সোজা—নারকাণ্ডার দিকে। সে-বছর কিন্নর-দেশে যাবার সময় সেই পথে যাই। এখন

জুব্বলের বাস্ নেমে চলে ডাইনের নতুন পথ ধরে। পাহাড়ের গা বেয়ে নীচের দিকে। সাত মাইল গিয়ে চেল্লা। আরও নয় মাইল এগিয়ে কোট্খাই। সিমলার সুপ্রসিদ্ধ আপেল বেশির ভাগ সরবরাহ হয় দু'জায়গা থেকে। নারকাণ্ডা ছাড়িয়ে বুসায়ার অঞ্চলে কোট্গার থেকে ও আর এক এই কোট্খাই। এখান থেকে দারঘোটি আরও সাত মাইল। দেখতে দেখতে বাস্ এগিয়ে চলে। প্রয়োজনমত গ্রামে গ্রামে থামে। যাত্রী নামে, নতুন যাত্রী ওঠে। সামনে উঁচু পাহাড়। বাস্ ধীরে উঠতে থাকে। গিরিশ্রেণীর মাথায় পাশ্। পাশ্-এর অপর দিকে রুক্ষ পাথর। ভাঙা পাহাড়। খানিক নেমে বাস্ থামতে বাধ্য হয়। জায়গার নাম শুনি, খাড়া পাথর। হিমাদ্রি বলে, ঠিকই নামকরণ বটে—একেবারে খাড়া পাথর। তাই কেটে কোনমতে বাস্-এর রাস্তা করা। সামনেই দেখুন পাহাড়ের ধ্বস—রাস্তা বন্ধ!

ড্রাইভারও জানায় গাড়ি আর যাবে না—এইখান থেকে হেঁটে জুব্বল যেতে হবে,—বাস্ সিমলায় ফিরে যাবে।

কথাবার্তা শুনে বেশ বোঝা যায়,—কিছুদিন থেকে এই পর্যন্তই বাস্ চলাচল হচ্ছে,—অথচ সিমলায় টিকিট কাটার সময় যাত্রীদের এ-সংবাদটুকু জানাবার দরকার বোধ করে না।

হিমাদ্রি উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, আবার এখান থেকে হাঁটা?

আমি বলি, হাঁটবার কথা তো সেই সিমলা থেকেই,—এতোখানি পথ না হেঁটেই একদিনে আসা হল, তাই ভাবো না?

হিমাদ্রি অগত্যা কুলির সন্ধান করে। নিকটেই একটা বস্তি। খোঁজ-খবর নিয়ে এসে জানায়, লোক পাওয়া যাবে না। সবাই রাস্তা তৈরির কাজে লেগেছে। একটা ঘোড়াওয়ালা যাচ্ছে জুব্বলে, তার ঘোড়ার ওপর মাল বয়ে নিয়ে যেতে রাজী।

অনেকখানি নীচে ভ্যালি দেখা যায়। শুনি, সেইখানে এক পাহাড়ী নদীর ধারে জুব্বল শহর। সামনের পাহাড়ের বাঁকের জন্যে শহরের ঘরবাড়ি এখান থেকে চোখে পড়ে না।

ঘোড়ার উপর মাল তুলে পাহাড়ী লোকটি সঙ্গে চলে। পাকদণ্ডীর পথ দিয়ে অনেকখানি নেমে আবার বড় রাস্তা পাই। দুপুর একটা বাজে। গাছপালা কম। রোদের তেজে পাথর তাপে। মনে হয়, হিমালয় যেন অগ্নিপরীক্ষা নিয়ে তবে পথ হাঁটার আনন্দ পুরস্কার দেবেন। ভাগ্যক্রমে চড়াই নেই। উৎরাই-এর পথও নামে ধীরে ধীরে, পাহাড়কে আবেষ্টন করে। শুন, মাইল পাঁচ মাত্র দূর। যতোই হোক, যেতেই হবে। যাই-ও তাই। মাইলখানেক থাকতে নীচে নদীর ধারে শহরের ঘরবাড়ি দেখা যায়। কয়েকটি বেশ বড় পাকাবাড়ি—তিন-চারতলা। নদীর উপত্যকায় বড় বড় গাছপালা। ওপারে পাহাড়ের গায়ে ঘন বন। এপারে শহরের আশেপাশে চাষের ক্ষেত। পথের ডান দিকেও পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে চাষের জমি—terraced cultivation—নদীর নীল-জল ও তরুলতার সবুজ রঙ দূর থেকেও চোখে ও মনে স্নিগ্ধতার প্রলেপ মাখায়। উৎসাহে শেষ পথটুকু দ্রুতই নেমে চলি। দেখতে দেখতে জুব্বলে পৌঁছুই।

পি. ডবলিউ. ডি-র ডাকবাংলো। সিমলা থেকে আগেই কামরা রিজার্ভ করা। সুন্দর বাড়ি। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে মুখহাত ধুই। চৌকিদার চা করে দেয়। তৃপ্তিভরে পান করি। দেহের অবসাদ কাটে। মনে সজীবতা ফেরে। অল্প আগের পথের ক্লান্তি যেন পিছনে পথের পাশেই পড়ে থাকে। ঘরে বসে থাকতে মন চায় না। হিমাদ্রি

বলে, সিমলায় শুনেছি, এখানে একজন বাঙালী ডাক্তার থাকেন। অবশ্য পূজোর মধ্যে সিমলা যাওয়ার তাঁর নাকি কথা। চলুন না, খবর করা যাক—এখনও এখানে আছেন কিনা?

আমি বলি, চলো, খোঁজ করা যাবে। কিন্তু আরও একটা দরকারী কাজ রয়েছে,—ফরেস্ট রেঞ্জারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে—এখান থেকে পোর্টারের ব্যবস্থা করার জন্যে।

হাসপাতাল নিকটেই। বিকেল পাঁচটা বাজে। ডাক্তার বারান্দায় চেয়ারে বসে। তরুণ যুবক। সামনে দু'তিনজন পাহাড়ী রোগী। আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখেন। অভিবাদন করে বলি, রোগী নই। হাসপাতালের কাজেও আসা নয়। আপনার কাজ শেষ করে নিন। বাঙলা দেশ থেকে আসছি, নিছক আলাপ করাই এখন উদ্দেশ্য।

আনন্দের আতিশয্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। বলেন, সামান্যই কাজ বাকি। এখনি শেষ করে নিচ্ছি। 'অফিস আওয়ার্স'-ও হয়ে গেছে। বসুন আপনারা,—এই দু'মিনিটেই তৈরি হব।

হনও তাই। চেয়ার ছেড়ে ওঠেন। বলেন, চলুন বাসায়—এই পাশেই—মিনিট চারেকের পথ। আপনারা এসে হাজির হলেন কোত্থেকে?—এই পাণ্ডববর্জিত দেশে! দু-বছর এখানে কাটল। আসার পর এখানে কোন বাঙালীর মুখ দেখি নি—অবশ্য সিমলা গেলে দেখাসাক্ষাৎ হয়,—তাও অনেকদিন যাওয়া হয় নি। দাঁড়ান, দাঁড়ান—মালপত্র কোথায় আপনাদের?

বলি, ব্যস্ত হবেন না। ডাকবাংলোতে উঠেছি। ব্যবস্থা করা ছিল। এখানে শুধু রাত্রিবাস। কাল সকালেই আবার রওনা। চলেছি হাঁটাপথে চকরাতায়—সময় থাকে ত মুসৌরী।

পথ চলতে চলতে ডাক্তার মুখ ফিরিয়ে তাকান। আশ্চর্য হন,—মুসৌরী! আপনাদের উৎসাহ তো খুব দেখছি! তা আমার এখানেই উঠলে পারতেন?

বলি, পরিচয় ত ছিল না,—অবশ্য এখনও হয় নি! বাড়িতে আছেন কে?

ডাক্তার হেসে বলেন, ক'দিন আগে পর্যন্ত ছিলাম দু'জনে। আজ দিন দশেক মাত্র হল—নবাগত একজন এসেছেন।

আনন্দ প্রকাশ করে বলি, তা'হলে শুভক্ষণেই এসেছি।

ডাক্তার হেসে বলেন, হাঁ—শুভক্ষণই বটে। যা দুশ্চিন্তায় ক'দিন কেটেছে, বলবার নয়। সত্যিই নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। বিয়ে হয়েছে বছর দুই,—এই প্রথম সন্তান। দেশে আমার মা বাবা রয়েছেন, শ্বশুরবাড়িতেও শাশুড়ী আছেন;—কিন্তু আমার খেয়াল চাপল—এইখানেই আমার কাছে হোক। নিরিবিলি থাকি, কাজেরও তেমন খুব বেশি চাপ নেই, কেন আর অযথা আর কারও ওপর এই বোঝা চাপানো। সব ভালই চলছিল ; কিন্তু এই দশদিন আগে হবার সময় থেকেই সে কী হাঙ্গামা! বাচ্চাটা যে বাঁচবে—আশাই রাখতে পারি নি। এমন আর কেউই নেই এখানে যার সাহায্য পেতে পারি, অপর আর একটা ডাক্তারও নেই যে ডেকে দেখাই বা পরামর্শ নিই। সাতদিন ধরে দিনরাত্রির সেই ছোট্ট প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা,—তার ওপর বাচ্চার মায়েরও দেখাশোনা,—পথ্যের ব্যবস্থা। সে যে কী গেছে, বোঝাবার নয়। পরশু থেকে অনেকটা ভাল আছে,—আমাদেরও

দুজনের মুখে হাসি ফুটেছে। আসুন,—এই দিকে—ঐ যে আমার বাসা।

দোতলা একটা কাঠের বাড়ি। সোজা উপরে নিয়ে চলে। সামনেই বসবার ঘর। অল্প আসবাবপত্র। বোঝা যায় সাজানো-গোছানো ছিল, ক'দিনের অবহেলায় চেয়ার-টেবিলে ধূলা জমেছে, জিনিসপত্র সামান্য অগোছাল।

পাশের দরজার পর্দা তুলে ডাক্তার চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে ভিতর দিকে তাকায়। কাকে কি যেন বলে। আমাদের ডাকে, আসুন, ভেতরে চলে আসুন।

সসঙ্কোচে এগিয়ে যাই। বলি, এই ঘরেই বসলে হত—

ডাক্তার বলে, চলে আসুন এদিকে—

পাশের ঘরে ঢুকি। খাটের উপর শুয়ে একটি মেয়ে। অতি ক্লান্ত ম্লান মুখ। আমাদের দেখে বালিশ থেকে মাথা তোলে। জিজ্ঞাসু নয়নে ডাক্তারের দিকে চায়।

আর ফেরবার উপায় নেই। অস্বস্তি বোধ করি। এগিয়ে গিয়ে বলি, তুমি ব্যস্ত হোয়ো না,—চুপ করে শুয়ে থাকো। খোকাবাবু কই?

খাটের উপর পাশে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। মুখে হাসি ফোটে। মাতৃগর্বের মহিমা ও প্রসন্নতার দীপ্তি মুখখানি উজ্জ্বল করে। অতি ধীরে সন্তর্পণে চাপা-দেওয়া চাদরখানি অল্প ফাঁক করে,—টুলটুলে গোলাপী একখানি ছোট্ট মুখ দেখা যায়। হঠাৎ যেন বাতাসে গাছের ডালপাতা নড়ে ওঠে,—আধঢাকা ফোটা একটি লাল গোলাপ ফুল চোখে পড়ে। যেমন সুন্দর, তেমনি নির্মল, নিষ্পাপ। নন্দনবনের পারিজাত।

"চমৎকার দেখতে হয়েছে তো!"

মা ফিরে তাকায়। মুখভরা হাসি। খুশী হয়ে বলে, "বলুন তো—বেশ দেখতে হয়েছে না?"

"খুব সুন্দর। তোমাকে দেখাচ্ছে যেন ছোট্ট ডলপুতুল নিয়ে শুয়ে আছ। খোকনবাবু ত এখন ভালই আছে। তুমি নিজে কেমন আছ?"

"বড্ড দুর্বল মনে হয়—নইলে ভালই। আপনারা কোথা থেকে এলেন?"—ডাক্তারকে বলে, "তুমি ত বেশ! দাঁড়িয়ে আছ? দুটো চেয়ার এনে দাও এঁদের বসতে।"

ডাক্তারের সঙ্গে হিমাদ্রিও যায়। চেয়ার আসে। সবাই বসি।

মেয়েটিকে প্রশ্ন করি, "তোমার মা থাকেন কোথায়?"

"বর্ধমানে।"

শুনেই হিমাদ্রি চেয়ারে সোজা হয়ে বসে। মাথা বাড়িয়ে বলে, "বর্ধমান? আমিও তো থাকি বর্ধমানে। আপনারা থাকেন কোন্ পাড়ায় বলুন তো?"

মেয়েটি পাড়ার নাম করে। নিজের বাপেরও পরিচয় দেয়।

হিমাদ্রি মহা উল্লসিত হয়ে বলে, "আপনি তা হলে—হাসিদি? গার্লস স্কুলে কিছুদিন পড়াতেন না?"

হাসি অবাক হয়ে বলে, "আপনি জানলেন কি করে?"

"জানব না? আমার বোন মুক্তি যে আপনার কাছে পড়েছে ; আবার আপনার বাবা আর আমার বাবা সহকর্মী ছিলেন।"

"ওমা! আপনি মুক্তির দাদা!—খুব চিনি ত আপনাদের। কী মজা! বলুন ত বর্ধমানের সব খবর। কদ্দিন যাই নি!"

দুজনের গল্প শুরু হয়।

ডাক্তারকে বলি, "আমরা দুজনে ভেসে গেলাম দেখছি,—তোমার শ্বশুরবাড়ির লোক এসে গেছে,—কি রকম গল্প জমেছে দুজনের!"

হাসি ডাক্তারকে বলে, "ওগো, আমার ত ওঠবার উপায় নেই। বাহাদুরকে ডাক দাও, চায়ের জল বসাতে বলো। বিস্কুট কি খাবার কিছু ঘরে আছে? দেখ না একটু—"

ওদের দুজনের আবার গল্প চলে। বাহাদুর আসে। গোল মুখ। চ্যাপটা নাক। ছোট্ট চোখ। ফর্সা রঙ। বেঁটে গড়ন। দেখে মনে হয় বছর আট-নয় বয়স। ডাক্তার তাকে জল চড়াতে বলে। একটু পরে নিজেও উঠে যায়। চায়েরও সব ব্যবস্থা হয়। কাল ভোরেই রওনা হব শুনে দুজনেই অনেক করে ধরে, অন্তত দু'একদিন এখানে কাটিয়ে যাবার জন্যে।

তাদের বুঝিয়ে বলি, এখন তা সম্ভব নয়। পথে ফরেস্ট বাংলোগুলি প্রোগ্রামের দিন মাফিক রিজার্ভ করা। তা ছাড়া হিমাদ্রির আবার অফিস খোলার তাড়া।

ওরা শুনে বিমর্ষ হয়। ঠিক হয়, পরের দিন সকালে এখানে প্রাতরাশ সেরে যাত্রা করা যাবে। আমি প্রথমে তাতেও রাজী হই না। বলি, গৃহকর্ত্রী শয্যাশায়িনী,—এ-সব হাঙ্গামা পোয়াবে কে? প্রয়োজনই বা কি?

ডাক্তার বলে, দরকার যথেষ্ট আছে। এ আনন্দ এখানে আর কীসে পাওয়া যাবে বলুন। তা ছাড়া বুঝতেই পারছেন, আমার শ্বশুরবাড়ির লোক এসেছে। হাঙ্গামা বিশেষ কিছুই নেই। বাহাদুরকে দেখতে যতো ছোটই হোক—ওস্তাদ ছেলে। উনি শয্যা নেবেন বলে কিছুকাল থেকেই ওকে ভাল ভাবে ট্রেনিং দিয়েছেন, বাধ্য হয়ে আমাকেও কিছু শিখতে হয়েছে।

হিমাদ্রি আশ্চর্য হয়ে বলে, ঐটুকু ছেলে—বাহাদুর—সেই কাজ চালাচ্ছে?

হাসি হেসে বলে, ওর বয়স কতো বলুন দিকি? পনেরো বছর হয়ে গেছে! দেখতেই অমন ছোট। কাজকর্ম সব পারে। করেও কেমন হাসিমুখে।

সুদূর হিমালয়ের কোন্ এক নিভৃত অঞ্চল। এক ঘণ্টা আগেও উভয় পক্ষের কেউ কাউকে চিনি না। আমার নিজের কোন পরিচয় এখনও জানাই না। তবুও, প্রবাসের এই নির্জন নিরালা ঘরখানিতে পরম-আত্মীয়-মিলনের মধুর আনন্দ যেন উথলে ওঠে।

সন্ধ্যা নামার আগে ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে শহরে ঘুরতে বার হই।

ফরেস্ট রেঞ্জার দুদিনের জন্যে বাইরে গেছেন। তাঁর সহকর্মী দুজন পোর্টারের ব্যবস্থা করে দেন। আগামীকাল সৌরী পর্যন্ত এরা যাবে।

নিশ্চিন্ত মনে শহরে ঘুরি। জুব্বলের আর এক নাম Deorha—দেওড়া। ছোট শহর। কিন্তু কয়েকটি বড় বাড়ি আছে। রাজপ্রাসাদও। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত জুব্বল করদরাজ্য ছিল। একটি সুন্দর মন্দিরও দেখি। চারিপাশে পাহাড়। মাঝ দিয়ে বহে চলে পাহাড়ী নদী; আশেপাশে পাইনের বন। অন্যান্য গাছপালাও। তারই মধ্যে পরিচ্ছন্ন শহর। শান্ত আবহাওয়া। রাস্তা দিয়ে চলতে সবাই দেখি ডাক্তারকে সম্ভাষণ জানায়। ডাক্তারও নিজে থেকেই খোঁজখবর নেন,—কার ঘরে কে রোগী ছিল, কেমন আছে, ইত্যাদি। গতানুগতিক প্রশ্নোত্তর নয়। উভয়পক্ষেরই আন্তরিকতার স্পষ্ট পরিচয় পাই। মনে আনন্দ জাগে। ডাক্তারকে জানাই, তুমি তো খুব 'পপুলার' এখানে দেখছি।

ডাক্তার হাসে। বলে, কেন জানি না—সবাই ভালবাসে আমাকে। আমারও এই পাহাড়ীদের খুব ভাল লাগে।

পথের পাশে আপেল বিক্রী হয় দেখে হিমাদ্রি বলে, গোটাকয়েক কিনে নেওয়া যাক্, পথে ক'দিন কাজ দেবে।

ডাক্তার নিষেধ করে। হিমাদ্রি বলে, কেন? ভাল নয়? দেখতে ত বেশ।

ডাক্তার বলে, খুব ভাল জিনিসই এ-সব। কিন্তু কেনবার দরকার নেই। রাত্রে আমি পাঠিয়ে দেবো,—যতো চান। আমার কম্‌পাউণ্ডের মধ্যে একটা মাত্র গাছে এ-বছরে যা ফল ফলেছে,—ক'বাক্স দেশে পাঠিয়েছি, এখানেও বিলিয়েছি—তবু ঘরে এখনও স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে। চমৎকার রসাল মিষ্টি ফল, দেখবেন খেয়ে।

হেসে বলি, তা দেখব, পাঠিয়ে দিও। কিন্তু তোমার বোঝা কমাবার জন্যে আমাদের বোঝা এমন বাড়িয়ো না যে নতুন আরও একটা পোর্টার আমাদের নিতে হয়!

জুব্বল, নদীর উপত্যকায় হলেও প্রায় ৬০০০ ফুট উঁচু। তার উপর রাত্রে এক পশলা বৃষ্টিও নামে। মনোরম শীতের মধ্যে আরামে বাংলোতে রাত কাটে।

॥ ৪ ॥

সকালে আকাশ মেঘহীন সুনীল। গাছপালা স্নিগ্ধ সবুজ। পথ যেন ডাকতে থাকে।

ডাক্তারের বাড়িতে চায়ের ভাল ভাবেই আয়োজন হয়। বিদায়কালে ডাক্তার-দম্পতি আবার আন্তরিক দুঃখ জানান,—এসেই চলে গেলেন, দুদিনও থাকলেন না। আবার যেন আসবেন নিশ্চয়।

তারপরও কয়েক বছর ডাক্তারের সঙ্গে পত্র-ব্যবহার চলে। প্রতি চিঠিতেই যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। বেহারের জঙ্গল অঞ্চলে এক খনিতে নতুন চাকরি নিয়ে চলে গেলেও সেখান থেকে লেখেন, হিমালয় না হলেও এখানেও চারিপাশে পাহাড়,—গভীর বন, অতি শান্ত নির্জন পরিবেশ। খুব ভাল লাগবে আপনার। চলে আসুন। এসে দেখবেন, খোকনবাবু হাঁটতে শিখেছে,—মুখেও কতো বুলি ফুটেছে!

কিন্তু যাওয়া আর হয় না। সেই দুদিনের পরিচয় স্মৃতির ভাণ্ডারে অক্ষয় হয়ে থাকে।

জুব্বলের নদীর উপর পুল। ওপারে গিয়ে নদীর ধার দিয়ে বাঁ দিকে পথ। সেই পথ থেকে নদীর অপর পারে পাহাড়ের কোলে ছোট শহর আরও সুন্দর দেখায়।

ধীরে ধীরে পথ চলি। চারিদিকে পাহাড়। পাশেই নদী। উপলছাওয়া গিরিপথে নেমে চলে। নীল জল। ছোট ছোট ঢেউ। সাদা ফেনা। অবিরল কলকল শব্দ। বড় বড় গাছের স্নিগ্ধ ছায়া। হঠাৎ তারই ফাঁকে এক ঝলক রোদ। আনন্দে আপন মনে এগিয়ে চলি।

হিমাদ্রি স্মরণ করায়, পোর্টাররা পেছিয়ে আছে।—নদীর ধারে পাথরের উপর দুজনে অপেক্ষা করি। আপেলের সদ্ব্যবহার হয়। পোর্টাররাও আসে। বিশ্রাম নেয়,—বেশ বোঝা যায়, মাল বহা তাদের পেশা নয়। আবার চলা শুরু। গতিবেগ সংযত করি, একসঙ্গে সবাই চলি।

মাইল ছয় পথ কেমন ভাবে কখন পিছনে পড়ে থাকে জানতেই পারি না। সামনে দেখি, পাহাড়ের গা নীচে আরও নেমে যায় নতুন আর এক বড় নদীর উপত্যকায়। দূরে ওপারের গিরিশ্রেণী—ঘন সবুজ বনময়। এপারে পাহাড়ের তলদেশে নদীর ধারে শস্যশ্যামল ক্ষেতের সারি। বাঁ দিকে নদীতীরে বড় গ্রাম। গ্রামের ঘরবাড়ি থেকে অল্প দূরে স্বতন্ত্র মাথা তুলে—মন্দির। প্যাগোডার মত চূড়া। গ্রামপথে লোকজন ঘোরাফেরা করে,—দেখায় যেন পুতুলের মত।

হিমাদ্রি বলে, ঐ তাহলে হাটকোটি। জুব্বল থেকে সাত মাইল। এখনও মাইলখানেক নামতে হবে। চলুন, পাকদণ্ডীর পথ ধরে সোজা নেমে যাই। চট্ করে পৌঁছে যাব।

বড় রাস্তা ছাড়তেই হয়। আমাদের গন্তব্য পথ ডানদিকে ঘুরে ঘুরে নদীর ধারে নামে। হাটকোটি বাঁদিকে। তাই মন্দির দর্শন করে আবার বড় রাস্তা ধরব।

পোর্টার পথ দেখিয়ে চলে। হুড়হুড় করে নেমে চলি। বাড়ি-ঘর, লোকজন, গরু-ছাগল চোখের উপর ছোট থেকে ক্রমে বড় হতে থাকে।

গ্রামের রাস্তা ধরে মন্দিরে আসি। পাথরবাঁধানো প্রকাণ্ড অঙ্গন। তারই মাঝে পাথরের মন্দির। মাথার উপর চীরগাছের কাঠের ছাউনি—চারকোণা টোপরের মত। চূড়ার উপর পাথরের আমলক ও কলস। কারুকার্য অল্পই। উঠান থেকে চাতালে উঠে—তবে মন্দিরে প্রবেশ ও দর্শন। দেখেই বোঝা যায়—প্রাচীন তীর্থস্থান।

হয়ত এককালে বিশাল মন্দিরই ছিল, কালক্রমে ভেঙে পড়ে। পরে, আবার এই মন্দিরগুলি গড়া হয়। শিলালিপিও আছে একটা। ছোট গ্রাম হলেও যাত্রীর ভিড়। দলে দলে দর্শনার্থী আসে। মেয়ে-পুরুষ, ছোট ছেলে-মেয়েও। সবারই সাজগোজ, রঙিন বেশ। হাতে পূজার ফুল, নৈবেদ্য। কেউ বা ছাগল, ভেড়া টানতে টানতে আনে,—বলির পশু। তখন মনে পড়ে,—আজই মহাষ্টমী!

এখানে আজ মেলা। দেখি, কুমারী-পূজারও এখানে প্রচলন। দেবীর কাছে 'মানসিক' করার প্রথাও আছে, শুনি। প্রার্থনা পূরণ হলে এই মহাষ্টমীর দিন এসে পূজা দেওয়ার বিধি। প্রাঙ্গণের একপাশে নাপিত বসে। যাত্রীরা মস্তক মুণ্ডন করায়।

মন্দিরে অষ্টভুজা মূর্তি। প্রায় তিন ফুট উঁচু ধাতুময় বিগ্রহ। জাগ্রতা দেবী বলে প্রসিদ্ধ। দেবীর অরেকল-ও (oracle) আছে। তারই উপর অধিষ্ঠান করে ভগবতী ভবিষ্যদ্বাণী জানান। মন্দিরের দেওয়ালেও বিভিন্ন দেবদেবীর প্রস্তর প্রতিমূর্তি।

এখানকার জনপ্রবাদ, দ্বাপরযুগে বিরাট রাজার রাজধানী ছিল এইখানে। মন্দিরও তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। জায়গার নাম এখনও অনেকে বিরাট-নগরী বলে। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসও অতএব এইস্থানেই। লোকে তাই বলে, মন্দির-প্রতিষ্ঠায় তাঁরাও বিরাট রাজাকে সাহায্য করেন।

হিমাদ্রি চারদিকে তাকায়। বলে, গো-ধন ত কোথাও দেখি না!

দেবীর মন্দিরের পাশেই শিবের মন্দির। প্রকাণ্ড লিঙ্গমূর্তি। এখানেও ছড়ানো অনেকগুলি দেবদেবীর পাথরের মূর্তি।

আশেপাশে আরও কয়েকটি ছোট ছোট মন্দিরের ভগ্নাংশ।

ভাবি, হাটকোটি নাম অষ্টভুজারই অপভ্রংশ,—অথবা স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডে বর্ণিত—এই সেই হাটকেশ্বর ক্ষেত্র? যেখানে পিতামহ ব্রহ্মা স্বর্ণলিঙ্গ স্থাপনা করেন,—

হাটক, অর্থাৎ স্বর্ণ, থেকেই হাটকেশ্বর নামকরণও হয়।

ঘুরে ঘুরে সব দেখি। হিমাদ্রিকে বলি, পুজোর মধ্যে পথ চলেছি, মনেই ছিল না। মহাষ্টমীর দিন কেমন চমৎকার দর্শন হোল! ছেলে ভুললেও মা কখনও ভোলেন না, দেখেছ?

মন্দিরের চাতালে ক্ষণিক বিশ্রাম করি। কিছু জলযোগও হয়। আপেলেরও ভার কমাই। তারপর, আবার পথ চলা।

খানিক এসেই বড় রাস্তা পাই। দলে দলে লোক চলে মন্দিরের দিকে। আমরা চলি উল্টোমুখে। নদীর ধার দিয়ে সোজা পথ। পাবর নদ। স্বচ্ছ নীল জল। স্রোতের টান আছে। প্রশস্ত ধারা। পথের দু'পাশে চাষ-আবাদ। রোদের তেজ অনুভব করি। ভাগ্যক্রমে মাইল দুয়েকও যেতে হয় না। দুপুরের আশ্রয়ে পৌঁছে যাই। জায়গার নাম সৌরা। পথের ডান দিকে পাহাড়ের গায়ে সুন্দর নতুন ফরেস্ট রেস্ট-হাউস। আশপাশে ফুলের বাগান। রেঞ্জার মিস্টার সিং-এর সঙ্গে দেখা। সাদরে অভ্যর্থনা করেন। বলেন, রান্নার আলাদা ব্যবস্থার কোনই প্রয়োজন নেই। একসঙ্গে খাওয়া যাবে। সঙ্গে আমার লোক রয়েছে।

অতএব স্নান আহার বিশ্রাম—সবই ভাল ভাবে হয়। সঙ্গের পোর্টার দুজন এখান থেকে ফিরে যায়। সিং নতুন লোক ঠিক করে দেন,—আরাকোট পর্যন্ত এরা যাবে। অর্থাৎ মাত্র নয় মাইল। আজ সেইখানে রাত কাটাবার কথা। সিং আগে থেকেই তাদের রওনা করিয়ে দেন। বলেন, ওরা এগিয়ে যাক,—মাল বহা ওদের অভ্যেস নেই, তাই পৌঁছুতে সময় নেবে। মাল চলে গেল,—আপনারা নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম নিন। ধীরে-সুস্থে পরে যাবেন। সোজা রাস্তা—কতোক্ষণই বা লাগবে?

বসে বসে গল্প চলে। হিমালয় পথের। সিং এ-অঞ্চলে বহু জায়গায় ঘুরেছেন। জানান, এই আরাকোটে আপনারা উত্তরপ্রদেশে ঢুকলেন। দু'দিন এলেন হিমাচল প্রদেশের মধ্যে দিয়ে। এখন যে-পথে চলেছেন তার বৈশিষ্ট্য হল বনের শোভা। কাল আপনারা নদীর ওপারে টিউনিতে পৌঁছুবেন। তারপর দেখবেন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কী রকম পথ। এই পাবর নদী নেমে আসছে রোহরু হয়ে। রোহরু এ-অঞ্চলের বড় গ্রাম। এখান থেকে মাইল ষোল ওপরে। হাটকোটিতে নদী নেমে এসে এই বড় রাস্তার সঙ্গ পেয়েছে। রোহরু থেকে হাটকোটি—পাবর নদীর যে উপত্যকা—অতি মনোহর। এই নদীর প্রসিদ্ধি ট্রাউট্ মাছের জন্যও। কি পরিষ্কার জল, দেখেছেন নিশ্চয়? আবার, একটা খবরও জানাই। হাটকোটি থেকে রোহরু যাওয়ার যে-পথ নদীর ধার দিয়ে গেছে—আপনারা তো সেদিক দিয়ে আসেন নি—সে-পথ যায় ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। এমন বন যে পাহাড়ীরা দল বেঁধে ছাড়া সে-পথে যাতায়াত করে না—দিনের বেলাতেও—ভাল্লুকের এমনই উপদ্রব সে-পথে। আপনারাও পথে সে-রকম জঙ্গল পাবেন। এমনি কতো সব গল্প।

কিন্তু, সুমুখে পথ পড়ে। তাই অহেতুক আরামে স্বস্তি পাই না। আর দেরিও করি না। দুটো বাজতেই রওনা হই। এবার আর পথে গাছের ছায়া নেই। রোদের তেজও তীক্ষ্ণ। দুপাশে চাষবাস। মাঝে মাঝে বসতি। হিমাদ্রি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আক্ষেপ করে, দুপুরে খাওয়াটা একটু বেশিই হয়ে গেছে। রান্নাগুলো করেছিল ভাল। অতো না খেলেই হত।

হেসে বলি, বেশি খেয়েছিলে বলেই তো এ-জ্ঞানটা লাভ হল। ভাগ্যে সোজা রাস্তা, চড়াই উৎরাই নেই!

একটানা নদীর ধার দিয়ে চলা। ক্বচিৎ সামান্য ওঠানামা। মামুলী পাহাড়ী 'ময়দান সড়ক'। তবুও, এক জায়গায় বেশ খানিক উঠতে হয়। পাহাড় কেটে নতুন বাস্-পথ তৈরি হচ্ছে। দুদিকে দুটো পথ। কোথাও কোন লোকজন দেখি না। দুদিকেই পথের উপর লোক চলাচলের পায়ের ছাপ। ভাগ্যদোষে ভুল পথেই এগিয়ে চলি। আধ মাইলটাক যাবার পর দুটি ছোট ছেলের সঙ্গে দেখা। তখন আবার ফিরতে হয়। হিমাদ্রির দেওয়া লজেন্স খেয়ে ছেলে দুটি মহাখুশী। সোৎসাহে সঙ্গে আসে। তাদের দেখানো পাকদণ্ডীর পথ ধরে আবার আরাকোটের বড় রাস্তা পাই।

পথ নেমে আসে নদীর ধারে। আবার মাঝে মাঝে গ্রাম। ক্ষেতের পর ক্ষেত।

বেলা থাকতেই আরাকোটে পৌঁছুই। নদীর ধারে প্রায় ৪০০০ ফুট উঁচুতে। পি. ডব্লিউ. ডি-র স্থানীয় অফিসারের নামে জুব্বলের ডাক্তার একটা চিঠি দেন। তাঁর খোঁজ করি। সানন্দে তাঁর বাড়িতে নিয়ে চলেন। চা খাওয়ান। তারপর নিয়ে যান ফরেস্ট বাংলোতে। যে-পথ দিয়ে এসে গ্রামে ঢুকি—সেই পথেই আবার আধ মাইল ফিরে গিয়ে—পাহাড়ের অল্প উপরে বাংলো।

হিমাদ্রি বলে, আগে জানা থাকলে—এই যাতায়াতে এক মাইল বেশি হাঁটতে হত না।

আশ্বস্ত করে বলি, তাহলে গরম গরম অমন চা খাওয়াটাও হত না, অফিসারটির সাহায্যও মিলত না। উনি বলেছেন, দুজন পোর্টারের ব্যবস্থা করে দেবেন,—তারা যাবে সেই চকরাতা পর্যন্ত। লোক-বদলের হাঙ্গামা আর থাকবে না।

পাবরের উপর আরাকোট মনোরম জায়গা। বাংলোটি পুরানো ও ছোট। নির্জন পরিবেশ। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটি ছেলে দুধের যোগাড় করে দেয়। রান্নারও সাহায্য করে।

জুব্বল থেকে আজ সতেরো মাইল আসা হল। ভুলপথে এবং এধারে ওধারে আরও মাইল তিনেক বেশি ঘোরা হয়।

ক্লান্ত দেহে এক ঘুমে নিশ্চিন্ত আরামে রাত কাটে।

॥ ৫ ॥

সকালেই যাত্রার কথা; কিন্তু পোর্টারের ব্যবস্থা হতে বিলম্ব ঘটে। অফিসারটি জানান, একটু বেলা না হলে কাউকে ধরা মুশকিল। জানেনেই ত পাহাড়ে দিনের কাজকর্ম শুরু হয় দেরিতে। এক কাজ করুন বরং। পোশাক ছাড়ুন। দুপুরের খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করি আমার বাড়িতে। স্নান করে খেয়েদেয়ে যাত্রা করবেন। টিউনি—মাত্র মাইল নয় দূর এখান থেকে। পৌঁছে যাবেন একবেলাতেই।

অগত্যা তাই করতে হয়। একটা বেলা অযথা কাটে, মনে অস্বস্তি জাগে। কিন্তু রোদ উঠলে, নদীতে নেমে স্নান করি, দেহমনের সব অবসাদ ও গ্লানি কাটে। মন তৃপ্তিতে ভরে ওঠে।

অফিসারের বাড়ির সমুখেই রাস্তা। পথের ওদিকে হাত কয়েক মাত্র নীচে নদী। নদীর তটে ছোট বড় কালো পাথর,— কোনটা যেন বসবার বেদী, কোনটা যেন শোবার চৌকি।

জলের নির্মল ধারা। নদীর বুকের প্রতি বালুকণাটি দেখা যায়। অতি শীতল জলেও অবগাহন স্নান পরিতৃপ্তিকর। গা মুছে গরম গেঞ্জি গায়ে পাথরের উপর গাছের ছায়ায় পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকি। নদীর একটানা স্রোতের গতিবেগ দেখি; জলের কলধ্বনির মধুর সঙ্গীত শুনি। হিমগিরির যেন চিরন্তন অস্ফুট বাণী। হিমাদ্রিকে বলি, খাবার তৈরি হলেই ডেকো—এ শৈল-শয্যা ছেড়ে তখন উঠব।

যাত্রা করতে একটা বাজে। দেরি হওয়ায় মনে খেদ নেই। পোর্টারের সন্ধানে পথে আর কোথাও সময় নষ্ট হবে না।

আবার পাবর নদী ধরে পথ। দুপুরের তপ্ত রোদ। কোথাও বা গাছের ছায়া। যেন, সন্তপ্ত প্রাণে একটু স্নেহের পরশ। নদীর নিম্নগতি। পথও ধীরে নেমে চলে। মাঝে মাঝে দু'একটা গ্রাম। গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে গ্রামবাসী অবাক হয়ে তাকায়। কৌতূহলী প্রশ্ন করে, কোথা থেকে আসি, কোথায় চলি। সাধারণ প্রশ্ন, গতানুগতিক উত্তর—তবু যেন হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল তোলে। পথচারী ও গৃহবাসী—কোথায় যেন দুই-এর মধ্যে অগোচরে অজানা কীসের বাঁধন থাকে।

আরাকোট থেকে দেড় মাইল রাস্তা। সেখানেও ফরেস্ট রেস্ট হাউস। কিন্তু আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। আরও সাড়ে সাত মাইল এগিয়ে টিউনি; সেইখানে আজ রাত্রিবাস। তাই এগিয়ে চলি। নদীর ধারে বড় বড় গাছ। সুস্নিগ্ধ মনোরম ছায়া। পাশেই নদী। নদীর জলে গাছের ছায়া দোলে,—মনে হয়, কে যেন কালো কালি ফেলে দেয় জলে। জলের ধারার পথে নানা রঙের পাথর। তারই মধ্যে দিয়ে উন্মুক্ত আকাশতলে উল্লাসভরে নেমে আসে ধারাগুলি,—সেখানে নীলজল ঢেউ-এর সাদা পাল তুলে অবিরাম বয়ে চলে।

নদীর অপর পারেও গাছ, কোথাও বা বিস্তীর্ণ চাষের জমি। তারই শেষে পাহাড়ের গায়ে সুন্দর একটি দোতলা বাড়ি। দেখেই মনে হয়, কোন বর্ধিষ্ণু পাহাড়ীর।

হিমাদ্রি হঠাৎ চাপা গলায় বলে, ঐ দেখুন তাকিয়ে—সামনে—

মুখ ফিরিয়ে দেখি। ভালুক নয়। তবে ভালুকের মতনই প্রকাণ্ড লোমশ কুকুর।

হিমাদ্রি আবার বলে ওঠে, মাঠের মধ্যে ওদিকে তাকিয়ে দেখুন—অদ্ভুত এক মূর্তি!

তাকিয়ে দেখি, গুর্জর এক রমণী। পরনে লম্বা কালো আলখাল্লা—ঘাগরার মতো নীচেটা। জরির পাড়। মাথায় গোল টুপি। তাও কালো রঙের। তাতেও জরির কাজ। বুকে, কানে, নাকে, হাতে একরাশ গহনা। কালো বেশভূষার মাঝে গহনার চাকচিক্য, জরির কাজ ও দেহের উজ্জ্বল বর্ণ—দূর থেকেও চোখে চমক জাগায়।

এগিয়ে এসে পাশ দিয়ে যেতে হিমাদ্রি থমকে দাঁড়ায়, চাপা হাসিমুখে বলে, দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখুন একবার মুখের চেহারাখানা—

আমি হেসে বলি,—দুর্ভাগ্য তোমার।

তরুণী নয়, কিশোরী নয়—এক বৃদ্ধা মহিলা। চোখ, মুখ, কপালে বলিরেখা,—যেন পাকা ধানের ক্ষেতে লাঙল দেওয়া! এতো বয়স,—তবু মুখের রঙের চটক যায় নি, গহনা পরার শখও মেটে নি!

কয়েকটা মহিষ সঙ্গে এক বৃদ্ধ গুর্জরও আসে। দীর্ঘ দেহ। মাথায় বিরাট পাগড়ি—তাই আরও লম্বা দেখায়। পরনে লুঙির মত কাপড়। গায়ে ঢোলা কালো কুর্তা। পায়ে মোটা চামড়ার নাগরা। এই বয়সেও সবল সুন্দর স্বাস্থ্য। টানা চোখ,—সম্ভবত কাজল দেওয়া।

ছুঁচালো দাড়ি। টিকাল নাক। এক কালের অতি সুশ্রী সুপুরুষের নিদর্শন এখনও দেহে প্রমাণ রাখে।

হিমাদ্রি অবাক হয়ে তাকায়। জিজ্ঞাসা করি, আগে কখনো গুর্জরদের দেখ নি? এরা যাযাবর। মোষ ও গরু পালন করে। তাদের সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরে। শীতের সময় নীচের দিকে সমতলদেশে নামে। এরা জাতিতে মুসলমান। কারও কারও মতে এরাই নাকি প্রাচীন আর্যদের খাঁটি বংশধর। এদের কথাই তো শুনেছিলে মণিমহেশের পথে। সেখানে দেখা সেই গদ্দীদের মতন এদের পূর্বপুরুষরা ঘুরে বেড়াত মধ্য এসিয়ায় ঘোড়া ও ভেড়ার দল নিয়ে। মনে পড়ছে তোমার? রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে, হূণদের আক্রমণের ফলে এদের পূর্বপুরুষরা দেশ-বিদেশে পালাতে শুরু করে। ভারতের দিকেও নেমে আসে। এদেরই দলপতিরা ভারতের সমতলভূমিতে নেমে শক-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আবার অনেকে যাযাবর-বৃত্তি ছাড়তে পারে না। এই সব পাহাড় অঞ্চলে পশুদল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। রাহুলের মতে এদেরই একদলের নাম হয় গদ্দী। মণিমহেশের পথে যাদের দেখেছ। চম্বা, মণ্ডী, লাহুল ঐ সব অঞ্চলে তারা ঘোরে। এখন ভেড়া-ছাগল পালন করে, অতো ঘোড়া আর পাচ্ছে কোথায় এদেশে? গদ্দীরা জাতিতে হয়ে গেল হিন্দু। কোমরে সেই 'শিউজিকী জটা',—মনে আছে নিশ্চয়? আর ওদেরই আর এক সম্প্রদায় গড়ে উঠল হিমালয়ের এই অঞ্চলে—চিনী, বুশায়ার, টেহেরি এই সব দিকে। এদের নাম হয়ে গেল,—গুজ্জর গুজর বা গুর্জর। শীতকালে এরাও নেমে যায় সেই সমতল দেশে,—রাজস্থান, পঞ্জাব ঐসব দিকেও। এখনও শীতের সময় সেদিকে এদের দল দেখা যায়। অনেক পরে, যখন মোঘল সম্রাটদের প্রভাব বিস্তার হয়, এদেরও ওপর অত্যাচার শুরু হয়। বেচারীরা কি আর করে? ভয়ে দাড়ি রাখে, ইসলাম ধর্মও নেয়। কিন্তু আচার-ব্যবহারে হিন্দু বিধিনিয়ম এখনও অনেক মানে। এরা কিন্তু ঘোড়া ছেড়ে পালন করতে লাগল মহিষ। কারও কারও অভিমত, এদেরই কেউ কেউ যাযাবর-বৃত্তি ছেড়ে রাজপুত নাম নিয়ে সমতলে বাস করে—যাদের জাঠ-গুজর বলা হয়। পাহাড়ে এই সব মহিষের পাল চরানো নিয়ে এখন বেচারীদের মহামুস্কিলে পড়তে হয়েছে। এরা পশুদল চরাতে নিয়ে যায় কাণ্ডায়, পাহাড়ের মাথায় উঁচু জায়গায় কচি ঘাসভরা ময়দানে। কিন্তু এখন গভর্ণমেন্টের সঙ্গে ও গ্রামের লোকেদের সঙ্গেও এই নিয়ে বিবাদ বেধে গেছে। জমির এখন দাম বাড়ছে, চাহিদা হচ্ছে। সরকার খাজনা চান। ওদিকে ভিন্নধর্মী হওয়ায় গ্রামের লোকেদেরও হয়ত সাহায্য বা সহানুভূতি পায় না। বানের জলে বেচারীরা এখন যেন ভেসে বেড়ায়। না আছে কোথাও ঘর বাড়ি জমি, না আছে স্বদেশ, না আছে স্বজাতি। তবে কি জানি, এদের হয়ত এই না-থাকার সে অভাব-বোধও নেই। সারা জগৎই যেন এদের দেশ, যে-দিন যেখানে থাকে সেই তাদের ঘর। এরও আনন্দ আছে। স্বাস্থ্য দেখেছ এদের? এদের মধ্যে অপরূপ সুশ্রী মেয়ে-পুরুষ দেখা যায়। তোমার ভাগ্য মন্দ,—এই বুড়োবুড়ী ছাড়া এ দলের আর কাউকে সামনে এখন দেখছি না।—খোঁজ নাও দিকি—ভাল ঘি ওর কাছে পেয়ে যাও কিনা।

পাওয়াও যায় আধ সের। কিনেও রাখা হয় সঙ্গে।

ছায়ায় ছায়ায় মনের আনন্দে এগিয়ে যাই। জঙ্গল শুরু হয়। পথও উঠে চলে পাহাড়ের কিছু উপর দিকে। নীচে ওপারে দেখা যায় পাহাড়ের শ্রেণী ভেদ করে টন্‌স্ নদী নেমে

আসে। পাবরের চেয়ে বড় নদী—আরও বেগময়, বিশালকায়। যমুনার উৎপত্তি বান্দরপুঞ্ছ পর্বতে। তারই অপর আর এক অঞ্চল থেকে টন্‌স্‌-এরও জন্ম। যমুনা ও টন্‌স্‌-এর মিলন হয় হিমালয়-রাজ্য ছাড়িয়ে সমতলভূমিতে নেমে। এখন এখানে নীচে দেখি টন্‌স্‌-এর সঙ্গে পাবরের সংযোগ। সঙ্গমের নিকটে প্রশস্ত ধারা,—নদীর নাম টন্‌স্‌ই থাকে।

বাঁ দিকে গাছের ফাঁকে দেখা যায় অনেকখানি নীচে টন্‌স্‌-এর ধারা। যেন শান্ত স্তব্ধ জল। স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকলে বোঝা যায় নদীর গতিবেগ। নীল জলে ঢেউ-এর আঁকাবাঁকা সচল সাদা রেখা। নদীর বুকে চেরা কাঠও ভেসে চলে। বহু কাঠ বালির চরে আট্‌কে জমা হয়ে থাকে। জনকয়েক লোক লাঠি হাতে কাঠগুলি ঠেলে স্রোতের মুখে ভাসাতে নিযুক্ত দেখি।

হিমাদ্রি বলে, লোকগুলোকে কতো ছোট দেখাচ্ছে! বেশ খানিকটা চড়াই উঠে আসা গেছে;—বুঝতেই পারা যায় নি।

দুই তীরের পাহাড়ের শ্রেণী ক্রমশ পরস্পরের কাছাকাছি এগিয়ে আসে। Gorge-এর সৃষ্টি হয়। সঙ্কীর্ণ গতিপথে টন্‌স্‌-এর জলভার প্রচণ্ডবেগে নেমে চলে। স্রোতের বিরাট হুঙ্কার। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি ওঠে। দুদিকেই পাহাড়ের গায়ে বড় বড় গাছের ঘন বন। তারই আধ-আঁধারে ছায়াতলে ঘুরে ঘুরে পথ চলে—সঙ্গোপনে, অতি সন্তর্পণে।

নদীর উপর লোহার ঝোলাপুল। পুলের কাছে নদীর ধারে এক জায়গায় বালির খানিকটা চর। নিকটেই কুণ্ডের মতো জমা জল—সেখানে ধারার টানও কম। কতকগুলি ছেলে সেখানে স্নান করে দেখি। স্থানীয় লোক নয়, বোঝা যায়।

হিমাদ্রি বলে, এতগুলি বাইরের ছেলেপিলে কোথা থেকে এল? আনন্দে আরামে স্নান করছে। পুল পার হয়ে সামান্য চড়াই। বড় বড় গাছের ফাঁকে দেখা যায় খানকয়েক ঘরবাড়ি। বেশির ভাগ আখ্‌রোট গাছ।

টিউনি (২৯০০ ফুট্)। এ-পথে সব চেয়ে নীচু জায়গা। তাই অপেক্ষাকৃত গরমও। ফরেস্ট রেস্ট হাউসে উঠি। এখানেও পুরানো বাড়ি। ফরেস্টার গোমেশ আসেন। মোটাসোটা দেহ। গোল মুখ। ভারিক্কে চেহারা। প্রসন্ন মুখে অভ্যর্থনা জানান। হাত বাড়িয়ে সেক্‌হ্যাণ্ড করেন। পাহাড়ী ক্রীশ্চান। তাঁর পার্শ্বচরটিকে বলেন, রাত্তিরে এঁদের খাবার তৈরী করে খাইয়ে দিও।

মুখে বলি, কেন আবার ও-সব হাঙ্গামা?

কিন্তু মনে মনে নিশ্চিন্ত হই। হিমাদ্রিও চোখ টিপে মুচকে হাসতে থাকে।

২০।২২ জন ছেলেও এখানে পাশের ঘরে ওঠে। দেরাদুন স্কুলের ছাত্র। দল বেঁধে পায়ে হেঁটে চলেছে পাহাড়-পথে সিম্‌লায়। আমাদের উল্টাপথের যাত্রী।

অতোগুলি ছেলে পাশের একটা ঘরে থাকবে, আর আমাদের দুজনের দখলে অন্য ঘরখানি,—তাই সাগ্রহে তাদের জানিয়ে রাখি, তোমাদের কয়েকজন নিঃসংকোচে এ-ঘরে এসে রাত কাটিও।

ছেলেরা ঘোরে ফেরে। আমোদ-প্রমোদে মাতে। বাইরে গাছের তলায় উনুন জ্বেলে বন-ভোজনের আয়োজন করে। সবাই প্রাণবন্ত। এই অরণ্যপথের মুক্ত জীবন-ধারার আনন্দে উচ্ছ্বসিত। তাদের কল-কোলাহল, মন-প্রাণ-খোলা হাসি, গান—হিমালয়ের নিস্তব্ধ

শান্ত বনভূমির শান্তি ভাঙে ঠিকই,—কিন্তু তবুও বিসদৃশ মনে হয় না। এমনি অতি সভ্য মার্জিত আচার-ব্যবহার। যেন ঐ উপল-বহুল গিরিখাদে বহে-যাওয়া তরঙ্গমুখর উচ্ছ্বসিত ঝরণা-ধারা। হিমালয়েরই এক প্রাণময় অঙ্গ।

রাত্রে তাদের দলনায়ক শিক্ষক কয়জন ছেলেকে নিয়ে এ-ঘরে শুতে আসেন। ছেলেদের উচ্ছৃঙ্খলতাহীন ও সুসংযত আচরণের ভূয়সী প্রশংসা করি। ছেলেদের সঙ্গে গল্পে সময় কাটে। তাদের নবীন উৎসাহ আমারও প্রাণে তারুণ্যের তরঙ্গ তোলে। হিমালয়-পথের কতো গল্প চলে।

পরদিন অতি ভোরে যাত্রার কথা। ফরেস্টার গোমেশের কাছে তাই রাত্রেই বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে রাখি। তিনি বলেন, অন্ধকার থাকতে যেন রওনা হবেন না। এবার জঙ্গলের পথ শুরু। পথটা ভাল নয়। দিনের আলো ফুটলে যাত্রা করবেন।—তাঁর এক অনুচরকে ডেকে বলেন, ভোরেই এঁদের চা খাইয়ে দিও—আর আপনাদের তো কাল কাথিয়ান-এ পৌঁছুতে সারাদিন চলে যাবে,—বারো মাইল হলেও বেশ চড়াই, তাছাড়া জঙ্গলের রাস্তা,—কিছু রুটি আর সব্জি এই লোকটাই ভোরে করে দেবে, সঙ্গে নিয়ে যাবেন, পথে আর রান্নার হাঙ্গামা থাকবে না, অযথা সময়ও যাবে না।—ভালো কথা, এখান থেকে দিন তিনেকের জন্যে কিছু চাল ডাল আলু মশলা সঙ্গে কিনে রাখুন,—চক্‌রাতার আগে এ ক'দিন পথে কিছু পাবেন না, যা যা দরকার ও লোকটাকে এখনি বলে দিন, দোকানদারের কাছ থেকে এনে দেবে।—

তারপর একটু হেসে বলেন, ভাববেন না, সবই ঠিকমত হয়ে যাবে, তবে সকালে আমার সঙ্গে কিন্তু আর হয়ত দেখা হবে না। আমি বিছানা ছাড়ি একটু বেলাতে, কিছু মনে করবেন না যেন। রাত্রে খাই-ও একটু দেরিতে—শুতে শুতে রাত হয়ে যায় অনেক।

কারণও সহজেই বুঝতে পারি। শীতের দেশ। চোখ দুটিও লাল। কথা বলেন, গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। দরাজ মেজাজ। কথার মাঝে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন। নিজেই হো হো করে হেসে ওঠেন। বেলুনের মত গোল মুখে টোল খায়। চোখ কুঁচকে আসে। সহচরদেরও হাসিতে যোগ দিতে হয়। রাত্রের প্রসাদের লোভে ভক্তরা কাছে কাছে ঘোরে। মধুর লোভে ভ্রমর ওড়ে।

॥ ৬ ॥

সকালে চা ও রুটি খেয়ে রওনা হই। সঙ্গে আরও রুটি-সব্জিও চলে।

টিউনি থেকে কাথিয়ান যাওয়ার দুটো পথ। একটা পাহাড়ের খাড়া চড়াই ভেঙে ওঠে,—সে পথে দূরত্ব মাত্র ন'মাইল। এদিক দিয়ে ওঠার কষ্ট আছে। চক্‌রাতা থেকে এলে সে-পথে এখানে নামার সুবিধা থাকে। আমরা চলি ঘোরা পথে—বারো মাইল দূরত্ব।

টন্‌স্ নদীর গতিপথ ধরে এগিয়ে চলা। কূল ছেড়ে ধীরে ধীরে পথ পাহাড়ের গায়ে অল্প ওঠে। গতকাল ওপার থেকে দেখা বনের অংশে প্রবেশ করি। পাইনের বন। দূর থেকে ঘন দেখায়। কাছে এলে দেখা যায়,—যেন সাজানো গাছের সারি। থামের মত সোজা দাঁড়িয়ে থাকে। আকাশে মাথা ঠেকাবার স্বপ্ন দেখে। উপর অংশে ছড়ানো

ডালপাতা। যেন, মাথার উপর সবুজ কাচের অসংখ্য ঝাড়লণ্ঠন দোলে। পাইনের পাতা,—লম্বা সবুজ সূচাল কাঁটা। ঝরাপাতা বনতলে ছড়িয়ে থাকে,—শুকিয়ে দেখায় যেন, সোনার কাঠি দিয়ে বোনা চারিদিকে চাটাই পাতা। সকালের আলো ফুটতে থাকে। বনদেবী অলস নয়নে যেন চোখ মেলেন। পাখীরা জাগে। অচেনা কোন্ এক পাখীর ডাক শুনি। হঠাৎ ডেকে থেমে যায়। নিস্তব্ধ বন আরও স্তব্ধ মনে হয়।

মনের আনন্দে এগিয়ে চলি। পাইনের সুবাস, ভোরের বাতাস, পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ,—চলার প্রেরণা আনে। তন্ময় হয়ে চলতেই থাকি। ভাবলেশহীন মন। দেহভারও যেন শূন্য। স্রোতের মুখে যেন ভেসে চলি অসীম আনন্দ সাগরে।

হঠাৎ হিমাদ্রির ডাকে সজাগ হই। বলে, দেখছেন—কতোখানি উঠে এলাম! কাথিয়ান্ প্রায় সাত হাজার ফুট—দেখতে দেখতে মেরে দেওয়া যাবে।

কিন্তু, হিমালয়-পথের বিচিত্র রঙ্গ পরিহাস।

কিছুক্ষণ পরেই আবার নেমে আসি টন্‌স্-এর তীরে। হিমাদ্রি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মন্তব্য করে, গেল,—সকালের জমানো চড়াই ওঠা খোয়া গেল!

মাইল তিনেক সমান পথ। পরে, প্রকৃত চড়াই শুরু হয়। রোদের তেজ নেই। প্রকাণ্ড বড় বড় গাছ যেন সামিয়ানা টাঙিয়ে পথের উপর ছায়া ফেলে থাকে। এতক্ষণে হিমালয়ের আসল গহন বনে প্রবেশ করি। সেই আদিম অরণ্যানী। নানান্ প্রকারের বিভিন্ন আকৃতির প্রকাণ্ড সব গাছের জটলা। দিনের বেলাতেও পথের দু'দিকে কেমন যেন অন্ধকার ভাব। বিশাল গাছগুলির ছড়ানো ডাল থেকে নানারকম গুল্মলতা ঝোলে। গাছের গুঁড়িতেও লতার পাক,—যেন সাপের দল আঁকড়ে থাকে। মাঝে মাঝে ছোট ঝরণা। কালো কালো পাথর, তারই মধ্যে দিয়ে ঝির্ ঝির্ করে জলের ধারা নামে।

বেলা বারোটার পর জঙ্গলের মধ্যে দুখানা চালাঘর দেখা যায়। পাশেই ঝরণাধারা। তারই নিকটে বসে দুপুরের আহার সারি। ক্ষণিক বিশ্রামও হয়।

আবার চলা। পথ অনবরত উঠেই চলে। মনে হয়, বুঝি বা এর শেষই নেই।

অবশেষে, পাহাড়ের বহু উপরে উঠে জঙ্গলের মধ্যে দু'তিনটি কাঠের বাড়ি দেখা যায়। হিমাদ্রির মুখে হাসি ফোটে। বলে, এবার নির্ঘাত কাথিয়ান-এ পৌঁছে গেলাম।

বাড়ির নিকটে এগিয়ে খোঁজ নেওয়া হয়। কাথিয়ান-ই বটে। ৬৯৬০ ফুট্। টিউনি থেকে বারো মাইল। ফরেস্টার দূরে কোথাও গেছেন। আজ রাত্রে ফিরবেন কিনা সন্দেহ। চৌকিদারও ঘরে নেই। তার খোঁজে একজন লোক যায়। একটা বাড়ির চাতালে বসে আমরা অপেক্ষা করি। দিনশেষের আশ্রয়ে পৌঁছে যাওয়ার নিশ্চিন্ত স্বস্তি বোধ হয়। হিমাদ্রি জুতা খুলে বসে। বলে, আঃ! কী আরাম! পায়ের আঙুলগুলো প্রাণ পেলো!

চৌকিদার আসে। ফরেস্ট রেস্ট হাউস-এ নিয়ে চলে। হিমাদ্রি বলে, কোন্ বাড়িটা? জুতো হাতেই চলি।

চৌকিদার জানায়, এখানে নয়,—কাছেই,—তবু জুতো পরে নিন।

রাস্তায় এসে আঙুল তুলে দেখায়,—ঐ লাল বাড়ি গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়। এক ফার্লং হবে।

হিমাদ্রি বলে, আবার হাঁটা? আরও চড়াই-ও আছে দেখছি! বাড়িটাই এখানে নামিয়ে আনা যায় না? খাসা একটানা চলে আসছিলাম,—এই আধ ঘণ্টা বসে থেকে পা ধরে

গেছে, এখন আর চলতে চায় না।

সত্যই তাই। এক ফার্লং—মনে হয় যেন এক মাইল। সামান্য চড়াই,—তবুও মনে হয় কতোই যেন উঁচু!

কিন্তু পৌঁছেই আনন্দ জাগে। পাহাড়ের প্রায় মাথার উপর খোলা মাঠ। তারই মাঝখানে সুন্দর লাল বাংলো। গভীর বনের গাছগুলি যেন থম্‌কে সসম্ভ্রমে দূরে সরে দাঁড়িয়ে থাকে। বাড়ির সিঁড়ির চাতালে উঠে দাঁড়াই। জঙ্গলের বন্দীশালা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। হঠাৎ দূরে তাকাতেই চোখ জুড়িয়ে যায়। দিগন্তে নীল আকাশের বুকে বরফের পাহাড়। সূর্যের শেষ আভা পড়ে। স্বর্ণোজ্জ্বল দেখায়।

মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকি। সিমলা ছাড়ার পর তুষার গিরিশ্রেণীর এই প্রথম দর্শন। হোক বহু দূর। তবুও মনে হয়, কার যেন স্নেহস্পর্শ অনুভব করি। মনে মনে প্রণাম জানাই।

সাজানো-গোছানো বাংলো। এই সুদূর দুর্গম দেশেও। ফরেস্ট রেস্ট হাউস কখনো কোথাও অপরিচ্ছন্ন বা অসুন্দর দেখি নি। ফরেস্ট বাংলো—যেন আপনি ফোটা বনফুল। অরণ্যের শোভা।

সাত হাজার ফুট উচ্চতা। তার উপর চারিপাশ খোলা। কন্‌কনে হাওয়া ছোটে। কাচের জানালা ভেদ করে ঘরেও ঢোকে। এ-পথে এই প্রথম প্রখর শীতের পরশ।

পোর্টাররা এসে জানায়, হাতে পয়সা নেই। কয়টা টাকা চাই।

জিজ্ঞাসা করি, এখানে ত দোকানপাট নেই,—কিনবে কি? টিউনি থেকে আটা চাল তাই সঙ্গে নিতে বলেছিলাম।

বলে, ফরেস্টারের লোকজন আছে, যোগাড় করে নেবো।

আর কথা না বলে টাকা দিয়ে দিই।

খিচুড়ি চাপাই। পরম তৃপ্তিতে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে সন্ধ্যার পরই শয্যাগ্রহণ করি। ক্লান্ত দেহে ঘুমও চোখে নামে অচিরেই।

হঠাৎ রাত্রে কীসের শব্দে ঘুম ভাঙে। কাচের শার্সি। বাইরের চাঁদের আলো ঘরে পড়ে। তাকিয়ে দেখি, হিমাদ্রি তার বিছানায় বসে—কি যেন খোঁজে।

জিজ্ঞাসা করি, কি হল? উঠে বসে খুঁজছ কি?

বাতি দেশলাই কোথায় রেখেছেন? আমার টর্চটা পাচ্ছি না।

ঐ ত টেবিলের ওপর আছে। কিন্তু এতো রাত্রে তোমার হল কি? বাইরে যাবে নাকি?

না। বলছি এখুনি।

উঠে বাতি জ্বালায়। কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, উঠে দাঁড়ান একবার। আজ যে বিজয়াদশমী,—ভুলেই গিয়েছিলাম।

॥ ৭ ॥

ভোরে উঠে যাত্রার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু পোর্টারদের কোথাও খুঁজে পাই না। ডাকাডাকি করেও সাড়া পাওয়া যায় না। চৌকিদারও নেই। অগত্যা অপেক্ষা করতে হয়। সময় বহে যায়। চরণ ও মন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ পরে চৌকিদারের দর্শন মেলে। পোর্টারদের সন্ধান করে ধরে নিয়ে আসে। একজনকে প্রকৃতই হাত ধরে আনে—তখনও এমনি তার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা!

চৌকিদার জানায়, টাকা নিয়ে ওরা কাল রাত্রে জুয়া খেলেছে, সরাব পিয়েছে,—একজন দেখতেই পাচ্ছেন—এখনও ঠিক হয়ে চলতে পারছে না।

অপর পোর্টারটি একটু লজ্জিত হয়ে দাঁড়ায়, বলে, আপনারা এগিয়ে চলুন—আমি মালপত্র নিয়ে ওকে সামলে সঙ্গে নিয়ে আসছি—একটু দেরি হবে।

হিমাদ্রি আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কতো বেলা হয়ে গেল, এখনও লোকটার এই বেসামাল অবস্থা—রাগ হয় না এসব দেখলে?

হেসে বলি, রাগলেই কি সমাধান হবে? মানুষের ভুলচুক দোষ তো আছেই। যা হয়ে গেছে,—তা নিয়ে আর না ভাবাই ভাল। এখন কি করা যায় দেখ। মালপত্র ফেলে রেখে এদের ছেড়ে যাওয়া চলে না,—কখন রওনা হবে, কে জানে? সঙ্গে নিয়েই যাত্রা শুরু করতে হয়। লোকটার নেশার ঘোর কাটাও দিকি এখন।

আরও খানিকটা সময় তাতে কাটে। লোকটার পিঠে মাল চাপিয়ে, খানিকটা ঘোরাফেরা করিয়ে সঙ্গে নিয়ে অপর পোর্টারটি যাত্রা করে। আমরাও চলা শুরু করি।

হিমাদ্রিকে বলি, সকালে উঠেই কেমন এক প্রহসন দেখলে বলো? রাগলে কি আর এটা উপভোগ করতে?

শীতের দেশ। তাই যাত্রায় বিলম্ব ঘটলেও ক্ষতি হয় না। রাত্রের বিশ্রাম ও হিমালয়ের আবহাওয়ার প্রভাবে গতকালের দেহের অবসাদ ও গ্লানি ধুয়ে মুছে গেছে। পথে পা বাড়াই নবীন উৎসাহে। নতুন পথের নবতম বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচয়ের পুলকিত আগ্রহে।

বাংলো ছাড়িয়ে এই গিরিশ্রেণীর শিখরদেশে এগিয়ে চলে পথ। প্রায় আধ মাইল চড়াই। বনের মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে ওঠে। সকালে চড়াই ওঠার কোন কষ্টবোধই থাকে না। মনের আনন্দে পূর্ণ উদ্যমে উঠে আসি। পাহাড়ের অপরদিকে এলে দেখা যায়, সেধারে অর্ধচন্দ্রাকারে পাহাড় বেঁকে দেহ ছড়িয়ে রাখে। বহু নীচে উপত্যকা। তিন দিক পাহাড়ে ঘেরা। পাহাড়ের উপর অংশে এদিকে গাছপালা বিরল। নীচে গাছের ভিড়। দূরে পাশের ও সুমুখের পাহাড়ের মাথায় গভীর বন। যেন, গাঢ় সবুজ পাগড়ি মাথায়। সকালের নির্মেঘ আকাশ। স্বচ্ছ সুনীল। এখনও সূর্য ওঠে নি। তবুও, আকাশ থেকে আলোক ঠিকরে পড়ে। হিমালয় যেন ধরিত্রীর কোলে নিদ্রিত শিশু। তারই দেহ আলোকিত করে রাখে আকাশ-জোড়া নীলকান্ত মণির প্রভা।

দূরে সুমুখের পাহাড়ের মাথায় গাছপালার ফাঁকে মাণ্ডালার বাংলোর লাল রঙ দেখা যায়। যেন, সবুজ পর্দার মধ্যে থেকে ফুটে ওঠে প্রদীপের লাল শিখা।

কাথিয়ান থেকে মাণ্ডালী যাবারও দুটো পথ। একটা নেমে যায় নীচে নদীর খাদের মধ্যে, তারপর ওদিকের পাহাড়ে উঠে যায় খাড়া চড়াই বেয়ে—বাংলোর দিকে। অর্থাৎ, সোজা নেমে, সোজা ওঠা। তাই দূরত্বও কম। কেউ বলে সাত মাইল, কারও বা মতে আট মাইল। অপর পথে, চড়াই-উৎরাই-এর সমস্যা নেই। এই পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে সমতল পথ ঘুরে চলে—ঐদিকের পাহাড়ের মাথায় বাংলোতে। ঘোরা পথ,—তাই দীর্ঘতরও হয়। কারও মতে বারো মাইল, কেউ বা বলে চৌদ্দ।

পাহাড়ের মাথায় মাথায় ঐ ঘোরাপথই ধরি। ওপরে গভীর বন। বিজন অরণ্যের শান্ত শোভা উপভোগ করার বাসনা। পাঁচ ছ' মাইল বেশি হাঁটা? ক্ষতি কি? পথ যখন সমান, চড়াই-উৎরাই ওঠা-নামার তেমনি দমও লাগবে না।

ঐ পথেই এগিয়ে চলি। প্রথমদিকে পাহাড়ের নেড়া গা—গাছ বেশি নেই। অথচ, এই পাহাড়েরই অপর দিকে গতকাল ও আজ সকালে প্রথম দিকে পেয়েছি কাথিয়ানের ঘন বন।

পথের কিছু নীচে একটা বড় গ্রাম। সেইদিকে পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে চাষের ক্ষেত। বহু নীচে খাদ। হিমাদ্রি দেখায় ঐ নীচে 'সর্টকাট' পথের সরু রেখা—কোথায় নেমে গেছে!

আমাদের পথ চওড়া। ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের গা দিয়ে চলে। কখন হঠাৎ পাহাড়ের কাঁধ ছেড়ে মাথায় ওঠে। সেখানে আবার বড় বড় গাছের জঙ্গল। ডালপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, বহু দূরে আকাশের বুকে বরফের পাহাড়ের শ্রেণী। নীল শ্লেটের উপর সাদা খড়ি দিয়ে টানা লম্বা লাইন। হঠাৎ আবার নিকটের গাছপালায় ঢাকা পড়ে। শ্লেটের লেখা চোখের উপর থেকে কে যেন মুছে দেয়।

ভাবি সুদূরের বিরাট মহান এমনি করেই বুঝি বা নিকটের ক্ষুদ্রতার পিছনে হারিয়ে যায়!

সূর্য ওঠে। রোদ ফোটে। আকাশ, পাহাড়-পর্বত, বনভূমি যেন জেগে ওঠে। চারিদিক আলোক-উজ্জ্বল হয়।

কিন্তু প্রাণের কোথাও চঞ্চলতা নেই। গতিহীন, শব্দহীন, বিরাট নিস্তব্ধতা। বিশ্ব নিখিল—জ্যোতির্ময়, স্থির, মৌনী। পলকহীন আঁখি মেলে তাকিয়ে থাকেন। গতির ছন্দ তুলে কেবল আমরা ক'টি পথিক চলি। সেই ধ্যানগম্ভীর বিশাল হিমাচলের কোলে নিজেদের অতিক্ষুদ্র নগণ্য মনে হয়।

গহন বনের মধ্যে পথ ক্রমে প্রবেশ করে। যেন, অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহার ভিতর ধূসরবরণ সাপ ঢোকে। চারিদিকে বিশালকায় অতিপ্রাচীন দেওদার গাছ। সারা দেহে বার্ধক্যের ছাপ। নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। যেন সব বল্মীক আচ্ছাদনে যুগ-যুগান্তরের ধ্যানমগ্ন ঋষিগণ। জটাজূটধারী। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। জনপ্রাণীহীন এ-জগৎ। পথের উপর শুকনো ঝরাপাতা, ভাঙা ডাল। পথ চলতে মড়মড় শব্দ ওঠে। নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকে উঠি। এই বুঝি বা ধ্যানমগ্ন ঋষিদের তপস্যার বিঘ্ন ঘটে! হঠাৎ ঝিরঝির শব্দ শুনি। বাঁক ঘুরতে পথে পড়ে ক্ষুদ্র গিরিনির্ঝরিণী। অতি ক্ষীণকায়া ধারা। পাথর থেকে পাথরে নেমে চলে। যেন কোন ঋষির মুখে মন্ত্রের অস্ফুট ছন্দ ফোটে।

আপন মনে এগিয়ে চলি। আমারও মন যেন ধ্যানে বসে। হিমালয়ের পথে পথ-চলা তো নয়, যেন বিরামবিহীন গতির ছন্দে দেবতারই স্তবস্তুতি গান।

দীর্ঘ পথও কখন শেষ হয়, জ্ঞান থাকে না। শেষের খানিকটা পথ চড়াই। বন ছেড়ে উন্মুক্ত আকাশতলে এসে পথ যেন থমকে দাঁড়ায়। পাহাড়ের মাথায় খোলা জায়গা। পাহাড়ের দু'পাশের অংশই দেখা যায়। একদিকে দূরের খাদের অপর পারে কাথিয়ানের পাহাড়ের শিখরদেশ,—সেদিক থেকে আমরা আসি। আর একদিকেও পাহাড়ের ঢালু গা, তারপর পাহাড়ের পর পাহাড়,—যেন স্তরে স্তরে সাজানো। সেইদিকে বড় রাস্তা বেঁকে

চলে। সামনে দু'টো চালাঘর। সেইখানে এগিয়ে যাই। কাথিয়ান ছাড়ার পর মাইলখানেক পর্যন্ত পথে দু'একজন লোকের সাক্ষাৎ পাই। তারপর এই দশ-বারো মাইল পথে কোন লোকালয় বা পথচারীর দর্শন মেলে নি।

চালাঘরের সুমুখে জনচারেক লোক বাইরে বসে রোদ পোহায়। জিজ্ঞাসা করে জানি, মাগুালী পৌঁছে গেছি। ফরেস্ট বাংলো এই বড় রাস্তায় নয়। ডাইনে যে আর একটা জঙ্গলের পথ গেছে সেই পথে যেতে হবে—আরও প্রায় আধ মাইলের উপর।

সেই পথ ধরি। বাংলোর এলাকায় ঢুকি। চারিপাশে নতুন Plantation—নানারকম গাছের রোপণ চলেছে। মাঝে মাঝে খালি জমি। সবুজ ঘাস। কোথাও বা ফুলের বেড়। সকালের বারো মাইল পথ সহজে পার হয়ে এলাম, অথচ, বাগানে ঢুকেও এই 'আধ মাইল' পথ যেন শেষ হতেই চায় না! খোলা জমি ঘিরে পাইন ও দেওদারের বন। পথের পাশে একটা বড় দেওদার গাছের গুঁড়িতে একটা নোটিশ বোর্ড ঝোলানো। হিমাদ্রি এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে ঃ

NOTICE

Near this spot in May 1889 a man eating tiger to have inhabited the district was shot by Mr. B. B. Osmaston I. F. S. while it was in the act of mauling Mr. Manserd, a Forest student.

একটা নরখাদী বাঘ এই জেলায় বাস করতো এবং এই জায়গার নিকটে ১৮৮৯ সালের মে মাসে মিঃ মানসার্ড নামে বনবিভাগের একটি ছাত্রকে সেই বাঘটা যখন আক্রমণ করে ক্ষতবিক্ষত করায় রত, মিঃ ওস্‌মাসটন্ আই. এফ্. এস্. সেই সময়ে বাঘটাকে গুলি করে মারেন।

হিমাদ্রি মাথা ঘুরিয়ে চারিদিকে তাকায়।

জিজ্ঞাসা করি, আজ তারিখ কতো?

অনেক হিসাব করে বলে, ৮ই অক্টোবর, ১৯৬২।

অর্থাৎ,—তিয়াত্তর বছর আগের ঘটনা—

হিমাদ্রি গম্ভীর হয়ে বলে, তা বটে! কিন্তু—.

প্রকৃতই তাই। বনজঙ্গলের এমনি আবহাওয়া, স্থানটাও এমনি নির্জন, মনে হয়, এইমাত্র ঘটে গেছে,—সেই কাঁচা রক্ত, ক্ষতবিক্ষত মানুষের দেহ, আর সেই ডুরেকাটা ভয়ঙ্কর বাঘের লাসটা—এখনও এখানে বুঝি কোথায় পড়ে আছে!

হঠাৎ বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ ওঠে। দুজনেই চমকে উঠি।

হিমাদ্রি বলে, কোথায় কে ছুঁড়ল বলুন তো? খুব দূরে নয়,—কাছাকাছি কোথাও।

বলি, কেউ শিকারের খোঁজে ঘুরছে নিশ্চয়।

আরও খানিকটা এগিয়ে চলি।

হিমাদ্রি বলে, বাংলোটা গেল কোথায়? সকালে কতো দূর থেকে দেখতে পাওয়া গেছে,—আর কাছে আসতেই লুকিয়ে পড়ল?

পাহাড়ের কাঁধের উপর চমৎকার খোলা জায়গা। সেইখানেই ছবির মতো বাংলো। তিন দিকে পাহাড়ের ঢালু গা। বাঁ ধারে কিছু নীচে আরও দু'-তিনটে ছোট বাড়ি। সেখানে চীর ও রোডোডেনড্রনের ঘন বন। বড় বাংলোর সামনে প্রকাণ্ড লন। সবুজ ঘাস। নানান

রকম মরসুমী ফুল।

হিমাদ্রিকে বলি, কোন বড় সাহেবের আগমন হয়েছে এখানে।

কেমন করে জানলেন?

দেখছ না, লন-এর ওপর বেতের চেয়ার টেবিল সাজানো,—ওদিকে দু'তিনটে আরদালিও ঘুরছে।

আমাদের দেখে চৌকিদার এগিয়ে আসে। চিঠিপত্র দেখাই। বলে, তাই তো! কনসারভেটর সাহেব এসেছেন। নীচে ফরেস্টারের বাংলো খালি আছে,—ওখানে থাকতে পারেন।

সে-বাংলোও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। সাজানো-গোছানো না হলেও, পরিচ্ছন্ন। জানালার দু'তিনটে কাচ ভাঙা। তা হোক। ক্ষতি নেই। চেয়ার, টেবিল, চৌকি পাতা। আবার কি? গাছের তলায় বা মুক্ত আকাশের নীচেও রাত কাটাতে যাদের আপত্তি নেই, তাদের কাছে এ তো রাজপ্রাসাদ!

জিনিসপত্র গুছিয়ে আহারের ব্যবস্থা করে বাগানে ঘুরি। দেখি বন্দুক হাতে দেশী সাহেব আসেন। সঙ্গে আর এক সঙ্গী। এসে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানান। বলেন, আপনাদের আসবার কোন খবরই দপ্তর থেকে এখনও এখানে আসে নি। সিমলা থেকে লেখা চিঠি—দেরাদুনে গেছে, সেখান থেকে অর্ডার বেরুবে, এখানে আসবে,—সময় লাগে। তাতে ক্ষতি নেই। আমি নিজেই তো হাজির এখানে,—ঘর পেয়েছেন তো?—নীচের ফরেস্টারের বাংলোতে? সে কী! আমার পাশের ঘর খালি রয়েছে এখানে—চৌকিদার—ইধার আনা—

বাধা দিয়ে বলি, না, না। আর টানাহেঁচড়া নয়। জিনিসপত্র খুলে বেশ ওখানে বসেছি। কোনই অসুবিধে নেই। আজকের দিন ও রাতটা—দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

কিন্তু, রান্নার পাট বন্ধ রাখতেই হয়। তখন থেকেই শুরু হয় নিমন্ত্রণের পালা। চা-বিস্কুট আসে,—তার পরে ভূরিভোজ, দুবেলাতেই! আর গল্পের তো শেষই নেই।

হিমাদ্রির চাপা কৌতূহল এতক্ষণে প্রকাশ পায়,—আচ্ছা, শিকারে গিয়েছিলেন, পেলেন কিছু? আপনার বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম।

না। আজ আর কিছু পাই নি। ভাগ্য খারাপ। একটা হরিণ দেখতে পাই—ফেরবার সময়ে—এই তো এই নীচেই। কিন্তু রেঞ্জের বাইরে—মারা গেল না—শুধু বন্দুক ছোঁড়াই হল।

হিমাদ্রি বলে, বড় জানোয়ার নেই? আসবার পথে গাছে-টাঙানো সেই নোটিশ-বোর্ডটা দেখলাম—

ওঃ! সেটা চোখে পড়েছে?—হাঁ, বাঘ আছে বই কি এখনও এ-সব অঞ্চলে—যাবেই বা তারা কোথায়? তবে বড় বাঘ চোখে পড়ে খুব কমই। লেপার্ড, প্যান্থার—হরদম ঘোরে। কিন্তু এ-সব জঙ্গল হল ভাল্লুকের,—'সেই হিমালয়ান গ্রেট বেয়ার' যাকে বলে। কালো প্রকাণ্ড লোমভরা, বিরাট দেহ। বনের ভেতর ঢুকলেই দেখা যাবে—দিনের বেলাতেও। মাঝে মাঝে বাংলোর এলাকার মধ্যেও এসে যায়,—তাই তো এত বেড়া দেবার দরকার হয়। আপনারা এলেন কাথিয়ান থেকে, নিশ্চয় সেই 'সর্টকাট'-এর পথে,—আসতেন যদি ঘোরাপথে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে—

সেই পথ দিয়েই তো আমরা এলাম।

তা হলে পথে নিশ্চয় ভাল্লুকও দেখেছেন।—ও কী! ঘাড় নাড়ছেন? পথে পান নি? আশ্চর্য! ও-পথে ভাল্লুকের ভয়ে লোক চলাচল কম। যারাই আসে,—দু-একটা জানোয়ার পথে পড়বেই, এই প্রথম শুনছি, একটাও চোখে পড়ে নি।

হেসে বলি, তাহ'লে এবার বুঝে দেখুন কী ধরনের লোক আমরা, অমন যে গ্রেট হিমালয়ান্ বেয়ার সে-ও আমাদের ভয়ে গা ঢাকা দিল!

হাসি ঠাট্টায় আনন্দে সারাদিন কাটে। রাত্রে আহার-শেষে জ্বলন্ত ফায়ার-প্লেসের ধারে, গরম কফির কাপ হাতে হিমালয়-পথের নানান কাহিনী শুনি।

মাণ্ডালী উঁচু জায়গা—৮৪০৪ ফুট। তাই শীতও আছে। ঘরের ভিতর আগুনের গরমে আরামে রাত কাটে।

॥ চ ॥

ভোরে উঠে যাত্রার জন্য প্রস্তুত। পোর্টার দুজনও হাসিমুখে তৈরি হয়ে দাঁড়ায়। মিটমিট করে তাকায়। মুখ নীচু করে বলে, পরশু রাতে সামলাতে পারি নি—কসুর হয়েছে, মাপ করবেন। আজ মাল নিয়ে এখনি রওনা হয়ে যাই।

আজ দেওবনে রাত-কাটানো। বারো মাইল পথ। তারা তখনি বেরিয়ে পড়ে।

কন্সারভেটর আমাদের আটকে দেন। বলেন, সে কী কথা! ব্রেকফাস্ট সেরে তবে রওনা হবেন,—এখনি তৈরি হয়ে যাবে, বলে দিয়েছি।

দেওবনের ফরেস্টারের নামে একটা চিঠিও দেন, যেন আমাদের কোন অসুবিধা না হয়।

আশ্চর্য হয়ে দেখি, হিমালয়ে আসি অরণ্য-জীবন যাপন করতে, কোথা থেকে পথের মাঝে অচেনা মানুষ সানন্দ সঙ্গ দেয়, আশ্রয়দানে সুখ-সুবিধারও আয়োজন করে।

বিদায় নিয়ে আবার পথ চলা।

সকালে সোপচারে চা-পর্ব। দিনশেষে আশ্রয়ের আশ্বাসপূর্ণ পত্র পকেটে। মাথার উপরও সুপ্রসন্ন নীল আকাশ হাসে। হিমালয়ের সকালের স্নিগ্ধ আবহাওয়া দেহমনে অনুপ্রেরণা আনে। বনের মধ্যে অজানা পথের সর্পিল রেখা সুদূরের বাঁশির সুরে ডাকতে থাকে।

মন-ভরা আনন্দের পসরা নিয়ে চলতে থাকি।

পথ পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে ওঠে। ফিরে তাকাই। পাশের পাহাড়ের গাছপালার মধ্যে ফেলে-আসা মাণ্ডালীর বাংলো দেখা যায়। চলার পথে একদিনের আশ্রয়। ক্ষণিকের পরিচয়। তবু যেন মনে হয় কতো কালের জানা-শোনা ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলি। গৃহবাসের মায়ার বাঁধন!

বনদেবী কি অন্তর্যামী? পথের পাশের বড় বড় গাছপালার সবুজ আবরণে সেদিকে চোখের দৃষ্টি রোধ করেন। বনরাজ্যের অপরূপ শোভা চারিপাশে ছড়িয়ে মন ভোলান। বনের মধ্যে উপলবহুল পার্বত্য-ঝরণা। অতি ক্ষীণধারা। রোডোডেনড্রন ও দেওদারের

নিবিড় বন। চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ, অতি প্রশান্ত। মন আর বাইরে ছোটে না। আবার আত্মস্থ হয়। অতল শান্তিসাগরে মগ্ন থাকে।

কিন্তু বনের ছায়া,—তাও বুঝি মায়া! অজানিত ভাবে এক মাইলেরও বেশি পথ অতিক্রম করে আসি। অরণ্যসীমা পিছনে পড়ে থাকে। চারিদিকে শিলাস্তূপ—পাথর,—তারই মাঝে মাঝে আলপাইন ফুল। নানান রঙের, বিভিন্ন আকারের। বিচিত্র ফার্ণ-এর গুচ্ছ, যেন চামর দোলায়। কোথাও বা স্ট্র-বেরির লতা। উন্মুক্ত আকাশের নীচে দিয়ে চলি। এই গিরিশ্রেণীর শিখর-দেশে পাশ্-এ পৌঁছে যাই। হাজার দশেক ফুট উঁচু। এ-পথের এই সব চেয়ে উঁচু জায়গা।

পাহাড়ের অপর দিকের দৃশ্য সামনে খুলে যায়। পাহাড়ের পর পাহাড়। স্তরে স্তরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোন দিকে নেড়া পাহাড়,—শুধু মাটি, পাথর—রুক্ষ কঠোর। আবার কোথাও বা পাহাড়ের গায়ে গভীর বনের সবুজ আচ্ছাদন,—স্নিগ্ধ কোমল। দিক্‌চক্রবালে তুষার-গিরিশ্রেণীর নীল আকাশে তরঙ্গায়িত শুভ্ররেখা।

অপর দিকে পাহাড়ের গায়ে পথ নেমে চলে,—প্রায় মাইল দেড় দুই। সোজা খাড়া পাহাড়ের গা। অভ্যাস না থাকলে নীচের দিকে তাকালে মাথা ঘোরা স্বাভাবিক।

তারপর এক গিরিশিরা—বা ridge-এর উপর নেমে পথ সোজা চলে। পাহাড়ের উপরিভাগ,—দু'পাশেই ঢালু গা। অনেক নীচে উপত্যকা। দূরে দুদিকেই পাহাড়ের শ্রেণী। Ridge-এর উপর দিয়ে চলতে থাকি। প্রশস্ত পথ। ভয়ের কোনই কারণ নেই। অনেক দূরে সামনের পাহাড়গুলির সঙ্গে পিছনে-ফেলে-আসা পাহাড়ের যোগাযোগ সৃষ্টি করে এই ধরনের ridge-গুলি। দিকে দিকে হাত বাড়িয়ে পাহাড়গুলি যেন হাত-ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকে। মাইলের পর মাইল এগিয়ে চলি। দূরের পাহাড় নিকটে আসে, পিছনের পাহাড় দূরে সরে। সোজা পথ। চলার কোনই কষ্ট থাকে না। কখনও বা পাহাড়ের কাঁধের উপর থেকে ডাইনে অল্প নেমে চলে, তখন শুধু ডাইনের খাদ ও পাহাড় দেখা যায়। আবার একটু পরেই বাঁ দিকের ঢাল দিয়ে পথ,—তখন সেই দিকের খাদ ও পাহাড়ের দৃশ্য চোখে পড়ে। আবার এক-একসময় কাঁধের উপর দিয়ে চলা, তখন দু'দিকেরই দৃশ্যপট একসঙ্গে খোলে। এ যেন দু'পাশে দুটি সন্তান নিয়ে জননীর বিশ্রাম। ক্ষণিক একদিক, আবার ক্ষণিক অপর দিকে ফিরে শোয়া, কখন বা চিৎ হয়ে থাকা।

পাহাড়ের অঙ্গ-সজ্জারও বৈচিত্র্য আছে। কোথাও রুক্ষ নীরস পাষাণময় পাহাড়ের গা, কোথাও আবার আনন্দদায়ক শ্যামল বনভূমি।

বেশ লাগে। দূরের তুষার গিরিশ্রেণী, স্তরে স্তরে সাজানো পাহাড়, প্রতি পদক্ষেপেই নিত্য নূতন দৃশ্য,—নয়নের রূপ-তৃষ্ণা মেটায়, অন্তরে অরূপের আভাস ফোটায়।

এই গিরিশিরা—ridge-এর দু দিক থেকে অন্যান্য কয়েকটি ridge-ও এসে মেশে। দেখায় যেন বিরাট এক মাকড়সা দিগন্তের পানে তার পাগুলি ছড়িয়ে নিশ্চল ভাবে পড়ে আছে।

হঠাৎ বনের মধ্যে থেকে এক জায়গায় বার হয়ে বাঁকের মুখে দেখা যায়—দক্ষিণ দিকে দূরের এক পাহাড়ের গায়ে মুসৌরী শহরের ঘরবাড়ি,—ঘন সবুজ বনের মধ্যে ছড়ানো লাল রঙের বিন্দু। রোদ লেগে দেখায় যেন নীল শাড়ির উপর চুমকি বসানো।

আবার পথ ঘুরে যায়। পাহাড়ের আড়ালে মুসৌরীর দৃশ্যও লুকায়।

দেওবন পৌঁছুবার মাইল দুই-তিন দূরে চক্‌রাতা যাবার সোজা বড় রাস্তা নেমে যায়। বাস্‌ চলাচলের জন্য রাস্তা আরও চওড়া করার কাজ চলে দেখি। দেরাদুন থেকে চক্‌রাতা নিয়মিত বাস চলে, সেই পথই আরও এগিয়ে আনার ব্যবস্থা। বড় রাস্তা ধরে ঘোড়া ও খচ্চরের দল আসে। গলায় ঘণ্টা বাঁধা, রঙ-বেরঙের ঝালরও দোলে। পিঠের দুদিকে চট্‌মোড়া বোঝা ঝোলে। সঙ্গে লোক ও কুকুর। দেখেই তিব্বতের কথা মনে পড়ে। লোকটিকে প্রশ্ন করি। সুদূর লাডাক, লে-অঞ্চল থেকে এরা ব্যবসার মালপত্র আনে,—বিশেষ করে, কম্বল, চাদর, কার্পেট ইত্যাদি। মুসৌরী, দেরাদুনে বিক্রী করে। দু'তিন মাস এইভাবে পথ চলে তারা ব্যবসা-কেন্দ্রে নামে। ভাবি, আমাদের পাহাড়ে ঘোরাঘুরি,—সে আর কতোটুকু!

আমরা যাব চক্‌রাতা দেওবন্‌ ঘুরে। তাই, বড় রাস্তা ছেড়ে ডান দিকের পথ ধরি। দেওবনে এগিয়ে চলি। দেওবনের দৃশ্যের খ্যাতি আছে। চক্‌রাতায় বেড়াতে এসে ভ্রমণকারীরা দেওবন দেখার সঙ্কল্প নেন্‌ই। দেওবনের রাস্তা থেকে নীচে এই পাহাড়ের এক অংশে চক্‌রাতার বাড়িঘর সুস্পষ্ট দেখা যায়।

দেওবন বাংলোতে পৌঁছুবার পথ গভীর বনের মধ্যে দিয়ে যায়। সামান্য চড়াইও। ধরে ধীরে আপন মনে এগিয়ে যাই। হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে বাঁক ঘুরতেই দু'তিনটে ছোট বাড়ি যেন মুখ বাড়িয়ে তাকিয়ে দেখে। এলাকার মধ্যে ঢুকে অল্প উঠতেই ফরেস্ট বাংলোর বড় বাড়ি। সুন্দর বাংলো। সাজানো বাগান। বনের মধ্যে যেন ফুলের মত আলো করে ফুটে থাকে। তিনপ্রস্থ থাকবার ঘর। সাজানো 'ডাইনিং রুম'। ঘরে ঘরে কার্পেট পাতা। দামী আসবাবপত্র। দেওয়ালে ছবি টাঙানো। ধূলাপায়ে ঢুকতে সঙ্কোচ জাগে,—বাইরে জুতা মোজা খুলে রাখি। মনে পড়ে, কৃষ্ণসখা সুদামার কথা। সখার সন্ধানে রাজপ্রাসাদে এসে স্তম্ভিত কুণ্ঠিত ভাব।

নীচে রাস্তার ধারে দেখা বাড়িটি বনবিভাগেরই আর একটি 'কটেজ'।

দেওবনও উঁচু জায়গা। ন'হাজার ফুটেরও উপর।

সন্ধ্যায় আবার খিচুড়ি পাক হয়। কার্পেটের উপর বসে শীতের দেশে ক্ষুধার মুখে অমৃতের স্বাদ উপভোগ করি।

॥ ৯ ॥

দেওবনের প্রধান আকর্ষণ,—অতিশান্ত নির্জনতা। দোকানপাট নেই, লোকালয়ের কলকোলাহলও নেই। শহরের সদাব্যস্ত উত্ত্যক্ত তপ্ত আবহাওয়ায় মন ক্লান্ত ক্লিষ্ট হলে সহজেই আসা যায়, বিশ্রামও মেলে। বাংলোটিও আরামপ্রদ শৌখিন। দেরাদুন থেকে বাস্‌-এ বসে চক্‌রাতা। পরের দিন ছয় মাইল মাত্র হাঁটাপথ। মোটরের সড়ক এগিয়ে আনারও আয়োজন চলে, দেখি। তবে, আহার্যের ব্যবস্থা সঙ্গেই আনতে হয়। দেওবন থেকে দূরের পাহাড়ের দৃশ্যও মনোহর। কিন্তু, সে-দৃশ্য ঠিকমত পেতে হলে বাংলো থেকে শ'চারেক ফুট আরও ওঠা দরকার। এই পাহাড়ের প্রায় মাথার উপর।
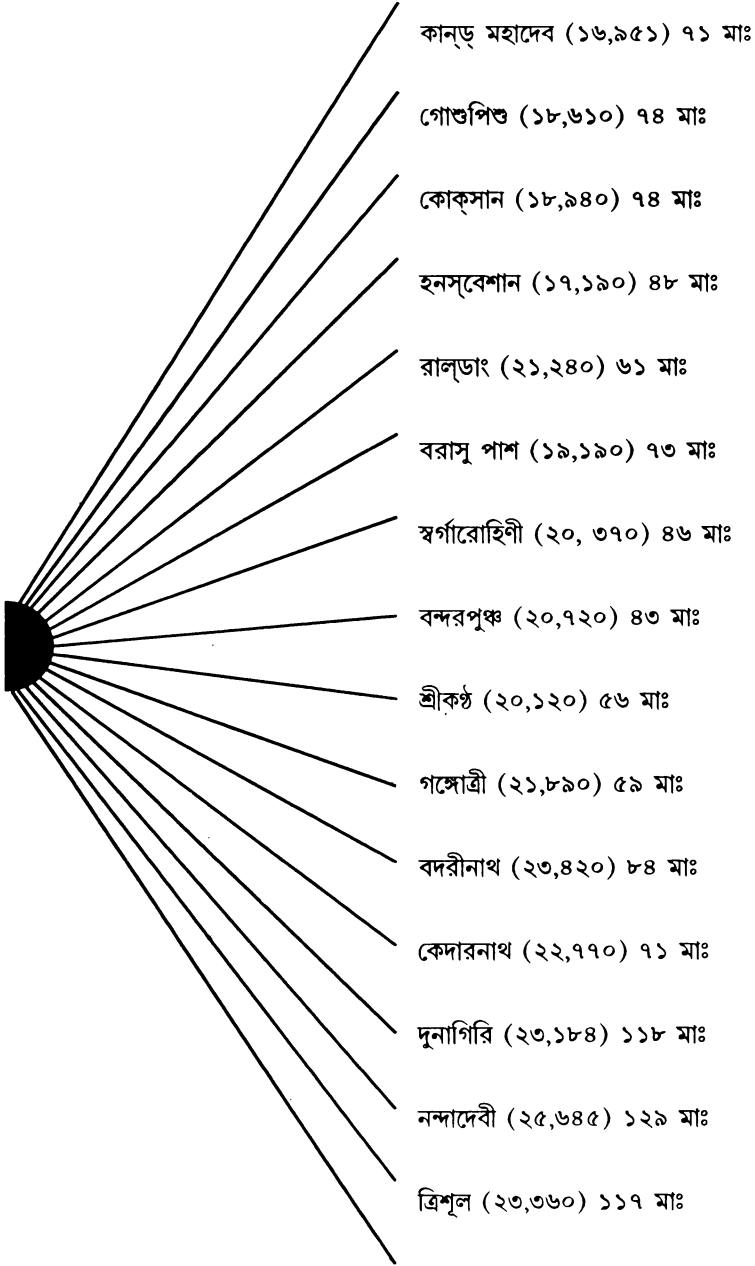
কান্‌ড় মহাদেব (১৬,৯৫১) ৭১ মাঃ
গোশুপিশু (১৮,৬১০) ৭৪ মাঃ
কোক্‌সান (১৮,৯৪০) ৭৪ মাঃ
হ্নস্‌বেশান (১৭,১৯০) ৪৮ মাঃ
রাল্‌ডাং (২১,২৪০) ৬১ মাঃ
বরাসু পাশ (১৯,১৯০) ৭৩ মাঃ
স্বর্গারোহিণী (২০, ৩৭০) ৪৬ মাঃ
বন্দরপুঞ্চ (২০,৭২০) ৪৩ মাঃ
শ্রীকণ্ঠ (২০,১২০) ৫৬ মাঃ
গঙ্গোত্রী (২১,৮৯০) ৫৯ মাঃ
বদরীনাথ (২৩,৪২০) ৮৪ মাঃ
কেদারনাথ (২২,৭৭০) ৭১ মাঃ
দুনাগিরি (২৩,১৮৪) ১১৮ মাঃ
নন্দাদেবী (২৫,৬৪৫) ১২৯ মাঃ
ত্রিশূল (২৩,৩৬০) ১১৭ মাঃ
ব্যাস শিখর (৯,৪০০) দেওবন

ভোরে চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়ে তাই উঠি। বনের ভিতর দিয়ে পথ। এঁকে বেঁকে ওঠে। হঠাৎ এক জায়গায় খোলা প্ল্যাটফর্মের মত। খানিকটা বাঁধানো। বুক উঁচু একটা স্তম্ভ। তারই উপরিভাগে সামনের বহুদূরের তুষারকিরীট গিরিশ্রেণীর রেখাচিত্র আঁকা। নীচে বাংলোর দেওয়ালেও এই গিরিশিখরগুলির একটি বড় স্কেচ্ টাঙানো আছে। Commander E. C. Streit—Field James-এর আঁকা। ৬ই অক্টোবর, ১৯৪২ সালে। শিখরগুলির দূরত্ব ও নাম লেখা।

'ভিউ পয়েন্ট'-এর নাম শুনি ব্যাস-শিখর। হিমালয়ের কতো বিভিন্ন জায়গাতেই না দেখি ব্যাসদেবের নামের সঙ্গে সংযোগ!

সেই দৃশ্যমঞ্চে দাঁড়িয়ে—শান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশে—বহুদূরেরও তুষার-শিখরগুলি দেখতে অপরূপ বোধ হয়।

নীল আকাশের কোলে দিগন্তবিস্তৃত শুভ্র তুষারের সুদীর্ঘ প্রাকার। এই ব্যাসশিখর ও সেই দিগ্বলয়ের পাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল যেন তরঙ্গ-উদ্বেল মহাসাগর। পাহাড়ের পর পাহাড়ের ঊর্মিমালা। সবুজ ও নীলের খেলা। যেন, পটে আঁকা ছবি,—নীরব, নিশ্চল।

শিখরগুলির নাম ও দূরত্ব হিমাদ্রি কাগজে লিখে রাখে।

স্থির নয়নে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে থাকি কেদার শৃঙ্গের দিকে।

কতো দূরে—মনে হয়! ভাবি, ওঁরই চরণতলে কতো দিন কাটে,—মনের কী গভীর আনন্দে!

সুদূর দিগন্তের পটে আঁকা সেই রেখা যেন সস্নেহ দৃষ্টিতে কাছে ডাকতে থাকে,—বলাকার পাখা মেলে মন ছুটে চলে সেই অসীম নীল আকাশে।

বাংলোয় ফিরে যাত্রা করি চক্‌রাতার পথে। বনের ভিতর বাঁ ধার দিয়ে পথ। কেবলি নেমে চলে। ছয় মাইল মাত্র নামা। বেলা দশটার মধ্যেই পৌঁছে যাই। আবার ফিরে আসা শহর-সভ্যতার মাঝে। তবে বড় শহর নয়। হট্টগোলও নেই। এখানে ওখানে ছড়ানো বাংলো। বড় বড় কম্‌পাউণ্ড।

রেস্ট হাউস্‌-এ জায়গা নেই। একটু পরেই এক সাহেব একখানা ঘর খালি করে নেমে যাবেন, চৌকিদার জানায়। তাই অপেক্ষা করি। ঘরও মেলে।

ঘর নয়। রাজপ্রাসাদের কক্ষ যেন। বহুমূল্য কার্পেট, অতিশৌখীন মূল্যবান আসবাবপত্র। দেওবনের অমন বাংলোও আভিজাত্যে হার স্বীকার করে। শুনি, এককালে লাটসাহেবরা এসে থাকতেন। এখন আসেন ক্বচিৎ কখনো স্বাধীন দেশের মিনিস্টারেরা ও বড় বড় কর্মকর্তারা।

পাহাড়ের মাথায় লম্বালম্বি শহর। অপর প্রান্তে কান্‌টন্‌মেণ্ট—সেনা-নিবাস। বিকালে ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াই। এখন সৈন্যসামন্ত বা লোকজন কেউ নেই। পরিত্যক্ত পরিবেশ। যেন, deserted village ! ভাবি, এখান থেকে ছাউনি হয়ত তুলে দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

পরের বছর দেরাদুনে খবর শুনি। চক্‌রাতা কান্‌টন্‌মেণ্ট আবার সজাগ সক্রিয় হয়ে ওঠে। আজকাল পারমিট ছাড়া চক্‌রাতায় প্রবেশ করাই নাকি নিষেধ।

কান্‌টন্‌মেণ্টের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়াই। সুমুখে পাইন বনের ভিতর দিয়ে পথ। পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে সে-পথ নেমে চলে। খবর নিয়ে জানি ঐটিই মুসৌরী যাবার

হাঁটাপথ। শুনি, এখান থেকে সামান্য নেমে তারপর খানিক চড়াই উঠে পাহাড়ের গায়ে চুরানী বা চৌরণপাণির সুন্দর বাংলো। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড-এর। নিকটে গ্রাম নেই। চকরাতা থেকে দশ-এগারো মাইল। চুরানী থেকে লাখওয়ার আরও বারো মাইল। চুরানীর পর পাহাড়ের অপর দিকে পথ ঘুরে যায়, ধীরে ধীরে নামতে থাকে। চুরানী থেকে পাঁচ মাইল গিয়ে নাগহাটের ছোট্ট বাংলো। তারপর উৎরাই পথে নেমে লাখওয়ারের গ্রাম ছাড়িয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বড় বাংলো। এর পর তিন মাইল হুড়হুড় করে নামা—যমুনার উপত্যকায়। নদীর উপর চমৎকার ঝোলানো সেতু। যমুনার প্রসিদ্ধ নীল জল। দুদিকের পাহাড়ের মাঝ দিয়ে বহে চলে। সেখানকার উচ্চতা মাত্র হাজার দুই ফুট। কয় বছর আগে মুসৌরী থেকে সেইখানে বেড়াতে আসি। সন্‌জির ছোট্ট বাংলোয় রাত কাটাই—মনের আনন্দে। সন্‌জির অপর পারে তিন মাইল বেশ খানিক চড়াই উঠে। সে-ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড-এর বাংলো। ছোট একটা টিলার মাথায়। সন্‌জি থেকে মুসৌরী মাত্র নয় মাইল। কেবলি চড়াই, কখনো ধীরে, কখনো বা খাড়া। কিন্তু পথ সুন্দর ও প্রশস্ত। এই পথেরই মাঝামাঝি মুসৌরীর নামজাদা 'কেম্‌প্‌টি ফল্‌স্‌'। হিল স্টেশনের পক্ষে দর্শনীয় জলপ্রপাত। সে-বছর এরই নিকটে আরও দু'রাত্রি কাটাই।

আজ চক্‌রাতার পথের এই প্রান্তে দাঁড়িয়ে সে-সব স্মৃতি মনে জাগে।

আগামী কাল ১১ই অক্টোবর। দেরাদুন থেকে হিমাদ্রির ট্রেন ধরার শেষ তারিখ। তাই, চক্‌রাতা থেকে মুসৌরী—৩৭।৩৮ মাইলের মধ্যে মাইল পঁচিশ—অর্থাৎ দেড়দিনের হাঁটাপথ আমার না দেখাই থেকে যায়।

বনের ধারে দাঁড়িয়ে সে-পথের কাছে বিদায় নিয়ে ফিরে আসি।

॥ ১০ ॥

পরদিন। ভোরে বাস্‌ ধরে দেরাদুনে নামি।

বিকালেই হিমাদ্রির ট্রেন। ভিড়ের ভয়ে ট্রেন ছাড়ার বহু আগে স্টেশনে যায়। খালি জায়গা দখল করে। হিমালয় ছেড়ে যাওয়ার মনের দুঃখ জানায়। নির্দিষ্ট দিনে ট্রেন ধরতে পারার স্বস্তিও প্রকাশ করে। ট্রেনের কামরায় যাত্রীর ভিড় বাড়তে থাকে। হিমাদ্রির একমাসের না-কামানো মুখ-ভরা কালো কুঁচকানো দাড়িগোঁফ। মাথায় তেল না-দেওয়া রুক্ষ চুল,—জটার মত। পরনে ধূলি মলিন ফতুয়াঃ—কমলা রঙের লুঙি,—দেখায় যেন গেরুয়া। সবাই এসে হাত জোড় করে অভিবাদন করে। তরুণ স্বামীজীকে সম্মান দেখায়। কোন অসুবিধা না হয়, সকলের সজাগ দৃষ্টি। 'নবীন সন্ন্যাসী' গম্ভীর মুখে বসে থাকে।

আমি হেসে বিদায় নিই, বলি, এখন তা হলে ঘরে ফিরি, স্বামীজী!

আপন ঘরেই ফিরি বটে। সেইদিনই দেরাদুনের আস্তানায় টেলিগ্রাম পাই ভাইপোর কাছ থেকে। তার পূজার ছুটি চলেছে। পরের দিনই দেরাদুন পৌঁছুবে। বিশেষ ইচ্ছা,—কেদারনাথ যাবার,—আমি যদি সঙ্গে চলি।

পরদিন সকালে স্টেশনে যাই। ভাইপো হাসিমুখে নামে। বলে, পারবে নাকি যেতে? এই এতো ঘুরে এলে,—কষ্ট হবে না?

আমিও হাসি। বলি, যাব নিজের দেশে,—ভাবনা কিসের?

সেইদিনই বিকালে হৃষীকেশ পৌঁছুই। পরের দিন যাত্রা শুরু হয়—কেদারনাথ পথে।

মনভরা আনন্দ।

এই তো সেদিন দেওবন থেকে বহু দূরে দেখা, আকাশের সেই পটে-আঁকা কেদারশিখর! হারিয়ে-যাওয়া কোন্ এক যেন স্বপ্নলোকে। মনের গোপন কোণে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগায়। আজ এখন আবার চলি তাঁরই চরণপ্রান্তে আশ্রয় পেতে।

ভাবি, হিমালয় বুঝি এমনি করেই শোনেন মনের কথা, এমনি ভাবেই টানেন পরম শান্তিময় আপন কোলে!

কিন্নর দেশ

॥ ১ ॥

কিন্নরলোক!

সে তো কাব্যে পড়া। স্বপ্নে দেখা। অজন্তার চারুচিত্রে কল্পনার তুলিতে আঁকা। দেবলোকের গায়ক-গায়িকা। আকাশ-পথে মেঘলোকে ভেসে চলে। অপরূপা সুন্দর কিন্নর-কিন্নরী। হাতে বাঁশী। মুখে হাসি। সাবলীল ভঙ্গি।

কল্পনার সেই রাজ্য ছেড়ে রক্ত-মাংসের দেহধারী মানুষ চলে সেই কিন্নর দেশে। হিমালয়ের নিভৃত গোপনপুরে। প্রাচীন যুগে নয়। ১৯৬০ সালে। এপ্রিল-মে মাসে।

মহাভারতের উল্লিখিত কিম্‌পুরুষ দেশ। কবি কালিদাসের অপূর্ব বর্ণনা সেই কিন্নর-কিন্নরীর। ছেলেবেলায় শেখা,—কিন্নর বা কিম্‌পুরুষ। অদ্ভুত মানুষ। অশ্বের ন্যায় মুখ, অথচ নর-দেহ। ভাবি, আধুনিক কালের কিন্নর,—এরাই বা দেখতে কেমন? কেমনই বা এদের জীবনধারা? শুধু কি নৃত্য-গীত-বাদ্যের আনন্দ হিল্লোল? হিমাচলের এই কিন্নরদেশ,— দেখতেই বা কেমন?

যাবার হঠাৎ সুযোগও আসে।

হিমালয়ের প্রসিদ্ধ শৈল-শহর—সিমলা। তারই উপান্তে মাসোব্‌রা পল্লী। সেখানে হিমাচল প্রদেশের ফরেস্ট রেঞ্জারদের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। গাড়োয়ালী বন্ধু বিপুলানন্দ তখন সেখানকার অধ্যক্ষ। সাদর আমন্ত্রণ জানান, চলে আসুন এখানে। নিরিবিলি ভালই লাগবে। আর ইচ্ছা করেন, কিন্নরদেশও ঘুরে-আসবেন। দেখেন নি তো এখনও হিমালয়ের সে-অঞ্চল? আমার এলাকার মধ্যে না হলেও ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কালক্ষেপ করি না। মাসোব্‌রায় হাজির হই।

কিন্নর দেশ চিনি-ভ্যালিতে। শতদ্রু বা সাটলেজ উপত্যকায়। সিমলা থেকে সে-সময়ে বাস্ চলে রামপুর পর্যন্ত। ভারতে রামপুর নামে একাধিক শহর। তাই এই শহরের স্বতন্ত্র পরিচয়—'রামপুর-বুসায়ার' নামে। কিছুকাল আগেও বুসায়ার-রাজ্যের রাজধানী ছিল এইখানে।

বিপুলানন্দ জানায়, রামপুর পর্যন্ত ত বাস্। তারপর পায়ে হেঁটে চলা। কেদারবদরীর তীর্থ-পথ ত নয়, যে পথে-পথে চটি বা ধর্মশালা পাবেন। চলুন, সিমলার দপ্তরে একবার যাওয়া যাক, ওপথে ফরেস্ট ও পি. ডবলিউ. ডি.-র বাংলো যেখানে আছে, রিজার্ভ করাই ভালো। তাছাড়া রামপুরের বাস্-পথ গিয়েছে এই মাসোব্‌রার কাছ দিয়েই, যাতে এইখানেই বাস্ ধরতে পারেন, তারও ব্যবস্থা করে আসি।

সেইমতই সব আয়োজনও হয়। ২৯শে এপ্রিল সকালে রামপুর যাত্রা করি।

হিন্দুস্থান-তিব্বত রোড দিয়ে বাস্ ছুটে চলে। কুফরি, ফাগু, থিয়োগ ছাড়িয়ে গিরিশ্রেণীর মাথার উপর দিক ধরে এগিয়ে যায়। শান্ত স্তব্ধ হিমালয়ে বিকট শব্দের হুঙ্কার তোলে। পাহাড়ের অনেকখানি উঠে একটা বড় মোড় ঘুরে নারকাণ্ডায় পৌঁছয়। সিমলা

থেকে ৪২ মাইল। ৮,৮৬০ ফুট উঁচুতে সেকালে ট্যুরিস্ট মহলে নারকাণ্ডার খ্যাতি ছিল। তখন বাস্ হয়নি, সাহেবরা আসতেন হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে। এখন চলে আসি চক্ষের পলকে, মোটরে বসে।

ড্রাইভার জানায়, গাড়ী আধঘণ্টা দাঁড়াবে। দুপুরের আহার সারতে চান তো সেরে নিন।

বাস-স্ট্যাণ্ড-এর অল্প উপরেই P. W. D.-র ডাকবাংলো। সেইখানে উঠি।

শান্ত পরিবেশ। অতি পরিচ্ছন্ন সুন্দর সাজানো বাংলো। লম্বা টানা বারান্দা। সারি সারি ঘর। সামনে কয়েক ধাপ নেমে ঘন সবুজ লন। রোদে ভরা। চারিদিকে ফুলগাছের বেড। যেন ফুল-কাটা বর্ডার আঁকা সবুজ কার্পেট পাতা। কয়েকটি হলুদ রঙের বেতের চেয়ার ও টেবিল সাজানো। শীতের দেশে বৈশাখের রোদও মনে হয় যেন জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ প্রলেপ। একপাশে দুটি মেমসাহেব বসে।

সুমুখপানে পাহাড়ের ঢালু গা বহু নীচে ভ্যালির দিকে নেমে যায়। সেইখানে শতদ্রুর উপত্যকা। ভ্যালির অপর পারে স্তরে স্তরে পাহাড়ের সারি। একটার পিছনে আর একটা। সর্বশেষে তুষার গিরিশ্রেণী। নীল আকাশের গায়ে সুদীর্ঘ শ্বেতরেখার তরঙ্গায়িত আলিম্পন। মনোমুগ্ধকর দিগন্ত-বিস্তারী দৃশ্য।

চেয়ার টেনে নিয়ে বসি। চায়ের অর্ডার দিই।

মেমসাহেবরা মুখ ফিরিয়ে তাকান। প্রৌঢ়া মহিলাটি মৃদু হাসেন। অভিবাদন জানিয়ে বলেন, চমৎকার আবহাওয়া। অপরূপ দৃশ্যও। আমরা এসেছি তিনদিন। থাকবেন তো কয়েকদিন?

প্রত্যভিবাদন জানিয়ে বলি, "সত্যিই অতি সুন্দর জায়গা। কিন্তু, এখন চলেছি রামপুর, সেখান থেকে চিনি যাবার ইচ্ছা। এখন ভাবছি, কিন্নর থেকে ফেরবার পথে এইখানে কাটিয়ে যাব ক'দিন।"

মহিলা উৎসুক হয়ে বলেন, চিনি?—ওঃ। খুব ভাল লাগবে,—সে তো স্বর্গরাজ্য! ঘুরে আসুন—মনের আনন্দে—

হঠাৎ চুপ করে যান। দূরদিগন্তের পাহাড়গুলির দিকে একদৃষ্টে তাকান। আনমনা ভাবে অস্ফুট স্বরে সঙ্গিনীকে বলেন, অ্যালিস! তোমার মনে পড়ে? আমিও চলে যেতাম—ওই সব পাহাড়ে ঘুরতে। সে-সব কীই না দিন গেছে!

আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, হিমালয়ের আকর্ষণ এ কখনো ভোলবার নয়। বিশ্বাস করবেন? এগারো বছর পরে আবার এখানে এলাম। সিমলা থেকে বেড়াতে আসা নয়। সোজা আসছি সেই ইংল্যাণ্ড থেকে। অন্য কোন কিছু কাজে নয়,—শুধু আবার একবার হিমালয়কে দেখে যাবার জন্যে। এ-টানের অর্থ যে কি, যে না জানে তাকে বোঝানো যায় না।

কথা বলি না। শুধু হাসি। কিসের আনন্দে আমারও মন ভরে ওঠে।

হঠাৎ মনে পড়ে, একশ' বছরেরও আগেকার এক ভ্রমণকারীর কাহিনী। এই নারকাণ্ডায় আসেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৫৭ সালের ১০ই জুন।

"দীর্ঘকাল নির্জনে যথেচ্ছ ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা" নিয়ে কলকাতা থেকে দেবেন্দ্রনাথ যাত্রা করেন ৩রা অক্টোবর, ১৮৫৬ সালে। কোথায় তখন এরোপ্লেন, ট্রেন, বাস্, মোটর! চলেন তিনি জলপথে নৌকা চড়ে। সুবিধামত ডাকগাড়ীতেও। কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা,

দিল্লী, মথুরা, আম্বালা, লাহোর, অমৃতসর প্রভৃতি ঘুরে কালকায় পৌঁছান। সেখান থেকে ঝাঁপানে চড়ে সিমলায় আসেন ২৮শে এপ্রিল, ১৮৫৭। ১৫ই মে তাঁর চল্লিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হয়। ৬ই জুন সুঙ্খী ভ্রমণের জন্যে সিমলা থেকে যাত্রা করেন। সঙ্গী কিশোরীনাথ চাটুয্যে সঙ্গে যান না। দেবেন্দ্রনাথ একাই চলেন ঝাঁপানে চড়ে হিমালয়ের সেই দুর্গম বিজন পথে। চার দিন পরে নারকাণ্ডায় পৌঁছান। পরের দিন সুঙ্খীতে। সিমলায় আবার ফিরে যান—২৬শে জুন।

হিমালয়ের এই অঞ্চলের পার্বত্যশোভা ও নানাবর্ণের ফুলের বিপুল সমারোহ তাঁর মন মুগ্ধ করে। 'আত্মজীবনী'তে তার অপূর্ব বর্ণনাও দেন। হিমালয়ের প্রভাব তিনিও মর্মে মর্মে অনুভব করেন। সিমলায় বসে তিনি উপনিষদ, হাফিজ, Kant, Fichte, Victor Cousin, Scottish Intuitionists প্রভৃতি দার্শনিকগণের ও Francis Newman-এর গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন। আত্মার মূল তত্ত্বের অনুসন্ধানেও মগ্ন থাকেন। ব্রহ্মসহবাস-জনিত আনন্দও উপভোগ করেন।

১৮৫৮ সালের অক্টোবরে বিচিত্র এক ঘটনা ঘটে। বেগবতী পাহাড়ী এক নদী প্রবলবেগে নেমে চলে। তন্ময় হয়ে তিনি দেখতে থাকেন। হঠাৎ সেই নিম্নগামিনী নদীর স্রোত দেখতে দেখতে দেশে ফিরে যাবার জন্যে ঈশ্বরের আদেশ অনুভব করেন।

১৫ই নভেম্বর, ১৮৫৮ সাল,—তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন।

হিমালয়-প্রত্যাগত সেই পরিব্রাজক দেবেন্দ্রনাথের পরবর্তী সন্তানই,—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জন্মতারিখ,—৭ই মে ১৮৬১।

॥ ২ ॥

বাস্ আবার ছুটে চলে। পাহাড়ের গা বেয়ে পথ নামে। শুনি, নারকাণ্ডা থেকে রামপুর যাবার অন্য আর এক পথও আছে। থানাদার ও কোটগড় হয়ে সে-পথ যায়। ও-পথে রামপুরের দূরত্ব কম, কিন্তু এখনও বাস্ চালু হয় নি। কোটগড়ের আপেল সিমলা অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। রাহুল সাংকৃত্যায়নের বই-এ পড়ি, এই শতাব্দীর প্রথম দিকে স্টোক নামে এক আমেরিকান খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতেও ঐ অঞ্চলে আসেন। কিন্তু, দেশ-কালের বিচিত্র প্রভাব। কালক্রমে তিনি ভারতের নিবেশাধিকার—domicile গ্রহণ করেন। নাম হয়—সত্যানন্দ স্টোক্। প্রচারক সাহেব হয়ে যান হিন্দু সাধু। সাত বছর গুহাবাসী হয়ে কঠোর জীবন যাপন করেন। তারপর, আবার মানুষের মনের আর এক আকস্মিক পরিণতি। এক পাহাড়ী তরুণীকে বিবাহ করে সংসারধর্ম নেন। অসহযোগ আন্দোলনেও যোগ দেন। কোটগড়ে আপেলের বেসাতি তিনিই শুরু করেন। স্কুল প্রতিষ্ঠা, হিন্দু-মন্দির-স্থাপনা প্রভৃতি বহু জনহিতকর কার্য করে তিনি কোটগড় অঞ্চলের উন্নতি সাধন করেন, তাঁর নামও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে।

বাস্ নেমে চলে পাহাড়ের নীচের দিকে। পথের পাশে বড় বড় পাইন ও দেওদারের

বন। শান্ত নীরব। শুধু বাস্ চলার ঝরঝর কর্কশ শব্দ। যেন, অবোধ দুরন্ত বালক ধ্যানমৌন অরণ্যদেবকে উপহাস করে। একটা বাঁক ঘুরতেই বাস্ দাঁড়িয়ে পড়ে। সামনে এগোবার উপায় নেই। রাস্তার মাঝখানে দেওদারের প্রকাণ্ড এক কাটা গুঁড়ি,—যেন বৃহৎ শিলাখণ্ড। জন দশ বারো তিব্বতী 'রেফিউজি' রাস্তা মেরামতের কাজে ব্যস্ত। মাত্র মিনিট দশেকের মধ্যেই পথের এই অবরোধ ঘটেছে, সহজেই বুঝতে পারি। আমাদের বাস্-এর একটু আগে অন্য দুটো বাস্ ছিল, তার কোনটাই দাঁড়িয়ে নেই। সেগুলি চলে যাবার পরই এই বিপর্যয়। অথচ, ঘটনাটা ঘটে প্রাকৃতিক দুর্যোগে নয়। দেখেই বোঝা যায়, পথের বাঁ দিকে পাহাড়ের উপরে গাছের এই ভগ্নাংশ পড়ে ছিল, লোকগুলো ঠেলে এইমাত্র পথের উপর ফেলেছে, এইমাত্র এখান থেকে গড়িয়ে উল্টাদিকে পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে নীচে ফেলে দেবে। কিন্তু পথের সমতল অংশটুকু গায়ের জোরে ঠেলে নিয়ে যায়—এ কয়টা লোকের সে-সামর্থ্য নেই। এক চুলও নড়াতে পারে না,—এত গুরুভার ঐ গুঁড়িটার। অথচ আশ্চর্যের বিষয়,—আগের ঐ গাড়ী দুটি পার হবার সময় লোকগুলি খবর পায়, পিছনে অন্য গাড়ীও আসছে। ড্রাইভার, কনডাকটর, যাত্রীরা— অনেকেই স্বভাবত বিরক্ত হন, রাগ করেন তাদের এই দুর্বুদ্ধি দেখে। চেঁচামেচি চলে। হিমালয়ের নিস্তব্ধ আসর ভেঙে চুরমার হয়। বনতলে প্রতিধ্বনি ওঠে। অরণ্যদেবের অনুচরেরা যেন এতক্ষণে উপহাসের প্রত্যুত্তরে অট্টহাসি তোলে।

খাকী-পোশাক-পরা এক যুবক বাসে সহযাত্রী। ফর্সা রঙ। ঘন কালো চুল। টানা চোখ। টিকাল নাক। দোহারা গড়ন। দেখেই বোঝা যায় করিৎকর্মা। সকাল থেকে বাস্-এ আসছে। আপন মনে চুপ করে বসে। কারও সঙ্গে অযথা কথা বলতে দেখি নি।

এখানেও এই শোরগোলের মধ্যে দেখি সে শান্ত ধীর। কোন কথা বলে না। একমনে ঘুরে ঘুরে গুঁড়িটি ও পথের আশপাশ দেখে। কোন্ দিক দিয়ে ঠেলা পেলে ওটি স্বাভাবিক ভাবে গড়িয়ে যাওয়ার গতিবেগ পেতে পারে, বোধ করি তাই দেখে নেয়। তারপর বেশ উঁচু গলায় সবাইকে ডাকে। গম্ভীর কণ্ঠে বলে, এ-ভাবে ঝগড়া ও রাগ করে ত লাভ হবে না, ভাই—সবাই মিলে ঠেল এদিক থেকে একই সঙ্গে।

সমবেত চেষ্টায় গুঁড়িটা নড়ে, কিন্তু সরে না। সে তখন কুলিদের কাছে কয়টা কুড়ুল দেখে হুকুম দেয়, কাটো গুঁড়িটাকে কয়েক ভাগে,—দেখিয়েও দেয়,—এইখানে এইদিকে।

কয়জন উৎসাহে লেগে যায় ঐ কাজে। দু'তিনটা অংশ বিচ্ছিন্ন হতেই,—সবাই মিলে সহজেই এবার অংশগুলি নীচের দিকে ঠেলে ফেলে। বাস্-ও আবার আপন পথে চলতে শুরু করে।

ছেলেটি নির্বিকার ভাবে নিজের সীট-এ বসে থাকে। নিজের কৃতিত্বের কোন গর্ববোধই নেই।

তার হাবভাব আচরণ আমার ভাল লাগে। নিজে থেকেই আলাপ করি। শুনে আরও আনন্দ পাই—সে কিন্নর। উৎসাহে বলি, বাঃ! তোমাদের দেশ, তোমাদের বর্ণনা—আমাদের কাছে উপকথার মত। তাই ত চলেছি দেখতে। কিন্নর বলতেই আমাদের মনে হয়,—নাচ, গান, বাজনা। কিন্তু, তোমার ত বোধ হয় এটা মিলিটারীর পোশাক?

লজ্জা পায়। মৃদু হাসে। বলে, ঠিকই ধরেছেন। ছুটি পেয়ে দেশে ফিরছি। কিন্তু,

দেশরক্ষার ভার—সেও ত আমাদের নিতে হবে। গান বাজনা,—সে-সব ত আছেই, ওতে আমাদের আজন্ম অধিকার। বাড়ী পৌঁছুলেই আমার এই চেহারা বদলে যাবে,—এই জামা-কাপড়, টুপি, হাবভাব, সবই। বাঁশী? আমারও আছে—চুপ করে কি যেন ভাবে। আসন্ন আনন্দের আশায় মুখে তার হাসি ফোটে।

আমারও ভাল লাগে। তবু ভাবি, কিন্নর—সেও এখন ছেড়ে বাঁশী, ধরেছে অসি!

কিন্তু, অশ্বমুখের আকৃতিও এর নেই দেখি।

প্রবহমান কালের প্রভাবে মানব-জীবনের কত বিচিত্রই না পরিণতি!

বাস্ শতদ্রুর ধারে নেমে আসে। নদীর কূল ধরে এবার পথ এগিয়ে চলে।

পথের পাশে গ্রাম। নাম শুনি, নির‍্ত্ (Nirth)। বাস্ থামে। অল্প দূরেই পুরানো সুন্দর মন্দির। শিখরবিশিষ্ট। তাই, কৌতূহল জাগে। কিন্নর সহযাত্রী জানায়, শুনেছি, অষ্টম শতাব্দীর।

সূর্যমন্দির। মূর্তিটি ঐ গাছতলায়।

পাথরের মূর্তি। সুন্দর শিল্পকলার নিদর্শন। পায়ে সেই বুটের মত জুতা। দু'হাতে সূর্যমুখী ফুল। কোনারকের সেই প্রসিদ্ধ সূর্যমুখীর কথা স্মরণ করায়।

বাস্-এর হর্ন শুনি। তারপর গাড়ি ছুটে চলে। এঁকে-বেঁকে পাহাড়ের গা দিয়ে, নদীর তীর ধরে। আরও মাইল বারো গিয়ে রামপুরে পৌঁছুই। বিকেলবেলায়। সিমলা থেকে প্রায় ৮৫ মাইল দূর। ৩,৮৬০ ফুট উঁচু। কিন্তু, দেখে মনে হয় না। শতদ্রুর উপত্যকায়। দু'পাশে গিরিশ্রেণী। তারই মাঝখান দিয়ে নদী বহে আসে। যেন রুল পেতে সোজা লাইন টেনে নামে। নদীর তীরে শহর। দুদিকের পাহাড়ের পাথর সারাদিনের রৌদ্রে তপ্ত হয়ে ওঠে, তাই বিকেলেও বেশ গরম বোধ হয়।

শহরে প্রবেশ করার খানিক আগে বাস্-পথের বাঁদিকে P. W. D. ডাকবাংলো। নদীর অল্প উপরে। সুন্দর ঝকঝকে বাড়ী। সেইখানেই বাস্ থেকে নামি। কিন্তু ঘর খালি পাই না। একদল Geologistsও আজই বাস্-এ এলেন। পথে সামান্য আলাপও হয়। এই পার্বত্য অঞ্চলে মূল্যবান ধাতুর সন্ধানে সার্ভে করতে আসা তাঁদের উদ্দেশ্য। দলে বাঙালীও আছেন। এসেই তাঁরা একটা ঘর দখল করেন। সাগ্রহে জানান, তাঁদের সঙ্গে আমিও থাকতে পারি।

আমার তখন থাকবার জায়গার জন্য দুশ্চিন্তা আসে না। যেখানে যেমন ভাবেই হোক, কাটিয়ে দেওয়া যাবে। মন তখন উন্মুখ,—কালই যদি পায়ে হাঁটা শুরু করতে পারি! আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা আজই তাহলে করতে হয়। তাই তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে জানাই, মালগুলি এখানে রেখে শহরে খোঁজখবর নিতে যাই, আর রাত কাটানোর ব্যবস্থাও যদি ঐদিকেই হয়ে যায়—এগুলো পরে নিয়ে যাব।

সুব্যবস্থাও হয়ে যায় অতি সহজে শহরেই।

বিপুলানন্দ চিঠি দিয়েছে এখানকার ফরেস্ট-অফিসারের নামে। তাঁর দপ্তরে চলি। দেখি, অফিস বন্ধ। বাড়ীর খোঁজ নিয়ে সেখানে যাই। সাহেব ট্যুরে গেছেন। দিন তিন-চার পরে ফিরবেন।

মনে মনে ভাবি, এ-যেন পাহাড়ে পায়ে হাঁটার পর্ব শুরু হয়েছে। পথ হারিয়ে ঘুরি,—

এদিকে যাই, দেখি খাদ্। ওদিকে চলি, সেদিকেও বাধা। চমৎকার লাগে—এইসব বিপত্তি, চলার মাঝে। জাল কেটে মুক্তি পাওয়া,—তাইতেই ত আনন্দ!

খোঁজ নিই, অফিসারের সেক্রেটারীর। নাম শুনি, মিঃ বলি। তাঁর বাড়ীতে যাই। চিঠিখানি দিই। পড়েই বলেন, সাহেব নেই, তাতে কি? তিনি থাকলেও, আমাকেই সব করতে হোত। ব্যবস্থা এখনি হয়ে যাবে। কিন্তু আপনার মালপত্র? উঠেছেন কোথায়?

সব শুনে বলেন, না, না—ডাকবাংলোতে জায়গা পেলেও এখান থেকে দূর হবে। আমার কাছে এইখানে থাকুন। ছোট বাড়ী—আপনার অসুবিধা হবে, তা হোক্। মালপত্র লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নিচ্ছি এখনি।

কথা শুনে মনে মনে খুশী হই। ভাবি, এতক্ষণে তরী বুঝি তীরে ভেড়ে। মুখে বলি, আপনার এখানে থাকা? আপনার অসুবিধে হবে যে।

"আমার? পাঞ্জাবী রেফিউজি—আমাদের আবার কষ্টবোধ কি? এই ত দেখছেন, দুখানা ঘর। ওটাতে আমি শুই। এটা খালি পড়ে থাকে, খাটিয়াও পাতা আছে। থাকবেন এইখানে। আমি ত থাকি একাই। ছেলেমেয়ে মীরাটে। পড়াশুনা করছে। তাদের মা-ও তাদের ছেড়ে থাকতে পারে না।"

মনখোলা হাসিখুশি, ভদ্রলোক। অথচ, মনে হয় জবরদস্ত।

তখনি চাপরাসীকে ডাক দেন। বাংলো থেকে মালপত্র আনতে বলেন। চায়েরও ব্যবস্থা করতে হুকুম দেন।

আমি বলি, আপনার কাজ না থাকলে, চলুন না, একই সঙ্গে যাব জিনিসপত্র আনতে। শহরটাও ঘুরে দেখা যাবে। কিন্তু কালই সকালে আমাকে রওনা করিয়ে দিতে হবে যে-কোন-রকমে। দরকার, জানাশোনা একজন ভাল লোকের, মালপত্র নিয়ে সঙ্গে যাবে, আর যা-হোক-কিছু-রান্নাও যদি করতে পারে, কথাই নেই। ক'দিনের খাবার জিনিসপত্রও এখান থেকেই নিয়ে যেতে হবে নাকি?

তিনি হেসে বলেন, ব্যস্ত হবেন না। যা ব্যবস্থা করার সবই হয়ে যাবে,—সন্ধ্যের মধ্যেই। কাল সকালে রওনা হচ্ছেন, জেনে রাখুন। মাল নিয়ে যাওয়ার লোক এখানে মেলে না, এখানে মানুষ মাল বয় না। কিন্নর পুরুষরা ত নয়ই। খচ্চরে নিয়ে যায়। তারই ব্যবস্থা করতে হবে। এখন চা খেয়ে চলুন, আপনার মালের বহরটা দেখি। রেশনও এইখান থেকেই নিতে হবে, কতো দিন ও-অঞ্চলে কাটাবেন, তাই বুঝে। ভাববেন না কিছু,—সব ঠিক করে দেব।

কথাগুলি শুনে নিশ্চিন্ত বোধ করি। মনে হয়, যেন কাল সকালে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছি।

শহর ঘোরা হয়।

বলিজি বলেন, শহর আর এমন বড় কি? পাহাড়ের দূর অঞ্চলে,—তাই এতো খ্যাতি। বুসায়ার স্টেটের রাজধানী এইখানে ছিল। মাত্র দু'শ বছর আগে রাজারা এখানে গড়ে তোলেন। তার আগে পুরানো রাজধানী ছিল সারাহানে। আরও এগিয়ে পাহাড়ের মধ্যে। চিনি যাবার পথে কালই ওখানে পৌঁছে যাবেন। এখন রাজাদের রাজ্য গিয়েছে। এ-সব অঞ্চলও স্বাধীন ভারতে যুক্ত হয়েছে। নতুন হিমাচলপ্রদেশও গড়ে উঠেছে। ভাল কথা, দু'দিন আগে এসে পৌঁছুলেন না কেন?

জিজ্ঞাসুনয়নে তাঁর দিকে তাকাই।

বলেন, খোঁজখবর কিছুই রাখেন না বুঝি? চিনিতে চলেছেন, চিনি ভ্যালিতে এসেছেন,— পরশু ১লা মে থেকে চিনি নাম তো উঠে যাচ্ছে। চিনি শহরের নতুন নাম হবে—কল্পা। অবশ্য চিনি থেকে আধ মাইলটাক এগিয়ে কল্পা বলে একটা গ্রাম এখনও আছে। সেই নামটাই থাকবে। আর নতুন জেলার নাম হচ্ছে—কন্নৌর,—অর্থাৎ কিন্নর। অবশ্য আগেও কিনওয়ার বা কনওয়ার নামের প্রচলন ছিল, কিন্তু জেলা হিসাবে মর্যাদা ছিল না। তাই, কাল চিনির উদ্দেশে যাত্রা করবেন,—কিন্তু ক'দিন পরে পৌঁছুবেন যখন, চিনি আর পাবেন না, পাবেন কল্পা।

শুনে হেসে বলি, নাম পালটানো নতুন আর কি? সারাজীবন কলকাতায় কাটালাম, এখন ক্বচিৎ কখনো সেখানে গেলে রাস্তাঘাটের নতুন নতুন নাম শুনলে বুঝতেই পারি না—সেটা আবার শহরের কোন্ অঞ্চলে! তবে, এখানে চিনি নাম মুছে দেবার গূঢ় কারণ বোঝা যায়। কিন্তু, চিনির বদলে, না হয়, কল্পাতেই গেলাম—কিন্নরদেশ ত আছেই, দুদিন আগে এখানে আসার কথা বললেন কেন? তিনি বলেন, এলেন কিন্নর-কিন্নরী দেখতে, তাদের নাচ-গান-উৎসবই যদি না দেখলেন, তবে আর দেখা হোল কি? এই রামপুরের প্রসিদ্ধির কারণ জানেন তো? এখানকার 'রাভি' মেলা। কার্তিক মাসে হয়। বিরাট মেলা। পাহাড়ের সেই সুদূর অঞ্চল থেকে কাতারে কাতারে লোকজন ত আসেই, এমন কি ভারতের সমতল প্রদেশগুলো থেকেও। কতো কি বেচাকেনা চলে। সেই মেলাতেই পাওয়া যায় এখানকার পশমী চাদর,—সারা ভারতে যার পরিচয় 'রামপুরী চাদর' বলে। কিন্তু সে-কথা নয়, যা বলছিলাম—সেই মেলাতে ক'দিন-রাত্রি ধরে কিন্নর-কিন্নরীদের যা নাচ-গান চলে, সাজগোছের বাহারই বা কি?—কুলুর 'দশহেরা' মেলা দেখেছেন নিশ্চয়?—এ-ও তার চেয়ে কম নয়। আরও ছোট দুটো মেলা বসে, একটা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে, অপরটা পৌষে। কিন্তু 'রাভি'র মত নয়। আপনি এলেন অন্য সময়, তবুও ১লা মে তারিখে চিনিতে পৌঁছুলে দেখতে পেতেন কিন্নরদের উৎসব নাচ-গান। নতুন জেলার পত্তন হচ্ছে বলে সব বড় কর্তারা এখন চিনিতে গেছেন—বিরাট উৎসবের আয়োজন হয়েছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলি, খুব বেঁচে গেছি মশাই, দুদিন আগে পৌঁছুই নি। ঐ ভিড়, হৈচৈ, সমারোহ,—ও সব আর ধাতে সয় না, ভালও লাগে না। নিরিবিলি একা ঘোরায় কতো আনন্দ! এই দেখুন না, দপ্তরে বা সভা-সমিতিতে দেখা হলে আপনাকে এমনভাবে পেতাম? আর, ঐ 'ভি. আই. পি.'—না কি বলেন? যতো দূরে থাকা যায়,—ততই শান্তি। খাসা লাগে আমার বনজঙ্গল পাহাড়, পাহাড়ী অধিবাসীদের।

বলিজি ঘাড় নেড়ে হাসেন। বলেন, এখানে দেখবার আর আছে কি? বড় রাস্তা এই একটাই। সোজা চলে গেছে শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। দু'পাশে যেন দুই সরিকের মধ্যে সীমানা টেনে। একদিকে পাহাড়ের গায়ে রাজপ্রাসাদ, পুরনো মন্দির। স্কুল, কাছারি, সরকারী দপ্তর ইত্যাদি ত থাকবেই। দেখলেই মনে হবে সমৃদ্ধ শহর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও। অপর দিকে নদী। রাস্তা ও নদীর মাঝখানে বাজার, দোকানপাট, গলিপথ, সাধারণ লোকের বসবাস, কাঠের ঘর-বাড়ি, পাহাড়ী শহরের অপরিচ্ছন্নতাও। নদীর অপরপার, জানেন তো, ভিন্ন জেলা—কুলু? নদীর স্থানীয় নামটাও জেনে রাখুন—শতদ্রু ত নয়ই, সাট্‌লেজও নয়,—সাতলুজ।

হেসে বলি, যার নাম শোনালেন, তার জন্মস্থান দেখার কিন্তু আমার সৌভাগ্য হয়েছিল।

বলিজি খুশী হয়ে আমার দিকে তাকান। বলেন, সে তো তিব্বতে। গিয়েছিলেন নাকি? সাট্‌লেজ ত উঠেছে, শুনি, মানস সরোবর—রাক্ষসতাল অঞ্চলে। তারপর হিমালয় ভেদ করে সিপ্‌কি-পাশ-এর নিকটে, বহে আসে কিন্নরদেশের মধ্যে দিয়ে। আরও নেমে গিয়ে সিমলার নীচে দিয়ে ঘুরে পঞ্জাবে পড়েছে,—তারপর—

হঠাৎ চুপ করে যান। গম্ভীর গলায় ধীরে ধীরে বলেন, এতো বড় নদী—এই দীর্ঘ পথ ঘুরে আসা—এখন হারিয়ে ফেলে রেখে এলাম পাকিস্তানে!

তাকিয়ে দেখি, শতদ্রুর পানে। হিমপ্রদেশের বিরাট গিরিশ্রেণী উৎকীর্ণ করে পথ খুঁজে আসা,—নদীর দুর্জয় শক্তি ও ভীষণতারই পরিচয় দেয়। তাই বোধ করি এই সব অঞ্চলে শতদ্রুর রুক্ষ রূপ। কর্দমাক্ত, আবিল, প্রবল জলস্রোত।

॥ ৩ ॥

শহর ঘুরে ঘরে ফিরি। ডাকবাংলো থেকে মালপত্রও আসে। বলি সাহেব হুকুম জারি করে লোকজনও দু'একজনকে আনান। বারান্দায় চেয়ারে বসে গড়গড়া টানতে টানতে সব ব্যবস্থা ঠিকমতই করে যান। নিশ্চিন্ত মনে চুপচাপ বসে দেখি। মনে মনে লোকটির কাজ করানোর ক্ষমতার তারিফ করি। কথাবার্তা কি ভাষায় চালান, সব বুঝি না। দেখি, সবাই তটস্থ।

সব ব্যবস্থা হয়ে গেলে বলেন, যাক—সব ঠিক হয়ে গেল। এখনও রাতের ভোজনের একটু দেরি,—আর এক কাপ চা বলুক, কি বলেন? ব্যবস্থা যা হোল, শুনুন এবার। মাল আপনার অল্পই। একটা খচ্চরেরও বোঝা নয়, এর দ্বিগুণের বেশি ভার একটা খচ্চর বয়। কিন্তু আধখানা খচ্চর তো আর যাবে না, পুরো একটাই নিতে হবে,—বলে হো হো করে হাসেন।

বলি, তা ঠিক আছে,—একটা খচ্চরের ভাড়া কতো, তাই শুনি।

''ব্যস্ত হবেন না,—সব কথাটা শুনুন আগে। খচ্চর তো আপনার একটা দরকার,—কিন্তু ও-সব জানোয়ার আবার এমনি গোঁয়ার, কোনমতেই পাহাড়ে একা চলবে না, দল বেঁধে তবে যাবে।''

উদ্‌গ্রীবতা প্রকাশ করে বলি, বলেন কি মশাই? তার মানে, আধখানা খচ্চরের মাল হলেও আমাকে একদল খচ্চর নিতে হবে? তাই ব্যবস্থা করলেন নাকি?

তিনি হেসে বলেন, ব্যবস্থাটা তাই হোল বটে, কিন্তু খরচটা আপনাকে শুধু একটার জন্যেই দিতে হবে। তাই তো ঐ লোকগুলোকে ডেকে আনিয়েছিলাম। ঐ যে দুজন এসেছিল,—ঝাঁকড়া চুল, লম্বাচওড়া বিরাট পাগড়ি, আলখাল্লা মতন ঝোলা-পাঞ্জাবি গায়ে,—দেখতে অনেকটা পেশোয়ারী ধরনের? ওরা এ-অঞ্চলের লোক নয়। জাতে জাট, ভাষাও ভাল করে বুঝি না। শুনেছি, ওদের পূর্বপুরুষ এই পাহাড়ে চলে আসে পাঞ্জাব বা রাজস্থানের কোথা থেকে। ওরাই সব ঘোড়া, খচ্চর রাখে। মাল বয়ে বয়ে কোথায় সেই

সব দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে যায়, আসে। সারি সারি জানোয়ার চালিয়ে। যাকে 'ক্যারাভান' বলে আর কি। কাল এদের দল যাচ্ছে, তারই একটা খচ্চর ঠিক করে দিলাম। ওরা যাবে চিনি ছাড়িয়ে আরও কিছু ওপরে। আপনার মালও চিনি পর্যন্ত নিয়ে যাবে।

"আর পথে যে তিন-চার রাত কাটাতে হবে—ওদের সেখানে পাব তো?"

"পাবেন বই কি। না হলে চলবে কেন? বিছানাপত্র, রেশন—সবই ত থাকবে ওদের কাছে। আপনার প্রতিদিনের প্রোগ্রাম ওদের বলে দিয়েছি। যে বাংলোগুলোয় রাত কাটাবেন—এক-একটা প্রায় কুড়ি মাইল করে দূরে,—ওরাও সেই মত চলবে। দিনের শেষে ওদের দেখা পাবেন। ওরা চলবে তাড়াতাড়ি, আগেই পৌঁছে যাবে। জিনিসপত্র যা দরকার, বার করে নেবেন, আবার ভোরেই মাল ওদের কাছে ছেড়ে দেবেন।"

"এ তো অতি চমৎকার ব্যবস্থা। কতো দিতে হবে? ফেরবার সময়ও এদের পাব নাকি?"

"এদের আর পাবেন কি করে? আপনিই তো দিনতিনেক অন্তত চিনিতে কাটাবেন বললেন। ওরা তার আগেই ফিরে আসবে। ওখানে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের কারও নামে চিঠি আপনার হাতে দিয়ে দেব—তারা ফেরবার সময় ব্যবস্থা করে দেবে। চিনি পৌঁছে আপনি এদের আঠারো টাকা দেবেন,—এই কাগজে লিখে দিয়ে গেছে, ভাল করে দেখে নিন। পাকা বন্দোবস্ত হয়ে গেল। কাল ভোরে এসে মাল নিয়ে যাবে। আপনি নিজে রওনা হবেন একটু বেলায়—কিছু খাওয়াদাওয়া করে।"

কাগজটা দেখি। কি সব লেখা। ভাষা বুঝি না। সযত্নে পকেটে রাখি।

"ফেণ্ডুরাম!"—বলিজি হাঁক ছাড়েন। একটি ছোকরা এসে সুমুখে দাঁড়ায়। মাথায় চ্যাপ্টা সুগোল টুপি। সাদা পশমের। সামনের দিকে টুপির ঘেরের প্রায় অর্ধেক অংশ আর এক পাটি পশমে বা ভেলভেটে ছাওয়া। সেখানকার রঙ গাঢ় লাল। ইচ্ছা করলে টুপিটা ঘুরিয়ে মাথার পিছন দিকে সেই অংশ রেখে টেনে নামিয়ে দেওয়া চলে, তাতে ঘাড় ও দু কান ঢাকা পড়ে। এরই নাম,—বুসায়ারী টুপি অথবা চিনি বা কিন্নর-ক্যাপ্। স্থানীয় নাম,—থেপাঙ। সামনের সেই রঙীন অংশ—সবুজ, নীল, খয়েরী বা অন্য রঙ-ও হয়। অনেকটা এই ধরনের টুপির প্রচলন—কুলুতেও। সেখানে বলে, কুলু ক্যাপ।

টুপি দেখেই বুঝতে পারি, ছেলেটি কিন্নর। সুস্থ সবল দেহ। ফর্সা রঙ। টানা চোখ, টিকাল নাক। তবে মুখটা ঠিক গোলও নয়, আবার তেমন লম্বাও নয়। গোঁফের সবে রেখা দেখা দিয়েছে। মুখে কোন ভাবেরই প্রকাশ নেই। যেন ডাক শুনে এসে দাঁড়ায় সরল শিশু।

বলিজি জিজ্ঞাসা করেন, ফেণ্ডুরাম! কি ঠিক করলে? এঁর সঙ্গে কাল যাবে তো? ফিরে এলে তখন আবার কাজ পাবে। ভোরে তৈরি হয়ে থাকবে। পথে এঁর কোন কষ্ট না হয়, হুঁশিয়ার থেকো।

আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, এই লোকটি যাবে আপনার সঙ্গে। বুঝতেই পারছেন,—কিন্নর। তাই সুবিধেই হবে। একটু-আধটু হিন্দীও বোঝে। রামপুরে আসে চাকরির খোঁজে। ফরেস্টের ঠিকে কাজ খালি হলেই একে দিই। আপাততঃ ক'দিন বসে আছে। ঘুরে আসুক আপনার সঙ্গে। যা হোক করে ডাল রুটি পাকিয়ে দিতেও পারবে। কি বলো ফেণ্ডুরাম! এখানেও যেমন নিজে চালাচ্ছ, এঁকেও খাওয়াবে তো?

ফেণ্ডু এতক্ষণে একগাল হাসে। চোখ ছোট হয়। অল্প ফাঁক-করা মুখে বড় বড় সাদা

ধব্‌ধবে দাঁত দেখা যায়। দেখে কেমন মায়া লাগে। জিজ্ঞাসা করি, কতো পাবে বলে দিয়েছেন তো?

বলিজি ইংরেজিতে বলেন, একে আবার দেবেন কি? এখানে বসেই আছে, এলেই আবার চাকরি দেব। দুবেলা খাবে আপনার সঙ্গে। ফিরে এসে চান ত খুশি হয়ে বখশিশ দেবেন। ও-ও খুশিমনে নেবে দেখবেন। ছেলেটা ভাল, অতি সরল শান্ত।

আমি বলি, সঙ্গে যাবে, কাজ করবে, টাকা পাবে বইকি। ক'দিনের জন্যে ওর কি পাওয়া উচিত, বলুন, তা ছাড়া বখশিশ ত পাবেই।

বলিজি বলেন, দশ-পনেরো যা ইচ্ছা হয় দেবেন। খাওয়া পাবে, আবার কি?—দাঁড়ান ওকে এখনি বলে দিই, দিন দশেকের মতো আপনাদের দুজনের জন্যে আটা, চাল, ডাল, ঘি, আলু, কিছু মশলাপাতি, চা, চিনি, পাউডার মিল্ক—কিনে এনে গুছিয়ে রাখুক। কাল ভোরে মালের সঙ্গে খচ্চরওয়ালারা নিয়ে যাবে। কাল দুপুরে পথে আর রান্নার হাঙ্গামা রাখবেন না। সকালে বেরোবার আগে চায়ের সঙ্গে কিছু খেয়ে ত নেবেনই, সঙ্গেও পরোটা, সব্‌জি এইখান থেকে দিয়ে দেব,—সেটা ফেগুরাম সঙ্গে নিয়ে যাবে। কাল ত কুড়ি মাইল হাঁটা—ধীরে ধীরে চলবেন, বিকেলেই সারাহান পৌঁছে যাবেন।

ফেগুরামকেও সেইমত নির্দেশ দেন।

রাত্রে জিনিসপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে বেঁধে রাখি। এমন আর বেশি কিছু কি? যে-টুকু না হলেই নয়, তাই শুধু নিয়ে যাওয়া। দুখানা কম্বল,—একটা পাতবার, আর একটা গায়ে দেবার। তা ছাড়া, স্লিপিং ব্যাগ, এয়ার পিলো। দু'তিনটে জামা, কাপড়। একটা রুক্‌স্যাক্-এ টুকিটাকি খুচরা জিনিস। একটা চটের বোরায় ক'দিনের রেশন,—দুজনের। বাকি মালপত্র বলিজির কাছে এখানে রেখে যাব তাঁকে জানাই।

সঙ্গের বোঝাগুলি হাতে তুলে দেখি, এমন কিছুই ভারি নয়,—আধমণও হবে না। গাড়োয়ালী বা নেপালী হলে এ সামান্য বোঝা নিয়ে অনায়াসে পাহাড়ে উঠে যেতো। কিন্তু, এখানকার লোকে মাল বয় না। ভাবি, সত্যিই ত, কিন্নর বোঝা বইছে,—ভাবতেই যে কেমন লাগে!

রাত্রে পরম নিশ্চিন্ত মনে শয্যাগ্রহণ করি। কতো সহজেই না সব কিছুই সুবন্দোবস্ত হয়ে গেল। কাল আবার সেই হিমালয়ের পথে পথে পায়ে হেঁটে চলা। না-দেখা নতুন দেশ,—তার উপর কতো কালের সেই স্বপ্নরাজ্যের কিন্নর-লোক!

॥ ৪ ॥

ভোর না হতেই উঠি। প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করি। রুক্-স্যাক্ গুছিয়ে রাখি। খচ্চরওয়ালার লোক এসে মাল নিয়ে যায়। রুক্-স্যাক্‌ও চলে যায় তারই সঙ্গে। জলযোগ সেরে ফেগুরামের সঙ্গে যাত্রা করতে একটু বেলাই হয়। পৌনে আটটা বাজে। বলিজি খানিক পথ এগিয়ে দেন।

শহর পার হয়ে অল্প গিয়েই বড় রাস্তা ছাড়ি। বাঁ দিকে শতদ্রুও যেন বিদায় নিয়ে সঙ্গ ছাড়ে। মোটরের জন্যে নতুন তৈরি সড়ক এগিয়ে যায় নদীর কূল ধরে। ডাইনে পায়ে-

হাঁটা পথ ধরে আমরাও পাহাড়ে উঠতে শুরু করি। এঁকে বেঁকে ঘুরিয়ে বেশ খানিক উপরে তুলে পথ বনের মধ্যে এসে প্রবেশ করে। পাইন-গাছের বন। নীচে গাছের গুঁড়িতে গুঁড়িতে ছাড়াছাড়ি, মাথার উপর পাতায় পাতায় ডালে ডালে মেশামেশি। উপরে সবুজ পাতার ঝালর ঝোলে। সকালের স্নিগ্ধ আলো। পাতার ফাঁকে ঝরে-পড়া রোদের মধুর পরশ। বনতলে ধীরে ধীরে পথের ঈষৎ উর্ধ্বগতি। হিমালয়ের জনমানবহীন অতিশান্ত পরিবেশ। সব কিছুর মাঝে প্রকৃতির কোলে যেন আত্মসত্তা হারিয়ে ফেলি,—মায়ের বুকে শিশুর মতো।

মনের আনন্দে ধীরে এগিয়ে চলি। পথ-চলার কোন গ্লানি দেহে অনুভব করি না। অথচ, ঘণ্টাখানেক পরে গাছের ফাঁকে দেখা যায়,—বহু নীচে সাট্‌লেজের ক্ষীণ রেখা, যেন, 'খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার'।

রামপুর থেকে ন' মাইল এসে গৌরা বা গওরা গ্রাম। ৬,৫১৮ ফুট। ছোট জায়গা। খানকয়েক চালা ঘর। কিছু দুরে ডাকবাংলো। যেন নিজের আভিজাত্য বাঁচিয়ে একান্তে দাঁড়িয়ে। বাংলো থেকে মনোরম দৃশ্য। পাহাড়ের পর পাহাড়। বহু নীচে নদী। দূরে তুষার-শিখর।

ফেণ্ডুকে বলি, বেলা এগারোটা বাজে। এই বারান্দায় বসেই দুপুরের খাওয়ার পাট চুকিয়ে নেওয়া যাক। রান্নার ত হাঙ্গামা নেই। ঝোলা খোল। সারাহানে গিয়ে আবার রাত্রের আশ্রয় নেওয়া। কতো মাইল রইল আর?

বলে, মাইল দশ-এগারো হবে।

ফেণ্ডুর মাথায় সেই রাঙা কিন্নর টুপি। কোথা থেকে দু'টো হলদে ফুল তাতে গুঁজেছে। গায়ে আচকানের মত লম্বা গরম কোট। জিজ্ঞাসা করি, এটাকে কি বল?

বলে, ছুব্বা।

পরনে গরম চুড়িদার পাজামা! খয়েরী রঙ। নাম শুনি, চমু সুতান।

পিঠ ও বুকের উপর আড়াআড়ি ভাবে বাঁধা লম্বা একটা কাপড়,—পৈতার মত ঘুরিয়ে বুকের দিকে শক্ত করে গিঁট দেওয়া। পিঠের দিকে এরই মধ্যে জড়িয়ে খাবারের প্যাকেট ও তার সামান্য দু'একটা কাপড়চোপড় রাখা। খুলতে দেখি, কাপড়টা প্রায় পাঁচ-ছ' গজ লম্বা। এরও নাম বলে মুচকে হেসে, গাছাং।—পরে দেখেছি, এটাও কিন্নরদের পোশাকের একটা অঙ্গ, পাক দিয়ে কোমরে জড়িয়ে রাখে, প্রয়োজনমত পিঠে এইভাবে জিনিসপত্রও বাঁধে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম নিই। বেলা দেড়টায় আবার পথ চলা।

ফেণ্ডুরও কোন বোঝার ভার নেই। ক্যামেরা ও ফ্লাস্‌ক্ নিজেই চেয়ে নিয়েছে। খাবারের প্যাকেটও শেষ হয়েছে। মালপত্র খচ্চরের উপর চলে গেছে। বিকেলে পৌঁছে পাওয়া যাবে। দুজনেই নিশ্চিন্ত।

চওড়া রাস্তা। হিন্দুস্থান-তিব্বত রোড। পথ ভোলার কোনই আশঙ্কা নেই। যদিও এখন গ্রামের কাছাকাছি ছাড়া, পথের লোকজনের বিশেষ সাক্ষাৎ-ই মেলে না। পথেরও দুর্গমতা নেই। পাহাড়ের উপরিভাগ দিয়ে এগিয়ে চলে। প্রায়ই সমতল পথ, কোথাও সামান্য চড়াই উৎরাই।

বেশ চলি একা একা আপন মনে। হঠাৎ বাঁশীর সুর কানে আসে। উদাস করুণ সুর।

চারিদিকে তাকাই। কাউকে দেখি না। অবশ্য সামনে ও পিছনে পাহাড়ের বাঁক। বেশি দূর দৃষ্টি চলে না। নিস্তব্ধ দুপুর। ধ্যানমৌন হিমালয়। তারই মাঝে বাঁশীর সুরের কম্পন,—যেন সুপ্তদেহে হৃদ্‌স্পন্দন। সজাগ হয়ে ওঠে আমার অন্তর। সত্যিই কি এলাম কিন্নরলোকে? দেখা দেবে নাকি এবার কিন্নর-কিন্নরী?

গতিবেগ স্তিমিত হয়। কান পেতে শুনি। পিছন থেকে ভেসে আসে, বুঝতে পারি। ফিরে তাকাই। পথের বাঁকে দেখা দেয়—ফেণ্ডুরাম। মুখে বাঁশী।

এগিয়ে আসে। আমাকে দেখে বাজানো থামায়। লজ্জায় হাসে।

বলি, ফেণ্ডু তুমি? চলো এগিয়ে—আপন মনে বাজিয়ে। আমি যাব ধীরে ধীরে।

সে এগিয়েই চলে—সুরতরঙ্গ তুলে।

আমিও চলি—কিছু দূরে দূরে, অন্তরালে,—সেই সুর-সায়রে ভেসে, অজানা কীসের যেন সম্মোহনে।

হিমালয়ের পথে এ-ও এক অপূর্ব অনুভূতি।

পা চলে যেন আপনা থেকে। দেহ যেন ভারশূন্য। মন যেন মিশিয়ে থাকে আকাশে বাতাসে।

বাঁশী কখন থামে জানি না। মূর্ছনা জেগে থাকে মন ছেয়ে। যেমন থাকে সুবাস, ধূপ নিবে গেলেও।

বাঁকের মুখে ফেণ্ডুরাম একটা পাথরে বসে। আঙুল দিয়ে দেখায়—সামনে নীচের দিকে। পথের সুমুখে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পাহাড়ী ছোট নদী নেমে আসে। ফেণ্ডু বলে, নামতে হবে ঐখানে। তারপর, ওদিকের ঐ পাহাড়ের গায়ে—ঐ দেখছেন—ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে পথ,—ঐ চড়াই ভেঙে ওঠা। তবে, ঐটুকু উঠলেই হয়ে গেল, ওর পরে সমান রাস্তা,—সারাহান পর্যন্ত—এক ক্রোশও নয়।

তাকিয়ে দেখি। নীচে নদীর উপত্যকায় বড় বড় গাছের বন। তারই ফাঁক দিয়ে দেখা যায় মাঝে মাঝে জলের ধারা। কোথাও স্বচ্ছ সবুজ কোথাও বা ফেনিল উচ্ছ্বাস। ছায়াঘন স্নিগ্ধকোমল পরিবেশ। কিন্তু ওপারের পাহাড় যেন কালিমাখা পাথরের দেওয়াল। নির্মম রুক্ষ কঠোর। গাছপালা সভয়ে দূরে সরে থাকে। সেই পাথরের বুকে আঁচড় কেটে যাবার পথ ওঠে। যেন ধ্যান-মগ্ন ভস্মাবৃত-দেহ মহাদেবের নগ্ন বুকে নির্ভীক সাপের আবেষ্টন। বিকালের রোদে উজ্জ্বল দেখায়। যোগিরাজের অঙ্গ থেকে যেন জ্যোতির বিকিরণ।

ফেণ্ডুকে বলি, চলো, ঐটুকু তো ওঠা! মেরে দেওয়া যাবে।

কিন্তু, নীচে নেমে আবার চড়াই উঠতে বুঝতে পারি,— দেহে কতো ক্লান্তি জমেছে। সারাদিন হাঁটা। অনভ্যস্ত চরণ। প্রথম দিনেই শুরু করে হঠাৎ আঠারো মাইল হাঁটা,—এখনও আরও মাইল দুই যাওয়া। তার উপর রোদের তেজ। সারাদিনের উত্তাপে পাথর থেকেও আগুনের হলকা ঠিকরে আসে।

সামান্য উঠেই নিরতিশয় ক্লান্তি বোধ হয়। তবু ধীরে ধীরে চলি। ক্ষণিক দাঁড়াই। আবার চলি, আবার দাঁড়াই। পথ-চলার দিনশেষের চড়াই,—বেশি কিছু না হলেও মনে হয় শতগুণ দুর্গম। সবার উপরে রোদের তাপ। ঘর্মাক্ত কলেবর। জামার তলায় দেহ বুঝি বা গলে জল হয়,—বরফ গলে যেন ঝরণা বয়।

তবু, কোথা থেকে মনে বল আসে। পথ চলার এই ক্ষণিক বাধা কাটিয়ে ওঠার অবিচলিত সঙ্কল্প যেন হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলে। ভাবি, গিরিরাজের মন্দিরে প্রবেশ করার এ তো অতি-সামান্যই পরীক্ষা!

চড়াই শেষ হয়। পাহাড়ের কোলে আবার সমতলভূমি। সবুজ গাছপালা। দেখা যায়, পাহাড়ের বাঁক ঘুরে ঘুরে বহু দূরে পথ চলে যায়। অদূরে পাহাড়ের গায়ে ঘর-বাড়ী। উৎসাহ দিয়ে ফেগু বলে, ঐ সারাহান! প্রথমেই লালবাড়ীটা ডাকবাংলো। এখন সোজা পথ। দেখাচ্ছে এইখানে—তবু মাইলখানেক আরও আছে—পাহাড়ের ঐ বাঁকটা মাঝে রয়েছে কিনা।

তাকিয়ে দেখি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। ভাবি, বাড়ীর লাল রঙ ত নয়, যেন অন্ধকার বনে পথ হারানোর পর হঠাৎ-দেখা আপন ঘরের প্রদীপ-শিখা!

তখনও বেলা আছে অনেক। রোদও পড়ে নি। পথের পাশে ঘন সবুজ ঘাসে ছাওয়া সমতলভূমি। প্রকাণ্ড এক গাছের ছায়া। হাত কয়েক দূরে পাহাড়ের খাদ। বহু নীচে আবার দেখা দেয় শতদ্রুর উপত্যকা। সর্পিল ক্ষীণ জলরেখা। ছায়াতলে কোমল কচি ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসি। মনে হয়, কোন এক অদৃশ্য মমতাময়ী ক্লান্ত পথিক দেখে শয্যা পেতে দেন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকি, নীচে ধরণীর পথে নেমে চলে নিম্নগতি নদী। আবার, চারিপাশে ধরণীর কোল ছেড়ে মাথা তুলে আকাশ ছুঁতে চায় পাহাড়ের শ্রেণী। দূরে দিগন্তে নীল আকাশের বুকে আঁকা সাদা আলপনা—যেন ডানা মেলা বকের সারি,—হিম-গিরির তুষারশিখর।

অদূরে একটা পাথরের উপর ফেগুরাম। হিমালয়ের শোভা কিন্নরেরও কি মন হরণ করে?

বাঁশী ধরে আবার সুরের লহরী তোলে।

চোখের পাতা আমার বুজে আসে। অপূর্ব এক অনুভূতিতে মন ভরে থাকে। কিন্নর-কণ্ঠে যেন স্বাগত বাণী শুনি।

ফেগুর ডাকে চমক ভাঙে। বলে, চলুন, এবার যাওয়া যাক।

বলি, এখনও বেলা রয়েছে। রোদ একেবারে যাক, তবে উঠব। এইটুকু তো পথ। পৌঁছে গেছি বললেই চলে। তুমি বরং এগিয়ে যাও। চৌকিদারকে ডেকে ঘর খোলাও। খচ্চরওয়ালারা নিশ্চয় অনেক আগেই পৌঁছেছে। রান্নার জিনিসপত্র বার করে,—রুটি ও একটা সব্জির ব্যবস্থা করো। গরম জলও তৈরি রেখ,—গিয়েই চা খাওয়া যাবে,—আর চৌকিদার যদি একটু দুধ যোগাড় করতে পারে, কথাই নেই।

ফেগু রওনা দেয়। আবার বাঁশীর সুর ছড়িয়ে চলে। সেই ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাওয়া সুরের ধ্বনির মধ্যে যেন তার চলে যাওয়ার পদধ্বনি বাজে।

সূর্য ক্রমে পাহাড়ের অন্তরালে অদৃশ্য হন। আমিও আনন্দ-শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ি। মন্থরগতিতে বাংলোর দিকে এগিয়ে চলি। ক্লান্ত অবসন্ন দেহ ক্ষণিক বিশ্রামলাভের পর আরও আরামলোভাতুর হয়। ভাবি, এই তো এখনি পৌঁছে যাব। তার পর জামাকাপড় ছেড়ে,—চা খেয়ে একটু বসা, রাতের খাওয়াদাওয়াও তাড়াতাড়ি সেরে আরামে শয্যাগ্রহণ। প্রথম দিনে আজ একটু বেশি-ই চলা হোল। তা হোক,—পথও তেমনি কম্‌ল খানিকটা।—মনে উৎসাহের দীপ জ্বেলে দিনশেষের বিশ্রামের আকর্ষণে ধীরে ধীরে চলি।

তখন কি আর জানি, কুহকিনী আশা এমনি ছলনাময়ী!

বাংলোয় পৌঁছে দেখি, চিন্তিত মুখে ফেগুরাম ঘোরে। চৌকিদার হাজির। ঘরদোর খোলা। কিন্তু, কোথায় খচ্চরওয়ালারা? কিছু দূরে গ্রাম। সেখানে গিয়েছিল। কোন খচ্চরই সেখানে নেই। ওদিকে এগিয়ে ঝরণার ধারে খানিকটা মাঠ, চৌকিদার খবর দেয়, সেইখানে কয়টা খচ্চর বিকেলে চরছে দেখেছে। সেখানেও গিয়েছিল, কিন্তু ওরা রামপুর থেকে আসে নি, অন্য দল। এখন কি করা যায়? কাপড়চোপড়, বিছানাপত্র, খাবার জিনিস—সবই তাদের কাছে।

এতক্ষণে দেহ যেন চাঙ্গা হয়। মনও যেন জেগে ওঠে। স্বপ্ন-রাজ্য থেকে সুখ-দুঃখের, অভাব-অভিযোগের সমস্যা-লোকে নামি।

ফেগুকে বলি, ডাকো চৌকিদারকে। রাতের জন্যে যা হোক ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। দেখা যাক—ও কি দিতে পারে। তবে, সে লোকগুলো গেল কোথায়? পালাবার কথাই ওঠে না। নিশ্চয়, পথে কোথাও কিছু ঘটেছে।

ফেগু বলে, পথেও তো কোথাও তাদের দেখি নি। আমাদের অনেক আগেই রামপুর থেকে তাদের রওনা হবার কথা,—যদি তারা আজ না-ই বার হয়ে থাকে?

বলি, ফেগুরাম, এখন আর মিছে ভেবে লাভ নেই। সন্ধ্যে হয়ে এল। কাল সকালে নিশ্চয় খোঁজ পাওয়া যাবে। এখন রাত-কাটানোর কি ব্যবস্থা হতে পারে দেখা যাক। ঘরটা তো পাওয়া গেছে, এটাও ত না মিলতে পারত?—বলে হাসি।

ফেগুর মুখে কিন্তু হাসি ফোটে না।

গাল-ভরা হাসি আবার দেখা দেয় সন্ধ্যার পর। জানোয়ারের গলার ঘণ্টার টুংটাঙ শব্দ শোনা যায়। কী মধুরই না লাগে! আনন্দে ও উৎসাহে আলো হাতে ফেগু ছোটে। আমিও নিশ্চিন্ত হই, যাক এসে গেল। কিন্তু, কোথায় কি? বিরস বদনে নিরাশ হয়ে ভগ্নদূত ফেরে। এ-ও ভিন্ন গ্রামের খচ্চরদল!

রাত্রের ব্যবস্থা যা হোক করে হয়ে যায়। চৌকিদার চাপাটি ও আলুর সব্‌জি দেয়। চা-ও পাই। ভাবি, আবার কি? এর বেশি পেতামই বা কী?

অস্বস্তি বোধ হয়, জামা-কাপড়ের অভাবে। বদলাবার কোনই উপায় নেই। সেই যা পরে যেমন ভাবে সারাদিন সারা পথ হেঁটে আসা, তাই পরে রাতেও শোয়া। ভিতরে ঘামে-ভেজা গেঞ্জি, শার্ট বিশ্রাম-লাভের পর অবশ্য শুকিয়েছে। কিন্তু, চিরন্তন অভ্যাস, হেঁটে আসার পরই সব ছেড়ে ফেলে দেহকে মুক্তি দেওয়া, মনে তৃপ্তি পাওয়া। ভাবি, সে-কথাও অযথা ভেবে আজ লাভ কি?

বিছানার সমস্যা। খাটের উপর শুধু ছেঁড়া গদি পাতা। চাদর বা বালিশের বালাই নেই। তা না থাক, ক্ষতিও নেই। কিন্তু, গায়ে দেবার কিছু একটা? চৌকিদার বলে, ছিল ত এককালে সবই। গায়ে দেবার কম্বলও। এখন কিছুই নেই। আজকাল এ-সব বাংলো খুব কমই ব্যবহার হয়। রাজার রাজত্ব গেছে। স্বাধীন ভারতে নীচে মোটরের সড়ক হচ্ছে—সাতলুজের ধার দিয়ে। আর ক'দিন পরেই বাস্‌ চলবে সেই পথে। ওপরের এই পুরানো রাস্তা বা এ-সব বাংলোর দিকে কারও আর নজরও নেই।

ভাবি, নেই ত নেই। ও-সব ভেবে আমারও লাভ নেই। রাত ত আপনা থেকেই কাটবে। কারও সুখ-সুবিধা দেখে ত অপেক্ষা করবে না,—সেই ত পরম লাভ।

শুয়ে পড়ি, শুধু পায়ের জুতাজোড়া খুলে। যেমনভাবে যা কিছু পরা ছিল, তাই গায়ে, প্যান্ট পরে।

রাত্রে কি প্রচণ্ড শীত! সারাহানের উচ্চতা—৬,৭১৩ ফুট। অর্থাৎ, দার্জিলিং-এর মত। তার উপর, সারাদিন পথ চলার পর শ্রান্ত দেহে শীতবোধ হয় বেশি-ই। হি-হি করে কাঁপি। মাথায় বুদ্ধিও আসে। অপর খাটের গদিটা টেনে এনে দেহের উপর চাপাই। স্বস্তি পাই। ভারের চাপেও শীত কাটে। হায় রে গদি! তোরও ভাগ্যের দুর্গতি!

ক্লান্ত দেহে ঘুমও আসে। রাতও কাটে।

॥ ৫ ॥

ভোরে উঠে মুখ ধোওয়ার টুথব্রাশ পাই না, মাজনও নেই। সবই অশ্বতর পৃষ্ঠে। না থাক, উনানের ছাই আছে। পথ চলতে দাঁতনেরও সন্ধান করা যাবে।

এ বেশ এক অভিনব অভিজ্ঞতা। সব ব্যবস্থা অমনভাবে ঠিকঠাক। বিচক্ষণ বলিজির হিসাব করে করা।

এক নিমেষে সবই বানচাল। আছে সবই, অথচ হাতের বাইরে। একেই বলে বুঝি, আমরা ভাবি, নিজেরাই করি অলক্ষ্যে বসে কে হাসেন!

ভোরে যাত্রার জন্য সাজপোশাকেরও হাঙ্গামা নেই। সজ্জা পরেই রাতে শোওয়া, ভোরে ওঠা,—যাত্রাও। কত পরিশ্রম কমে!

ফেণ্ডু বলে, আর একবার ওদিকে ঘুরে দেখে এলাম। কোথাও নেই। কেউ বলতেও পারে না।

বলি, চল, আমরাও এগোই। পথে দেখা হয়, ভালই। না হয়, এইভাবেই যাওয়া যাবে।

তবু, মনে আশা করি, দেখা আজ পাবই।

দেরি হলে পাছে আরও ছাড়াছাড়ি হয়, তাই সারাহান শহর এখন আর দেখা হয় না। ক'দিন পরে চিনি থেকে ফেরবার পথে এখানে আবার রাত কাটাই। তখন ঘুরে দেখার অবসরও পাই।

রাস্তা থেকে গ্রাম কিছু উপরে। রাজাদের এককালীন রাজধানী। পরে রামপুরে নতুন রাজধানীর পত্তন। সিমলা এখান থেকে একশ' মাইলেরও বেশি দূরে।

পাহাড়ের ঢালু গায়ে প্রায় সাত হাজার ফুট উঁচুতে, জায়গাটি ভালই। সমতল ভূমিও আছে। চাষবাসেরও সুবিধা। আবহাওয়াও মনোরম, মনে হয়।

প্রবাদ, দ্বাপরযুগে এই ছিল শোণিতপুর। শিবভক্ত বাণাসুরের রাজধানী। অতএব, বাণ-কন্যা উষা এবং শ্রীকৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধের প্রেম-কাহিনীর এখানেও লোকমুখে প্রচার।

মনে পড়ে, কেদারনাথ পথেও উষামঠ বা উখীমঠ। সেখানেও ঐ একই প্রবাদ। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস শোণিতপুরের অস্তিত্ব ছিল ঐখানেই। উষা অনিরুদ্ধের প্রণয়-কাহিনী ঘটে ঐ অঞ্চলেই।

ঐতিহাসিক ভিত্তি কোথাও নেই। ভারতের অতি-প্রাচীন প্রসিদ্ধ এক প্রেমকথা। কারও নিজস্ব অঞ্চলের ঘটনা ভাবতে লোকেদের ভালও লাগে, গর্ববোধও হয়।

সেই রোমাঞ্চকর সুমধুর কাহিনী কতখানি কবি-কল্পনা-প্রসূত তারও প্রমাণ নেই। তবে, এর পিছনে আর্য-অনার্যের জাতি-সংঘাতের ইঙ্গিত আছে বলে জ্ঞানীরা মনে করেন। 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' নির্ণয় করতে রবীন্দ্রনাথ এক প্রবন্ধে লেখেন, ''পর্দা উঠিবামাত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথমাঙ্কেই আমরা আর্য-অনার্যের প্রচণ্ড জাতি সংঘাত দেখিতে পাই।''...''আর্যে-অনার্যে যখন অল্প অল্প করিয়া যোগস্থাপন হইতেছে তখন অনার্যদের ধর্মের সঙ্গেও বোঝাপড়া করার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। এই সময়ে অনার্যদের দেবতা শিবের সঙ্গে আর্য-উপাসকদের একটা বিরোধ চলিতেছিল, এবং সেই বিরোধে কখনো আর্যেরা কখনো অনার্যেরা জয়ী হইতেছিল। কৃষ্ণের অনুবর্তী অর্জুন কিরাতদের দেবতা শিবের কাছে একদিন হার মানিয়াছিলেন। শিব-ভক্ত বাণ-অসুরের কন্যা ঊষাকে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ হরণ করিয়াছিলেন—এই সংগ্রামে কৃষ্ণ জয়ী হইয়াছিলেন।''... ''মহাভারত আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় বিরোধের মধ্য দিয়াও আর্যদের সহিত অনার্যের রক্তের মিলন ও ধর্মের মিলন ঘটিতেছিল।''—এইরূপে ''বর্ণসংকর ও ধর্মসংকর উৎপন্ন হইতে লাগিল।''

কি জানি, হিমালয়ের এই অঞ্চলে এবং কিন্নর-জাতির ইতিহাসে এই আর্য-অনার্যের মহামিলনের কোন প্রমাণ আছে কিনা।

তবে, বাণ রাজার দেশে—সারাহানে—এখন অধিষ্ঠাত্রী দেবী—ভীমাকালী। সারা বুসায়ার-অঞ্চলে এই মন্দির সুপ্রসিদ্ধ। দেবীর নানান প্রাচীন কিংবদন্তী থাকলেও এখনকার মন্দির প্রাচীন নয়। তোরণের উপর লেখা,—সংবৎ ১৮৭১।

কাঠের কারুকার্য আছে। পুরানো রাজপ্রাসাদেও দারুশিল্পের কিছু নিদর্শন।

সারাহান ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি। সকাল সাড়ে পাঁচটা। সাধারণ পাহাড়ী পথ। চলার কষ্ট নেই। মাইল তিন এগিয়ে এক পাহাড়ী নদী। নাম শুনি, মানিয়োটরি। অপর পারের গিরিশ্রেণীর নামও মানিয়োটরি হবে। ফেগু বলে, এইখান থেকেই আসল কিন্নরদেশ শুরু।

ঠিক যেমন পশ্চিম থেকে আসতে বাঙলাদেশে ঢুকলে প্রথমে ততো বোঝা যায় না, তার পরেই চোখে পড়ে,—বেহারের লাল মাটি, কাঁকর, শুকনা খটখটে ভাব আর নেই—স্নিগ্ধশ্যামল মাঠঘাট, ছায়াশীতল ঘন গাছপালা—কেমন যেন স্নেহার্দ্র ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকেন বঙ্গজননী;—এখানেও তেমনি কিন্নরদেশে প্রথমে প্রবেশ করে মনে হয়, হিমালয়ের সেই ত একই রূপ,—সেই পাহাড়, সেই নদী;—তার পরেই—নামের মোহে কিনা জানি না,—ভাবি পাহাড়গুলির যেন রূপের পরিবর্তন ঘটে। উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী চারিপাশে মাথা তুলে উঁকি দিতে থাকেন। বহু নীচে শতদ্রুর উপত্যকা। রাস্তা থেকে নদীর জলধারা নজরে আসে না। দুদিকের পাহাড়ের ঢালু গা নীচের দিকে আঙুল দেখিয়ে শুধু যেন ইঙ্গিত করে, কোন্ গোপন পথে সেই নদীর গতি। মাঝে মাঝে সুমুখে যাত্রাপথ বিদীর্ণ করে তরঙ্গোচ্ছল নির্ঝরের ধারা। পাশের পাহাড় ভেদ করে তুষাররাজ্য থেকে নেমে আসে শিলাময় সোপান বেয়ে। আলুলায়িত-কুন্তলা উন্মাদিনীর মত। প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে চলে শতদ্রুর জলে আত্মবিসর্জন দিতে। পাহাড়ের সেই সব বাঁকে পথও নেমে আসে ঝরণাগুলির ধারে,—স্রোতধারা পার হতে। সেই সকল শাখানদীগুলির সঙ্কীর্ণ প্রবাহ-পথের উপর দিকে তাকালেই দেখা যায়,—গগন-স্পর্শী তুষারশিখর। সুনীল আকাশ, শুভ্র তুষার, পিঙ্গল শিলাস্তূপ, গতিশীলা নদীর ফেনিল চিক্কণ রেখা, দুই তীরে ঘন বনানীর

শ্যামলিমা,—সব কিছু মিলে যেন অপ্সরা তিলোত্তমার রূপ সৃষ্টি করে। পথের যে-দিকে যখনি দেখি ছোট নদী,—তখনি তার উপত্যকার শিরোভাগে কোন এক বরফচূড়ার নিশ্চিত উপস্থিতি। যেন, নীল-গগনের গবাক্ষপথে স্থির নয়নে তাকিয়ে দেখেন শুভ্রকেশ পিতামহ- আপন আপন সন্ততির মর্ত্যলোকের অঙ্গনে চপল শৈশবলীলা।

পিছনে তাকালেও এখন সেদিকেও বরফের পাহাড়। বোঝা যায়, তুষার-প্রাকারে ঘেরা সুরম্য এই পার্বত্য প্রদেশ।

মাঝে মাঝে গহন বনপথ। আদিম অরণ্যানী। কখন বা ছোট গ্রাম। কাঠের ঘরবাড়ী। চেরা কাঠে ছাওয়া ছাদ। গ্রামের মাঝে কাঠের মন্দির। যেন টোপর-পরা চূড়া।

গ্রামবাসীদেরও সাধারণ পাহাড়ী চেহারা নয়। বেশভূষারও পরিবর্তন। ফর্সা রঙ। টানা চোখ, উঁচু নাক। ফেগুরামের মত পরনে পা-জামা, কুর্তা, মাথায় টুপি, কোমরে সেই লম্বা কাপড় পাট করে জড়ানো। মেয়েদেরও মাথায় টুপি, লম্বা পশমী শাড়ী—ঘুরিয়ে পরা। গায়ে চোলি,—পুরাহাতা ব্লাউস-এর মত। পিঠ ঢেকে কাঁধের উপর দিয়ে গায়ে জড়ানো,—ছোট শাল মত, বুকের কাছে তার দু মুখ ব্রোচ্-এর মত পিন-এ আটকানো। শালের নাম শুনি ছন্‌লি। ব্রোচ্‌টা প্রায়ই রূপার,—বলে ডিগ্‌রা। নাকে, কানে, হাতে, বুকে—নানা রকম অলঙ্কার। রূপার ও পাথর-বসানো। মেয়ে পুরুষের বেশভূষা ও চেহারা দেখে মনে হয়, গাড়োয়ালের মত এ-অঞ্চলের অধিবাসীরা তেমন দরিদ্র নয়। ছোট ছেলেমেয়েও এখানে ততো চোখে পড়ে না। কেদার-বদরীর পথের মতো পিছু নিয়ে হাত পেতে ভিক্ষাও চায় না। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে।

আমিও দেখি। নতুন দেশ। নতুন মানুষ। হিমগিরির বিচিত্র শোভা। আনন্দের আবেশে পথ চলি।

ফেগু বলে, খুব জলদি চলে এসেছি। ঐ ত চৌরা বাংলো—বাঁদিকে গাছের ফাঁকে। দুপুরে ঐখানেই বসবেন তো?

আশ্চর্য মানুষের মন। কারণে অকারণে ভাবে। আবার কেমন সহজেই ভোলে। প্রকৃতি যেন খেলনা দিয়ে শিশু-মন ভুলিয়ে রাখেন এতক্ষণ!

ঘরের কথা শুনেই চকিতে মনে পড়ে, তাই ত! সকাল থেকে সেই খচ্চর-বাহিনীর এখনও ত সাক্ষাৎ মেলে নি। কাপড়-চোপড় খাবার এখনও পাওয়া যাবে না। উপায়ই বা কি?

সকাল ন'টা বাজে। চৌরা সারাহান থেকে ন' মাইল। ৬,৫০০ ফুট উঁচুতে। পুরানো ফরেস্ট বাংলো। কাঠের তৈরী। চারিপাশে বড় বড় গাছের জঙ্গল। শুনি, বন্য জন্তু-জানোয়ার মাঝে মাঝে বাংলোর এলাকাতেও ঘুরতে দেখা যায়। বাংলোর ঘরে কাঠের তৈরী কয়েকটি পুরানো কালের আসবাব। বিলাতী প্যাটার্নে তৈরী। ছবিতে দেখা সাবেক আমলের ইংলিশ কটেজের সেই চেয়ার টেবিল র‍্যাক—বাঁকাচোরা অদ্ভুত আকারের গাছের ডাল সাজিয়ে তৈরি। একটা র‍্যাক-এ খানকয়েক ইংরেজি বই,—গল্প, উপন্যাস, বিলাতী পত্রিকা। ধূলি-মলিন, ছিন্ন মলাট, বিবর্ণ দেহ। এককালে এই সুদূর নির্জন বনে বিদেশী ফরেস্ট-অফিসারদের নিঃসঙ্গ অবসর বিনোদনের এরাই ছিল নির্বাক সঙ্গী। আজ যেন অতীতের শ্মশানচারী ভস্ম-মাখা সন্ন্যাসী। এ-ঘর ও-ঘর দেখি। বিগত কালের কথা ভাবি।

চৌকিদারকে জানাই, আমাদের দুর্গতির কথা।

সে বলে, ছোট্ট বসতি এখানে। দেখছেনই ত কী জঙ্গল। তবু দেখি, চাল, আলু, হয়ত যোগাড় হয়ে যাবে।

কিন্তু, খচ্চরের দল? এদিক দিয়ে কেউই যায় নি—এ দুদিনের মধ্যে।

বলি, থাক—সে-সবের আশা ছেড়েছি। একটা তোয়ালে দিতে পার, বাপু? মুখ হাত পাটা তাহলে ধুই। সে এনে দেয়। ছেঁড়া। তা হোক। বলে, কম্বলও আছে এখানে। রাত এখানেই কাটিয়ে যান।

শুনে বলি, তাতে রাত কাটানোর সুবিধে হতে পারে, কিন্তু লাভ কি হবে? কাল ত যেতেই হবে—তার চেয়ে আজই প্রোগ্রাম মত এগুনো ভাল।

বাংলোর মধ্যে বসি না। কেমন যেন অতীতের স্মৃতির ভারে মন ভারী হয়ে ওঠে।

বাইরে গাছের ছায়া। আবার, শীতবোধ হলে রোদও পাব। ঝরণায় হাতমুখ ধুই। প্রকাণ্ড এক শিলাখণ্ডের উপর চৌকিদারের দেওয়া কম্বল জড়িয়ে শুয়ে থাকি। গেঞ্জি, জামা প্যাণ্ট—সব রোদে দিই। জামা-কাপড়ের বন্ধন-মুক্তির তৃপ্তি পাই। মনে মনে হাসি,—হিমালয়ের পথে কম্বল জুটল, লোটা কই?

ফেগুরাম রান্না করে আনে। আহার শেষে রোদ-মাখা পাথরে আবার লম্বা হয়ে শুই। চোখ বুজে আরামে বিশ্রাম নিই। হঠাৎ মনে পড়ে, শিশুকালে মায়ের কোলে মাথা রেখে চোখ বুজে নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে থাকা। ভাবি, মনের কোণে সে-আনন্দ গোপনে কোথায় লুকিয়ে ছিল—এতো কাল!

অতীত-স্মৃতির কী বিচিত্র গতি!

বেলা একটা। সুখ-শয্যা ছেড়ে আবার পথ চলা। চরণযুগলের ক্ষণিক অলস শিথিলতা। যেন, কাঁচা ঘুম ভাঙার অবসাদ। কয়েক পা হাঁটতেই আবার গতির ছন্দ জাগে। দেহমন দুলে ওঠে।

পাহাড়ের মামুলী চড়াই উৎরাই। কখন পথের রৌদ্রের তীব্র পরশ। কখন বা বনতলের স্নিগ্ধ ছায়া। যন্ত্রের মত পা চলে নির্বিকারে। আপন ছন্দে। মনও ভরে থাকে আপন ভাবে। একা চলার অপার আনন্দ। অন্তরে যেন অতল অনন্ত নীল সাগর। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতো তরঙ্গ তাতে ওঠে, নামে। কানে যেন অজানা কোন্ সাগর পারের 'কি সঙ্গীত ভেসে আসে'।

ফেগুরামের বাঁশী বাজে। পথের বাঁক ঘুরতেই তাকে দেখি। থম্‌কে দাঁড়ায়! বাঁশী তুলে হাত বাড়িয়ে দেখায়,—ঐ দেখুন নীচে জলের ধারে খচ্চরদল চড়ে বেড়ায়।

দেখি, তাই ত বটে। পথ আবার নেমে যায় বেশ খানিক নীচে। সামনে আবার পাহাড় ভেদ করে বড় ঝরণা আসে। চারপাশে কালো পাথর। বড় বড় গাছ। জলের ধারে মাঠ। সেইখানে অনেকগুলি খচ্চর ঘোরে। দু'চারজন লোকও আছে। দূরে বলে দেখায় ছোট, কিন্তু মনে আশার মায়া-লোকে তারাই যেন প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে।

উৎসাহে ফেগু সবেগে চলে। আমি চলি ধীরে—আবার আশাভঙ্গের অনিশ্চয়তায় দোলায়িত চিত্তে।

নিকটে পৌঁছুই। ফেগুর মুখ দেখেই বুঝতে পারি,—ফল মেলে নি।

ফেগু জানায়, এরা রামপুর থেকেই আসছে বটে, কিন্তু আমাদের মালের কথা কিছুই জানে না। মুশকিল হয়েছে, এদের ভাষা বুঝি না, ঠিকভাবে বোঝাতেও পারি না আমাদের দুরবস্থা।

বলি, যে-লোকটার সঙ্গে তোমার সাহেব ব্যবস্থা করেছিলেন, তাকে দেখ্‌ছ এখানে?

ফেগু বলে, সে-লোকটা ত এদের সর্দার! রামপুরেই আছে। কার সঙ্গে সে মাল পাঠিয়েছে তা ত জানি না।

বুঝলাম, অকূল সমুদ্রে পড়েছি। এ দুস্তর পারাবার পার হবার আশা-ভরসা আর নেই।

বলি, ফেগুরাম! ও-সব ভেবে আর কাজ নেই। চলো, যেমন চলেছি। রাতের আস্তানা আর কতো দূর?

বলে, আর ত পৌঁছে গেছি। চৌরা থেকে আট মাইল এলাম। এটা শোলডিংখণ্ড। জল পার হয়ে ঐ যে ওদিকের পাহাড়ের গায়ে পথ উঠেছে,—আরও মাইলখানেক মাত্র,—পৌণ্ডা বাংলো। হঠাৎ মনে পড়ে, গতকালের কথা। সারাহান পৌঁছবার আগে সেই চড়াই। দুঃস্বপ্নের মত।

হেসে জিজ্ঞাসা করি, কালকের মতো?

সে-ও হাসে। বলে, নাঃ,—সামান্য পথ। চড়াই-ও ধীরে ধীরে।

মনে আশ্বস্ত হই। তবু ভাবি, কালকের চড়াই-ও এমন কিছু ছিল না। প্রথম দিন, অনভ্যাস, দিনের শেষ, তার উপর কড়া রোদ,—সব কিছু মিলে সামান্যকেই অসামান্য করে তোলে। হিমালয়-পথে একই দুর্গমতা কার কাছে কেমন লাগে, অনেকখানি নির্ভর করে আপন সামর্থ্য ও অভিজ্ঞতার উপর যেমন, তেমনি আবার যাত্রীর সেই সময়ের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার এবং দিনের কোন্ সময়ে—কতোখানি পথ চলার পর চড়াই ওঠা,—তারও উপর।

দেহে আজ ক্লান্তি নেই। রোদেরও তেজ নেই। তবু, অভ্যাসমত ধীর পদে উঠি।

পথের দু'পাশে ঝোপঝাড়। এক জায়গায় তারই মধ্যে মানুষের গলা শোনা যায়। যেন, পাখির কিচিরমিচির। বুলি আছে, ভাষা নেই। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়াও ওঠে, দেখা যায়। ফেগুরাম এগিয়ে ঝোপের মধ্যে উঁকি মারে। আমি পথ ধরে এগিয়ে চলি। অল্প পরেই ফেগুর চীৎকার শুনি। ফিরে তাকাই। দেখি, উত্তেজিত হয়ে ফেগু আমাকেই ডাকে।

হিমালয়ের মহান শান্তি, কোথাও কোন উত্তেজনা নেই। ওখানে ব্যাপার কি? তাড়াতাড়ি আবার ফিরে আসি।

"মিল গ্যয়া,—মিল গ্যয়া"—ফেগু আনন্দে চেঁচায়। বলে, এখানেও লোকগুলার সঙ্গে কথা বলে বোঝাতে পারি না। কে মাল আনছে চিনিও না ত। নদীর ধারে যাদের দেখলেন—এ-সব একই দল। মালপত্র এইখানে সাজিয়ে রেখেছে—রাত কাটাবে বলে। সেই মালের স্তূপের কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখি—আমাদের মাল তারই মধ্যে!—দেখবেন আসুন—কথার টানে যেন টেনেই নিয়ে চলে।

ছোট একফালি মাঠ। ঝোপে ঘেরা। যেন, গোল করে পাঁচিল দেওয়া। বাতাস আটকাবে, তাই এইখানেই ওদের রাত্রের আশ্রয় নেওয়া। একপাশে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখা তাদের মালপত্র। দেখি, ঠিকই বটে, তারই মধ্যে অতিপরিচিত আমার সেই হোলডল, রুকস্যাক-আদি। যেন, উঁকি মেরে দাঁত বার করে হাসে। দেখে মোর 'জ্বলে যায় পিত্ত'। হারিয়ে-যাওয়া কোলের ছেলে ফিরে পাওয়ার এমনি বুঝি আনন্দ!

এইবার আর এক প্রহসন।

প্রথমত ভাষার অন্তরায়। কেউ কারুরই কোন কথাই বুঝি না। অনুরূপ পরিস্থিতিতে প্রায়ই দেখি, নিজের মাতৃভাষাই ভাব প্রকাশে সাহায্য করে বেশি। তাই, বাংলাতেই একটানা কথা বলে যাই। হয়ত, চোখমুখে, অঙ্গভঙ্গিতে ভাব ফোটে। কৈফিয়ৎ চাই, কে এনেছে এই মাল? কাল থেকে দু-দিন এগুলো পাই নি কেন? জামা, বিছানা, খাবার—আমাদের সব কিছুই এর মধ্যে,—হয়রানি কম ভুগতে হয়েছে? মাল নিয়ে চলেছ কীসের জন্যে—

দলের মধ্যে থেকে একটা লোক এগিয়ে আসে। সবাই লম্বা-চওড়া, জোয়ান। বিরাট পাগড়ির তলায় ঝাঁকড়া চুল। দু'কানে মাকড়ির মত গহনা ঝোলে। পরনে সেই ঝোলা পাঞ্জাবি। যেন, এক-একটা দস্যুসর্দার। এগিয়ে এসে সে-ও নিজের ভাষায় কি বলে। অবাক হয়ে দেখি, তাদের কারও মুখে চোখে ভাবনা চিন্তা লজ্জা কিছুই নেই। বরং একটা কৌতুকের ভাব। সবারই মুখে হাসি। একজন এসে আমার হাতই ধরে ফেলে। মারবে নাকি? ইশারা দেখে বুঝতে পারি, ডাকছে,—এগিয়ে যেতে আগুনের পাশে,—যেখানে গোল হয়ে বসে এরা চা খাচ্ছিল, একজন এক গেলাস চা নিয়ে এগিয়ে আসে। আমার হাতে দিতে চায়। কোনমতেই নেব না। সবাই পীড়াপীড়ি করে। ভাবটা যেন, গরম চা-টা ত আগে খাও একটু আগুন পোহাও,—তারপর বোঝা যাবে তোমার এত উত্তেজনার কারণটা কি! এতগুলো লোকের সমবেত হাসির তোড়ে ও নির্বিরোধ ভাব দেখে যেন বোকা বনে যাই। বাধ্য হয়ে চায়ের গেলাস ধরতে হয়, মুখে হাসির রেখাও টানতে হয়। তারপর দু'তরফেই আপন মাতৃভাষায় ও ইঙ্গিতে কথাবার্তা চলে।

ফেগুরামও চা পেয়েছে। সেই লোকটার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে।

ব্যাপারটা এতক্ষণে বোঝা যায়। কিন্তু কেন এমন ঘটল, বুঝি না।

এরা রামপুর থেকে রওনা হয়ে নীচের নতুন পথ দিয়ে চলেছে,—সাত্‌লুজের ধার দিয়ে মোটরের যে বড় সড়ক তৈরি হচ্ছে—তাই ধরে। ও পথ লম্বায় কিছু বেশি হলেও, চড়াই উৎরাই নেই বললেই হয়। জানোয়ারের ওপর মাল নিয়ে ওদিক দিয়ে আসার তাই সুবিধে। আজ এখানে এসে পড়ার কারণ—এখান থেকে সাত্‌লুজ বেশি দূর নয়; সেদিকে থাকবার আজ ভাল জায়গা পায় নি, ঘাসও সেখানে নেই—জানোয়ারের খাওয়া মিলবে না, বারুদ দিয়ে ওখানে পাহাড়ও ভাঙা চলছে—তাই সব দিক দিয়েই সুবিধে বলে একটু উঠে এসে আজ এখানে রাত কাটাচ্ছে।

মনে মনে ভাবি, তা নয়, আমাদের দুর্ভোগ যা পাওয়ার ছিল, সে-ভোগ শেষ হয়েছে, তাই ওদেরও আসতে হয়েছে। কিন্তু, বুঝি না, রামপুরে ওরা জানায় নি কেন—ঐ পথ দিয়ে আসবে?

ফেগুকে প্রশ্ন করি। সে বলে, যেটুকু বুঝলাম, ওরা বলে, আমাদের পথে কোথাও মাল দেবার কথাই নেই। সর্দার বলে দিয়েছে, চিনিতে এগুলো সঙ্গে নিয়ে যাও, যাদের মাল তারা টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নেবে সেখানে—পরচা দেখিয়ে।

অবাক কাণ্ড! কে কোথায় ভুল করলে, কি জানি। যাক, যা হবার হয়েছে, এখন আরও দুদিন পথে কাটানো বাকি, ওরা কি কাল আবার নতুন মোটর-পথ ধরবে?

খবর নিয়ে জানা যায়, ঠিক তাই। অতএব, এ-দুদিনের জন্য যা না-হলেই নয়, সেইটুকু মাল বার করে নিয়ে রুকস্যাক-এ ফেগুরাম নিয়ে চলুক। কিন্তু মালপত্র ঢেলে

সাজাতে ডাকবাংলোয় এগুলি নিয়ে যাওয়া দরকার। কাপড়-চোপড় সেই সুযোগে বদলে নেওয়া যাবে।

এরা স্পষ্টই জানিয়ে দেয়, খচ্চরে মাল নিয়ে যাচ্ছে। মাল বহা এদের কাজ নয়। খচ্চরও এখন খুলে দেওয়া হয়েছে, মাঠে চরছে। ডাকবাংলোতে মাল ওরা কেউ নিয়ে যাবে না।

বুঝলাম, কিছু উপরি রোজগারের মতলব। অগত্যা রাজী হতে হয়। মালপত্রও বাংলোতে পৌঁছে যায়। বলি, বাংলোর এই পথ দিয়েই ত কাল সকালে যাবে, তখন এগুলো আবার নিয়ে নিও, ঠিক করে রাখব।

ইশারা করে জানায়, তা হবার নয়। ওদের ভিন্ন পথ। আমরাই যেন খুব ভোরে নীচে ওদের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করি।

যাক,—মাল ত অবশেষে হাতে এসেছে, কাল পৌঁছেও দেওয়া যাবে কোনমতে। আপাতত নিশ্চিন্ত।

পৌগুা—৬,১২৪ ফুট। এখানেও পুরানো বাংলো। কাঠের বাড়ী। বড় বড় ঘর। বাইরে টানা টানা বারান্দা। ভিতরে আসবাবপত্র। সবই জীর্ণ মলিন অবস্থা। এককালে সুন্দর সাজানো বাগানও ছিল দেখেই বোঝা যায়। বুড়িয়ে-যাওয়া গাছে এখনও কেমন ফুল ফোটে, অবাক হয়ে দেখি।

জিনিসপত্র খুলে নতুন করে সাজাই। স্লিপিং ব্যাগটা বাইরে রাখি। ফেণ্ডু রুক্স্যাকের ওপর পিঠে নেবে, ওটার আর ওজনই বা কি!

রান্নার মনোমত মালমশলা পেয়ে ফেণ্ডুও খুশি। স্ফূর্তি করে রাঁধে। সন্ধ্যার মধ্যেই খাইয়ে দেয়। ঘরের ভিতর খাটের উপর আরামে শুয়ে পড়ি। গত-রাতের কথা ভেবে আমোদ পাই। সোনালী রেশমী চাদর গায়ে হিমালয়ও যেন নিদ্রা যান। নিঝুম নিস্তব্ধ। হঠাৎ বাঁশীর সুর ওঠে। ফেণ্ডুরাম বারান্দায় বসে আপন মনে বাজায়।

কখন ঘুম এসে চোখে নামে জানতেই পারি না।

॥ ৬ ॥

রাত শেষ না হতেই উঠি। মালগুলি খচ্চরওয়ালাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। দেরি হলে, হয়ত, ফেলে রেখেই চলে যাবে। পাঠানোর গরজ,—আমারই।

গুছিয়ে নিয়ে ফেণ্ডু ও চৌকিদারকে ডাকি। পাহাড়ের শীতে তাদের ভোরের ঘুম ভাঙাতে সঙ্কোচ জাগে। উপায়ও নেই।

টর্চ জ্বেলে পথ দেখে চলি। আধ মাইলেরও বেশি পাহাড়ের নীচে মাল পৌঁছে দেওয়া হয়। ওরা তখন সবে উঠেছে। যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয় নি।

কাজ সেরে স্বস্তি বোধ করি। বোঝা দেওয়া ত নয়, নিজেরই ঘাড়ের বোঝা যেন নামলো। চিনি পৌঁছে আবার ওগুলি নিতে হবে।

বাংলোতে ফিরি। চৌকিদারকে চা করতে বলি। রাত্রের রাখা দুখানা রুটি আছে। ফেণ্ডুকে বলেছি, তার জন্যেও রাখতে। খেয়ে নিয়ে দুজনে একটু পরেই রওনা হব।

সকাল হয়ে আসে। মেঘমুক্ত আকাশে আলো ফোটে। হিমালয়ও যেন রাতের সোনালী চাদর ফেলে সাদা মিহি সুতির চাদর জড়ান। বারান্দায় বসে নিশ্চিন্ত আরামে হিমাঞ্চলের শান্ত প্রভাত-শোভা উপভোগ করি। আজ আর কোনই ভাবনা নেই। জগৎ কতো সুন্দর!

টুংটাং শব্দ ওঠে। খচ্চরওয়ালারা ওই বুঝি রওনা হয়! কালকের ঘটনা মনে পড়ে। লোকগুলি কি সরল! আবার রঙ্গপ্রিয়ও! আমি উত্তেজনা দেখাই। তারা হাসে। হাত ধরে টেনে চা খাওয়ায়। বেচারীদের দোষ নেই কোন। নিশ্চয় সর্দারটাই ভুল করেছে।

ঘণ্টার ধ্বনি আরও জোরে শুনি। এদিকেই এগিয়ে আসে, মনে হয়। এই পাহাড়ের নীচে দিয়ে হয়ত ওদের পথ গিয়েছে। পাহাড়ের কি অদ্ভুত আবহাওয়া। নিকট হলেও দূর। মাঝখানে হয়ত পাহাড়ের খাড়া পাথরের অন্তরায়। চোখের আড়াল, শুধু শব্দ আসে অবাধে ভেসে।

টুংটাং শব্দ আরও এগিয়ে আসে। এ কী ব্যাপার! বারান্দার হাত পাঁচ সাত নীচেই গাছের আড়াল দিয়ে ওদের পথ! এই তো চলে সারি সারি। চেয়ারে সোজা হয়ে বসি। গলা বাড়িয়ে তাকাই। ঐ তো দেখা যায় খচ্চরটার পিঠে আমার হোল্‌ডল্‌। লোকগুলোও তো আমার দিকে মুখ তুলে তাকায়। দাঁত বার করে হাসে।

অথচ, কাল বললে, এদিক দিয়ে ওদের পথ নয়,—শেষ রাতে তুলে মালগুলো সেই নীচে পর্যন্ত বওয়ালে—অতোখানি পথ! এখন আবার হি-হি করে হেসে চলে যায়—চোখের সামনে দিয়ে!

সব শয়তান নাকি?

নাঃ, তাকাবো না ওদিকে। ভাবছিলাম, পাহাড়ের অদ্ভুত আবহাওয়া—মানুষের প্রকৃতি তার চেয়েও বিচিত্র!

৬-৪৫-এ আবার পথ চলা শুরু। দুজনে এগিয়ে চলি।

পথের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আজ নিজেদেরই জিম্মায়। দুদিনের রেশনও। ফেগুর পিঠে ঝোলে রুকস্যাক। তার উপর স্লিপিং ব্যাগ। যাক, ঐ লোকগুলার হাত থেকে খুব রক্ষা পাওয়া গিয়েছে। মনে মুক্তিপ্রাপ্তির আনন্দ। ফেগুর দিকে তাকিয়ে হাসি। মুখ দেখে আশ্চর্য হই। এ কী! গম্ভীর তার মুখ। ফোলা-ফোলা চোখের ভাব।

হঠাৎ মনে আসে, বলিজির মন্তব্য,—কিন্নর-পুরুষরা মাল বইতে চায় না। এই সামান্য রুকস্যাক নিতেই ফেগুর এতো পরিবর্তন! মন-ভরা অতো আনন্দ, মুখের সেই সরল হাসি,—সব নিমেষে মিলিয়ে গিয়েছে!

নিজেকেই দোষী মনে হয়। শারীরিক পরিশ্রম করার চারিত্রিক বিমুখতা যতই থাক কিন্নরদের, আমি দুদিনের যাত্রী, তাদের সহজাত আনন্দ হাসি এমন করে হরণ করার আমার অধিকার কী? বোঝা বহে চলা আমারও অনভ্যাস। তবু, আমি-ই নিয়ে যাব ঐ রুকস্যাক,— এমন কিছু ভারী তো নয়। কেন বেচারীকে অযথা কষ্ট দেওয়া!

সস্নেহে হেসে জিজ্ঞাসা করি, ফেগুরাম, বোঝাটা বইতে অসুবিধে হচ্ছে, নয়? সে আশ্চর্য হয়। বলে বোঝা? কই, না। এ তো হাল্কা। মোটেই ভার নেই।

বলে বটে ভার নেই, কিন্তু মুখ ভারী করে সে মাথা হেঁট করে।

"তোমাকে তা'হলে অতো গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন? হাসি গেল কোথায়? বাঁশী বার করো,—বাজাও।"

মুখ তুলে তাকায়। অশ্রুসজল চোখের চাহনি। দু গাল বেয়ে ধারা গড়িয়ে পড়ে মুক্তার মত। পথের পাশে পাথরের উপর বসে পড়ে। ফেগু কাঁদে।

হতভম্ব হই। নিকটে এগিয়ে পিঠে হাত দিই, শান্ত করার চেষ্টা করি। হঠাৎ হলো কি?

সে কাঁদতে কাঁদতে জানায়, তার বাঁশী নেই। সকাল থেকে কত খুঁজেছে, কোথাও পেলো না। রাত্রে মাথার কাছে রেখে বারান্দায় শুয়েছিল। সকালে কাজ সেরে তৈরি হতে গিয়ে দেখে—অন্য সব কিছুই আছে, বাঁশী নেই।

অবাক হই। গেল কোথায়? নেবেই বা কে? কেনই বা?

সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি। বলি, চিনিতে বাঁশী পাওয়া যায় তো? নতুন কিনে দেব তোমাকে।

সে প্রবোধ মানে না। বলে, আমার নিজের হাতে তৈরি। কতোদিনের সঙ্গী।—কাঁদতে থাকে। সরল অবোধ শিশুর মত।

ভাবি, সত্যই তো। কিন্নরের হাতের বাঁশী! এর হারানোর ব্যথা, আমি বুঝব কী! চুপ করে থাকি। পরে হাত ধরে তুলি। বলি, কাঁদলেও তো ফিরে পাবে না।—আজ কতো দূরে যেতে হবে বলো ত?

আবার পথ চলি। মন ছেয়ে যায় নিরানন্দে। হিমালয়ের রূপরাশিও চোখে যেন ম্লান ঠেকে। ভাবি, জগতে এতো দুঃখ কেন? অকারণ এমন ব্যথা দেওয়ার প্রয়োজনই বা কার কি ছিল? মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা—"ছোটো প্রাণ"—

"হে রুদ্র, কেন তারো 'পরে বাণ হান,
কেন তুমি নাহি জান
নির্ভয়ে ওরা তোমারে বেসেছে ভালো,
বিস্মিত চোখে তোমারি ভুবনে
দেখেছে তোমার আলো।"

আবার, তখনি মনে হয়, সুখ দুঃখ জীবনে অবিচ্ছিন্ন। সুখের ভিতরেই দুঃখের বীজ, দুঃখের মধ্যেই সুখের সূচনা। আরব কবি ও শিল্পী Kahlil Gibran-এর The Prophet-এর কয়টি পংক্তি মনে গুঞ্জরিত হয় : "Your joy is your sorrow unmasked. And the selfsame well from which your laughter rises was oftentimes filled with tears...Is not the cup that holds your wine the very cup that was burned in the potter's oven ? And is not the lute that soothes your spirit the very wood that was hollowed with knives ?

ফেগুরামের সেই বাঁশরি-ই হারায়।

ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলি। কখন আবার জগতের সুখ-দুঃখের রৌদ্র-ছায়ায় বোনা মায়া-জাল কেটে মন প্রশান্ত অনন্তে মেশে জানতেই পারি না।

অপূর্ব মনোহর মূর্তি হিমালয়ের এই অঞ্চলের। যেদিকে তাকাই, গগনস্পর্শী গিরিশিখর। মৌন, মহান। কোথাও উচ্চশিরে শোভে তার তুষার-কিরীট। মনে হয়, কতো ক্ষুদ্র, নগণ্য এ মানবজীবন। তুচ্ছ তার ক্ষণস্থায়ী সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার খেলার উৎসব। তবুও দেখি সেই সুগম্ভীর বিরাট গিরিরাজ যেন আনত নয়নে কৃপা-দৃষ্টি ফেলেন। সহস্র বাহু বিস্তার করে দেন প্রেমভরে,—দুর্বল অসহায় মানুষ যেন নির্ভয়ে আশ্রয় পায়। কতো

উঁচু পাহাড়! মাথা তুলেও উপরে শেষ দেখা যায় না। অথচ, ধীরে পাহাড়ের ঢালু গা নীচের দিকে নেমে আসে। রুক্ষ, রুদ্র, কঠোর শিলাময় রূপ নয়। স্নিগ্ধ শ্যামল বনছায়াকীর্ণ। করুণাঘন কমনীয় স্নেহ-শীতল। চারিদিকে দেওদার বন। তারই সুনিবিড় শান্ত ছায়াতলে এঁকে বেঁকে পথ চলে। সেই পথেরই হাত ধরে মনও যেন এগিয়ে চলে। আনন্দময় গভীর প্রশান্তি অন্তর প্রদীপ্ত করে।

এই স্বর্গীয় পরিবেশের মাঝে মাঝে ছোট গ্রাম। মাথা তুলে মন্দিরের চূড়া। সবুজ গাছপালার মধ্যে যেন পাখির বাসা। কিন্নর-কিন্নরী ঘোরে ফেরে। রঙীন টুপি। নানা রঙের বেশভূষা। যেন, বনভূমি আলো করে রং-বেরঙের পাখি ঘোরে। বিদেশী দেখে থমকে তাকায় না। না-জানা ভাষায় কি যেন বলে। কিন্নরী-কণ্ঠে যেন কাকলী ফোটে।

এ-যেন ঘুমঘোরে কোন্ এক স্বপ্নরাজ্যে চলি। মনের আনন্দে পাহাড়ের উপর দিকে উঠতে থাকি। তারই মাঝে কোথাও বা সমতল পথ।

মাইল পাঁচেক এসে নাচার গ্রাম। পথ ছেড়ে ডানদিকে বড় বড় গাছের নীচে দিয়ে অল্প উঠেই গ্রামের ঘরবাড়ী। কাঠের বড় মন্দিরও। আরও একটু এগিয়ে ফরেস্টের বাংলো। সুন্দর দোতলা কাঠের বাড়ী। চারিপাশে ফল-ফুলের বাগান। শাক-সব্জির। এ-অঞ্চলের বড় গ্রাম। লোকজনও ঘোরে।

দুপুরের আহার ও বিশ্রামের আশায় বাংলো অভিমুখে চলি।

॥ ৭ ॥

নাচারের উচ্চতা ৭,১২৫ ফুট।

বনবিভাগের বিশ্রামাগার। কিন্তু আদর-অভ্যর্থনা পাই যেন আপন গৃহের। এখানকার ফরেস্ট-অফিসার পরিদর্শনে এসেছেন। অপরিচিত মানুষের সাড়াশব্দ পেয়ে বেরিয়ে আসেন। তখনি সাদরে নিয়ে চলেন ঘরের ভিতরে। বলেন, আলাপ-পরিচয় হবে চায়ের টেবিলে; ব্রেকফাস্ট তৈরি,—চা জুড়িয়ে যাবে,—চলে আসুন ভেতরে।

চমৎকার মানুষ। অল্পক্ষণেই আলাপ জমে ওঠে। চায়ের টেবিলে পরিচয় হয় আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। নাম শুনি, দিব্যদর্শী কাপুর। সুশ্রী যুবা-পুরুষ। বুদ্ধিদীপ্ত চোখের চাহনি। প্রথমে ভাবি, অফিসারের সহকর্মী, অথবা হয়ত বন্ধু—এখানে বেড়াতে এসেছেন। পরে দেখি, কোনটাই নয়। কলকাতা থেকে আসছি শুনে কাপুর আমাকে চমকে দেন—পরিষ্কার বাংলায় কথা বলে। কতো দিন পরে মাতৃভাষা শুনি। মনে অন্দর-মহলের নিভৃত আঙ্গিনায় যেন ফুল ফোটে। জিজ্ঞাসা করি, বাংলাদেশের সঙ্গে তা'হলে যোগাযোগ আছে দেখছি। কলকাতায় থাকেন, না পড়াশুনা করা ওখানে?

দিব্যদর্শী হেসে বলেন, কোনটাই মিলল না। কলকাতা তো দূরের কথা, বাংলাদেশের কোথাও কখনো যাই নি।

আশ্চর্য হই;—"তাহলে এমন চমৎকার বাংলা শিখলেন কি করে?"

"রবীন্দ্রনাথ এর জন্যে দায়ী। তাঁকে দেখবার কখনো সৌভাগ্য হয় নি। আমিও জন্মেছি, তিনিও চলে গেলেন। শুধু তাঁর রচনা পড়বার জন্যেই বাঙলা শেখা। সুযোগও সহজে এসে গেল।"

তারপর হেসে বলে, দেখুন, আমার আর বয়সই বা কী! কিন্তু দেখছি, ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে সঙ্কল্প থাকলে সহজেই কেমন যোগাযোগ হয়ে যায়। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। Anthropology—নৃ-তত্ত্বে এম. এস-সি পড়ি। প্রফেসার ছিলেন বাঙালী। খুব স্নেহ করেন। তাঁর বাড়ীতেও ছিলাম কিছুকাল। বাঙ্‌লা শেখার কেমন সহজ সুযোগ পেলাম। এখন সময় পেলেই রবীন্দ্রনাথ পড়ি।

কবিবর, কবে কোন বিস্মৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত!...... ......

শুনি। আনন্দে মন ভরে ওঠে। হিমালয়ের কোন এক সুদূর নিভৃত অঞ্চলে অবাঙালীর কণ্ঠে বিশ্বকবির কবিতার আবৃত্তি।

ফরেস্ট অফিসার বলেন, আমারও দু'দিন সন্ধ্যাটা কাটছে বেশ আনন্দে এঁর সঙ্গে। কিন্তু, আমাকে এখনি কাজে ঘুরতে বেরুতে হবে। আপনারা দুজনে গল্প করুন। থাকবেন তো এখানে দু-একদিন অন্তত?

বলি, এমন সঙ্গ. জায়গাও এমন সুন্দর। কিন্তু, আগে যেখানে চলেছি, ঘুরে আসি। ফেরবার পথে দু'দিন বরং কাটিয়ে যাব।

ছিলামও তাই। তখন ফরেস্ট অফিসার ট্যুর শেষ করে ফিরে গেছেন। দিব্যদর্শীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও হয়।

দিব্যদর্শীর এখানে থাকবার কারণ জানতে পারি। কিন্নরদের সম্বন্ধে থিসিস্ লিখছে। বলে, এদের বিষয়ে কোন গবেষণা হয়েছে বলে জানি না। হিমালয়ের অন্যান্য জাতি থেকে এরা অনেকখানি স্বতন্ত্র। দেখতে-শুনতেও বটে, আচার-ব্যবহার বেশভূষাতেও। ভাষাগতও পার্থক্য আছে। হিমালয়ের এই অঞ্চলে হঠাৎ কি ভাবে এরা এলো, কিংবা অন্য কোন জাতের সঙ্গে মেশামেশি হওয়ায় এক নতুন জাতি ক্রমে গড়ে উঠল,—এটা পরীক্ষা ও বিচার করে স্থির করার বিষয়। এখানেও জাতিভেদ আছে। সেটা অবশ্য হয়-ই,—সমাজ গড়ে ওঠার সঙ্গে ও খানিকটা রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক কারণে, আবার ধর্মপ্রচারের ফলেও। এই যেমন নাচারে দেখবেন চারটে জাত। ভাল কথা, 'নাচার' কথাটার মানে জানেন?

"না বললে জানব কি কর? বলো, শুনি।"

"নাচার শব্দটার উৎপত্তি—'নল্‌চে' থেকে। কিন্নর-ভাষায় নল্‌চে মানে যে-জায়গায় নর্তক-নর্তকীর বসবাস। হিমালয়ের আর কোথাও জায়গার নামের সঙ্গে নাচের এমন মধুর সংযোগ পেয়েছেন? আবার দেখুন, আমাদেরও কতো কালের ধারণা, কিন্নর-কিন্নরী বলতেই নাচ-গান-বাজনা। নয় কি? এই গ্রামে—অন্য সব বড় গ্রামেও—বাসিন্দারা চার শ্রেণীতে ভাগ করা। প্রথম—কানেত। এরাই এখানকার মাতব্বর, এ-দেশের শ্রেষ্ঠ জাত বলে নিজেদের মনে করে। ঐতিহাসিকদের মতে, এরা খস্‌জাতি থেকে উৎপন্ন। নিজেদের এখন রাজপুতও বলে। উপাধি নিয়েছে—নেগি। আগেকার কালে 'নেগি' বলতে বোঝাত, যে-সব রাজপুত সর্দারদের রাজ-দরবারে যাবার অধিকার ছিল, শুধু তাদেরই। এখন সবাই 'নেগি'। দ্বিতীয় জাত হোল,—কোলি। স্থানীয় লোকে 'চামাঙ্'-ও বলে। শুনেই বুঝতে পারছেন,—এরা চর্মকার,—চামারের কাজ করে। তৃতীয় হোল,—লোহার অর্থাৎ

লৌহকার। চতুর্থ—বধি,—ছুতোর শ্রেণী। শেষের তিনটে নিম্নজাত আজকালকার 'সিডিউলড্ কাস্ট্স্' Scheduled Castes। এসব জায়গায় গ্রাম বা সমাজ গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এরা বাইরে থেকে এসে বসবাস ও আপন ব্যবসা শুরু করে।''

''তা হলে বোঝা যাচ্ছে, কানেতরাই হোল এখানে প্রধান?''

''ঠিকই তাই। এখন প্রশ্ন ওঠে,—এরাই কি তা হলে সত্যিকার কিন্নর জাত? কিন্তু দেখা যায়, ঐতিহাসিক নানান কারণে হিমালয়ের এ-অঞ্চলেও বর্ণ-সঙ্কর ও ধর্ম-সঙ্কর ঘটেছে।''

রবীন্দ্রনাথের সেই রচনাটির কথা মনে পড়ে। তাকে বলি। শুনে উৎফুল্ল হয়। বলে, তাই নাকি? সেটা তো যোগাড় করে পড়তেই হবে।

বলি, রাহুল সাংকৃত্যায়নের বই-এও এই ধরণের কি যেন লেখা আছে না?

শকেরা আর্যদের সগোত্র ছিল। পুরাকালে তারা ছিল ভ্রাম্যমাণ যাযাবর। গোবি থেকে কার্পেথীয় পর্বতমালা পর্যন্ত বিচরণ করে বেড়াত। তারপর হূণদের আক্রমণে শকেরা পালাতে আরম্ভ করে—নানা দিকে ছড়িয়ে। তাদেরই কয়েকটা দল সেই মধ্য এশিয়া থেকে চলে আসে—এই হিমালয়ে।

এখানে ক্রমে 'খশ্' নামে পরিচিত হয়। 'খশ্'—'খছে'—'কশ্'—শক শব্দেরই অপভ্রংশ। এদের যে-সব দলপতিরা ভারতের সমতলভূমিতে নেমে যান্—তাঁরা কয়েক শতাব্দী ধরে সেখানে রাজত্ব করেন। কদাফিস্, কণিষ্ক, হুবিষ্ক, বাসুদেব ইত্যাদি। আবার, ভারতের বৈদিক যুগের আর্যরাও হিমালয়ে আসেন ভারতের সমভূমি থেকে। কিন্তু হয়ত তার আগেই হিমালয়-পার্বত্যঅঞ্চলে খশ-রা আধিপত্য বিস্তার করে। তখন থেকে জাতি-গত ও ধর্ম-গত সংঘর্ষও শুরু হয়। এর পরেও কতো বিভিন্ন জাতির অনুপ্রবেশ ও আক্রমণ এখানে চলে। ওদিকে ভারতের উত্তরে ভোট সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে তিব্বতের দিক থেকেও এক প্রবল শক্তি নেমে আসে। সেই কারণেই এখন দেখা যায় আধুনিক কিন্নর দেহে ও আকৃতিতে ভোট বা তিব্বতী রক্তের প্রভাব। 'অশ্বমুখ'ও কোথাও গোলাকার ধারণ করে, তার লম্বাটে গঠন হারায়। ধর্মের মধ্যেও তিব্বতী বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকমতের আচারনিয়মের বহুল প্রচার হয়। আবার, আর এক দিকে দক্ষিণ থেকেও—ভারতের সমতলভূমি থেকে এসেও খশ-দের জয় করে ভারতের গুর্জর-প্রতিহার-বংশীয় রাজারা।

দিব্যদর্শী বলে, ও-সব ইতিহাসের ব্যাপার। আমার প্রধান আকর্ষণ,—নৃতত্ত্ব— anthropology। কিন্নরদের দেহের গঠন, আকার, বর্ণ—আবার তাদের আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি, দৈনন্দিন জীবন-ধারা নিয়ে।

''কিন্তু, এদের ইতিহাস, ধর্মমত, আর্ট, ভাষা, বেশভূষা—এ-সবের মধ্যেও তথ্য সংগ্রহ করছ নিশ্চয়?''

''সেইজন্যেই তো এখানে আসা। এসেই চলে যাওয়া নয়। ভাবছেন বুঝি এই প্রথম আসছি? মোটেই না। গত বছর এসে একটানা তিন মাস ছিলাম। এ বছরও এই চার মাস হয়ে গেল, আরও অন্তত মাস দুই থাকবো। চেষ্টা করছি, খাটতেও ভয় নেই, নানান তথ্যও সংগ্রহ হচ্ছে, তবুও মনে হয়, বিরাট বিষয়—কতোটুকুই বা আমার দ্বারা হবে?''

''তোমাকে সাহায্য করার কাউকে পাও নি?''

"একটা মস্ত সুবিধে হয়ে গেছে। ঐ যে বলছিলাম না? ভাল কাজ করার উদ্দেশ্য নিয়ে নামলে কোথা থেকে সাহায্য যেন এসে যায়। হিমাচল প্রদেশ-সরকারের কাছে আমার কাজ করার সম্পর্কে জানাই, এই বন-জঙ্গলে থাকবার ও ঘোরবার ব্যাপারে সাহায্যও চাই। তাঁরা তখনি বিভিন্ন গ্রামের প্রধানদের কাছে লিখে ত দিলেনই, বনবিভাগের ঘর-বাড়ী ব্যবহারেরও অনুমতি দিলেন—তাই তো এখানে এখন আছিও,—তা ছাড়া একটা শর্ত করিয়ে নিয়েছেন—যাতে আমারই সুবিধে হয়ে গেল। যতোদিন যেখানে থাকব সেখানকার ছেলেদের বা উৎসাহী লোকদের কিছু শেখাতে হবে, কিভাবে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হয়, রেকর্ড রাখতে হয় ইত্যাদি। করছিও তাই। ফলে, তাদের দিয়েই আমার কাজের অনেক সাহায্য পাচ্ছি। কেননা দেখছি, গ্রামের লোকেদের কাছে প্রশ্ন করে কোন কিছু তথ্য বার করা নিজেদের লোকে যেমন পারে, বাইরের কেউ এসে তেমন পারে না। তবে, আমিও কিন্নরদের সঙ্গে মিশি খুব, তাদের বাড়ীতে গিয়ে থাকিও সুবিধে পেলেই। ভাল কথা, আপনি ত চিনিতে গিয়ে থাকবেন? তা থাকুন। কিন্তু এক কাজ করতে পারেন। চিনি পৌঁছুবার মাইল তিনেক আগে কিন্নরদের একটা ভাল গ্রাম,—রোঘী। পথেই পাবেন। সেখানে যিনি প্রধান—শুধু সেখানে কেন?—সারা কিন্নর দেশেই তাঁর নাম জানা—তিনি আবার সিমলাতে গভর্ণমেণ্টের 'ট্রাইবাল অ্যাডভাইসারি" (tribal advisory) বোর্ডের একজন সভ্যও—তাঁর নামে চিঠি লিখে দিই, নিয়ে যান,—তাঁদের বাড়ীতে অন্তত একরাত কাটিয়ে যাবেন। চমৎকার মানুষ। তা ছাড়া কিন্নর-গ্রামে তাঁদেরই বাড়ীতে অতিথি হওয়া—যতো কম সময়ের জন্যেই হোক না কেন,—তারও দাম আছে। "

তখনি রাজি হই। দিব্যদর্শী একটা কাগজে লিখেও দেয়। নাম শুনি, সন্তোষ দাস নেগী— 'নেগী' ত হবেই। কিন্তু, সন্তোষ দাস! সন্তোষ দাস!—ভাবতে থাকি। দিব্যদর্শী বলে, কি ভাবছেন এতো? অচেনা লোকের বাড়ীতে এমনি থাকা? তাঁরা খুশি হয়ে কেমন আদর-যত্নে রাখেন, দেখবেন। এমন সুযোগ ছাড়বেন না।

বলি, থাকার বিষয়ে ভাবছি না। থাকব ত বটেই, কিন্তু ভাবছি—সন্তোষ দাস!—নামটা জানা লাগছে। হাঁ, এতক্ষণে মনে পড়েছে—রাহুলের বই-এ পড়েছি। শুধু এঁর নামই নয়, এই নেগী-পরিবারের সবিশেষ পরিচয়ও দেওয়া আছে। রাহুলের সেই ১৯৪৮ সালের যাত্রার বিবরণে। তিনি অবশ্য তার আগেও আরও একবার কিন্নরদেশে আসেন,—সেবার ঢোকেন উত্তর দিক দিয়ে—অর্থাৎ তিব্বত থেকে নামবার পথে—সেই ১৯২৬ সালে! কী ঘোরাটাই না ঘুরেছেন কতো দেশে—এখানে ত বটেই। লিখেও গেছেন কতো তথ্য,—অবশ্য তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। হাঁ, যা বলতে যাচ্ছিলাম একটু আগে,—রাহুলের মতে, সম্ভবত প্রকৃত কিন্নর জাতি এই অঞ্চলের আদিবাসী ছিল। তারপর এদিকে আসে খশ্-রা ও ভারতের আর্য-হিন্দুরা। এখানকার আদিম অধিবাসীদের নাম ছিল,—কিন্নর-কিরাত। তাঁর ধারণা ঋগ্বেদের-সময়ে পাঞ্চাল-রাজ দিবদাস-সুদাসের সঙ্গে যে অসুরদের রাজা শানোয়ার-এর যুদ্ধ কাহিনী আছে, তারা বোধ হয় এই কিন্নর-কিরাতেরই সর্দাররা। মহাভারত পড়েছ?

"মহাভারতের কাহিনী জানা আছে। মূল সংস্কৃতে পড়লাম আর কবে? পড়বার কথাও মনে হয় নি,"—একটু হেসে বলে, "ও-সব পড়বার বয়সও এখন হয় নি।"

"পড়লে আনন্দ ত পাবেই। শেখবারও কতো আছে ঐ একখানি গ্রন্থেই। জাতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করছ,—ঐ মহাভারতেই দেখবে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় হচ্ছে! নানান দেশ থেকে উপঢৌকন আসছে—ভারে ভারে। খশ্‌-রাও আসে,—স্বর্ণ-ভেট নিয়ে,—পিপীলক-সুবর্ণ,— যে সোনা পিঁপড়েরা পাহাড় থেকে কুরে কুরে বার করত।"

দিব্যদর্শী হাসে। বলে, কিছু মনে করবেন না। কি-রকম অতি-রঞ্জন, অস্বাভাবিক মনে হয় বলুন তো?

"কিন্তু খশ্‌-দের এই বর্ণনা কাল্পনিক নয়। মধ্য এশিয়া—বিশেষ করে তিব্বত দেশে সোনা পাওয়া যেত, মাটির নীচে সে-সব সোনার দানা—এমন কি সোনার তাল—nuggets-ও থাকত, তার বহু প্রমাণ আছে। বই-তে বর্ণনা ত পাওয়া যায়ই, মানস-সরোবরের তীরে বড় বড় গর্ত দেখেছি, তিব্বতীরা খুঁড়ে সোনার সন্ধান করত এবং একতাল সোনাও পায় সেখানে শুনেছিলাম।"

"তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু ঐ 'পিপীলক-সুবর্ণ',—ওটা কি রকম হোল?"

"সেটা বোঝা বোধ করি তেমন শক্ত নয়। পিঁপড়েরা গর্ত খুঁড়ত, নীচে থেকে সোনা বাইরে চলে আসত, লোকে সংগ্রহ করত,—এ-ও হতে পারে। আর 'পিপীলিকা' বলতে হয়ত যে-সব লোক এই ধরনের পাহাড়ের গায়ে মাটিতে গর্ত করে বাসা করে থাকত—তিব্বতে এমন বাসস্থানের বর্ণনা আছে,—দেখেওছি, তাদেরই নামকরণ হয়ে থাকতে পারে—পিপীলক বলে। মহাভারতের এই বর্ণনা শুনে হাসলে, কিন্তু গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস— Herodotus—নাম মনে পড়ছে নিশ্চয়?—মহাভারত পড়েছিলেন কিনা জানি না,—অথচ হিমালয়ের লাডাক্‌-অঞ্চলের বর্ণনা দিতে তিনিও বলেন, আশ্চর্য পিপীলিকার দেশ এটা, মাটিতে ঘর তৈরি করতে গিয়ে বাইরে সোনা ছড়িয়ে ফেলে—"Land of wonderful ants....in burrowing out their homes in the earth, they threw up gold."

দিব্যদর্শীর কৌতূহল জাগে। বলে, দেখুন, বিজ্ঞান-জগতে কাজ করতে হয় অতি সাবধানে। যার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় শুধু তারই ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্তে আসাই নিয়ম। কল্পনার স্থান নেই সেখানে। তবু, রবীন্দ্রনাথের বাণাসুর-কাহিনীর ব্যাখ্যা শুনে অনেক কথাই মনে জাগে। নাচারের এখনও কিছু ঘুরে দেখা তো আপনার হয় নি, দেখবেন—এখানেও ঊষাদেবীর মন্দির। তিনি-ই এখানকার দেবী। গ্রামবাসীদের সব কিছু দরকারী কাজকর্ম তাঁর নির্দেশ না নিয়ে কেউ করবেই না। দেবী দৈববাণী প্রকাশ করেন, কারও ওপর অধিষ্ঠান করে,—এখানে তাঁর oracle আছে।

"এখানেও তাই আছে নাকি? হিমালয়ের অন্যত্রও—বিশেষতঃ তিব্বতে—এই প্রথা ও লোকমত আছে, জানি।"

দিব্যদর্শী বলে, লামাদের মধ্যে ত আছেই। কিন্তু, এখানকার লোকরা হিন্দুধর্মী—শিবের ও এই ঊষাদেবীর উপাসক। শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র—এঁদের নাম বড় একটা কেউ জানে না, তাঁদের মন্দিরও দেখি না।

শুনে বলি, তাহলে দেখ, সেই একই কথায় আবার ফিরে আসা,—শিব-উপাসক অসুর-রাজ বাণ, বিষ্ণু-অবতার কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ,—অর্থাৎ আর্য-অনার্যের সংঘর্ষ, পরে দু'দলের মধ্যে মিলে মিশে একটা সামঞ্জস্য।

দিব্যদর্শী জানায়, এখানকার প্রবাদ শুনেছেন হয়ত? বাণাসুরের রাজধানী ছিল শোণিতপুরে—সারাহানে। এই নাচারে তিনজন ঠাকুর ছোটখাটো রাজা সেজে বসেন। উষাদেবী এসে তাঁদের জয় করে নিজের প্রভাব বিস্তার করেন। সেই থেকে 'দেবী' বলে এখানকার লোকে তাঁর পূজাও শুরু করে। লোকেদের বিশ্বাস, এখানকার মন্দিরের মূর্তি দ্বারকা থেকে আসে, সাত্‌লুজের ধারে এটি পাওয়া যায়। এখানকার প্রচলিত উষা-অনিরুদ্ধের প্রেম-কাহিনীর সঙ্গে পুরাণের কাহিনীর নাকি অনেক তফাৎ আছে, শুনি। চলুন, মন্দিরটা দেখে আসবেন।

বড় বড় গাছ। তারই মাঝখানে কাঠের মন্দির। কাঠের উপর কারুকার্য। যেমন এই সব অঞ্চলে হয়। বেশভূষা অলঙ্কারে আবৃত মূর্তি। মন্দিরের নিকটে দু'তিনটি দোকান। ঘুরে-ফিরে দেখি। তবে তখন যাবার মুখে। বেশি ঘোরা হয় না। দিব্যদর্শীকে জানাই ফেরবার পথে এখান দুদিন কাটিয়ে যাব। তখন নিশ্চিন্ত মনে থাকতে ভালও লাগবে।

ছিলামও তাই। চিনি থেকে ফেরবার পথে মনের আনন্দে। ফরেস্ট বাংলোর নিকটেই একটা ছোট বাড়ীতে। দিব্যদর্শীর সঙ্গে।

নাচার জায়গাটি অতি মনোরম। পাহাড়ের ঢালু গায়ে মাঝে মাঝে সমতল ভূমি। ৬,৫০০ ফুট থেকে ৭,২০০ ফুট পর্যন্ত উঁচুতে গ্রামের ঘরবাড়ী বসতি। গত সেনসাসের রিপোর্টে লেখে ; ৮১৫ একর গ্রামের বিস্তৃতি। ২১৩ ঘর লোকের বাস। ১,১৬৬ জন বাসিন্দা। বেশির ভাগ লোক চাষ-আবাদ করে, ভেড়া-ছাগল পালন করে, উল বোনে। চারিদিকে বিশাল দেওদার গাছের বন। তারই ছায়াতলে কতো পাহাড়ী ঝরণা নেমে চলে। বনদেবীর আসরে যেন জলতরঙ্গের কনসার্ট বাজে। শুনি, এ-সব জঙ্গলে বড় বড় কালো ভালুক মাঝে মাঝে দেখা যায়। ক্ষেতে ফসল বা বনে ফল পাকলে প্রায়ই নেমে আসে। গাছের ফাঁক দিয়ে অদূরে বরফের পাহাড় সুন্দর দেখায়। মাইল-তিন নীচে শতদ্রুও বহে চলে।

দিব্যদর্শী বলে, ফরেস্ট বাংলোটিও কেমন সুন্দর দেখেছেন? জায়গাটির সৌন্দর্য দেখেই এটি এককালে তৈরী করেন—জি. জি. মিনিকেন। তিনি ছিলেন বুসায়ারের বনবিভাগের ডেপুটি কনসারভেটর। বাগানটিও সুন্দর সাজানো।

শুনে বলি, এ-টুকু সাজানো তো মানুষের যত্নে ও চেষ্টায়। আর, চারদিকে যে প্রাকৃতিক শোভা, পাহাড়ের গায়ে ঘন-সবুজ গাছপালার বিরাট সমারোহ—সে-ও কোন বিশ্বশিল্পীর সৃষ্টি ভাবতে বেশ লাগে। এ হোল আদর্শ শিল্পীর স্বর্গরাজ্য।

দিব্যদর্শীর মুখে আনন্দ ফুটে ওঠে। বলে, ওঃ! আপনাকে তো চিনি যাবার পথে তখন বলাই হয় নি—আর ছিলেনই বা কতটুকু সময়!—আমার ছোট ভাইটি আর্টিস্ট। তাকে এ-বছর আসবার সময় সঙ্গে নিয়ে এসেছি যে! আনবার কারণও আছে। দিল্লীতে বাবা-মার কাছে থাকত—থাকত মানে বাড়ীতে আর কতোটুকু বা কাটাত?—সারাদিনই টো টো করে কোথায় ঘুরত, কি করত—কেউই জানে না। বুদ্ধিমান---

আমার দিকে তাকিয়ে মুচকে হেসে বলে,---লোকে বলে আমার চেয়ে তার বুদ্ধি অনেক বেশি—কিন্তু হলে হবে কি?---পড়াশোনা কিছুই করলে না,—ম্যাট্রিকের পর কলেজে ভর্তি করানো হোল,—কিন্তু ঐ পর্যন্তই, একদিনও ক্লাস করলে না। বুঝতেই পারছেন—বাবার বিরক্তি ভাব, রাগ। মা অবশ্য কিছুই ওকে বলতেন না, বাবা বকুনি

দিলে বরং উল্টে বলতেন, থাক থাক, ও আর বকে কি হবে? ছবি আঁকতে ভাল লাগে ওর, ছবিই আঁকুক, সব ছেলেই কি সমান হবে—আমারও ভাবনা হচ্ছিল, ভাইটা কী-রকম যেন হয়ে যাচ্ছে। বাড়ীতেও ওকে নিয়ে এই অশান্তি,—বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এবার ওকে সঙ্গেই নিয়ে এলাম। আসতেই চায় না, একরকম জোর করেই আনা। কিন্তু, এখন দিল্লী ফিরে যাওয়ার নামও করে না, হয়েও গেল ক'মাস, ভালই আছে মনে হয়। খাওয়ার আগেই এসে পড়বে, দেখবেন তখন।

আসেও তাই। মুখের আদল দিব্যদর্শীর মতনই। কিন্তু হাবভাব চাহনি কেমন যেন অন্যমনস্ক ; বেশভূষা, মাথার আলুথালু চুল,—বিশৃঙ্খল। যেন, ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পাখা-ঝাপটা দেওয়া একটা পাখি। দেখেই মনে হয়, 'বোহিমিয়ান টাইপ'। বছর উনিশ--কুড়ি বয়স। রোগা। দাড়ি-গোঁফ যা উঠেছে, কামায় নি। কাঁধের পাশ থেকে একটা রঙীন ঝোলা ঝুলছে।

দিব্যদর্শী কাছে ডাকে। আলাপ করিয়ে দেয়। পরিচয় করা বা কথা বলার কোনই উৎসাহ দেখায় না। তার দাদা জিজ্ঞাসা করে, দেরি করলি? স্নান করবি না? গরম জল করে রেখেছি—

ঘাড় নেড়ে জানায়, 'না'। ঝোলা নামিয়ে তখনি পাশের ঘরে যায়, দিব্যদর্শী আমার দিকে তাকিয়ে বলে, ঐ রকমই ও। মনটা অদ্ভুত ভালো—পাহাড়ের হাওয়া, পাহাড়ী ঝরণার জলের মত। থাকে দেখেছেন? যেন কিছুই নেই। ভালো জামা-কাপড় কতো দিই, নিজে ব্যবহার তো করবেই না,—একে ওকে দিয়ে দেয়। একবার রাগ দেখিয়ে বলেছিলাম। কি উত্তর দিলে জানেন? 'আমার না হয় দাদা আছে, ওদের ত আর তা নেই।'—আর কিছুই বলি না। নিজের খুশি মতোই থাক। বড় ভালো ছেলে। আসছি এখনি।

পাশের ঘরে সে-ও উঠে গিয়ে ঢোকে। প্লেট-ডিস-এর শব্দ আসে। একটু পরে ডাকে। টেবিলে খাবার সাজানো। তিনজনে খেতে বসি। আর্টিস্ট আপন মনে খেয়ে চলে। দু'একটা মাত্র কথা বলে। আড়চোখে আমার দিকে তাকায়।

কোন পরিচয় তেমন হয় না বটে সেদিন, কিন্তু হয় পরের দিন।

একা একা ঘুরে বেড়াই বনে বনে। এক জায়গায় গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, এক টুকরা খোলা জায়গা। সবুজ ঘাসে ভরা। মাঝে মাঝে ছড়ানো পাথর। তিন দিকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘেরা বড় বড় দেওদার। আর একদিকে সামনে পাহাড়ের ঢালু গা নেমে যায় বহু নীচে নদীর উপত্যকায়। সেখানে শতদ্রুর একটুখানি অংশ চোখে পড়ে,—আঁকাবাঁকা বালুরেখা, তারই মাঝে জলের ঈষৎ চিকন আভা। ওপারে বিরাট গিরিশ্রেণীর স্তব্ধ মৌনতা। তারও পিছনে নীল আকাশে মাথা তুলে তুষার-শিখর। সকালের রোদে চারিদিক ঝলমল করে। খোলা জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়ালে মনে হয় যেন বিশাল প্রাসাদের ঝুলন্ত অলিন্দ থেকে বিশ্বপ্রকৃতির সুবিস্তীর্ণ মহান দৃশ্য দেখি।

সেখানেই হঠাৎ নজরে পড়ে, একটা পাথরের উপর বসে আর্টিস্ট কাগজ তুলি নিয়ে ছবি আঁকে। সে-ও যেন এক ছবি। স্থির, একাগ্র মনে বসে। ভাবি, এ-ও যেন হিমালয়বাসী এক যোগীর যোগসাধনা। অতি-সন্তর্পণে কাছে এগিয়ে যাই। ঝরা-পাতার উপর আমার পদক্ষেপের মর্মরধ্বনি,—না—আমারই হৃদ্‌স্পন্দন,—কিসে তার চমক ভাঙায়। হাসিমুখে পাশে বসি। তার আঁকা ছবি দেখি। চমৎকার আঁকে। জানি, প্রশংসার বাণী—মনের

নিবিড় আনন্দ প্রকাশে কতোই না তার ব্যর্থতা। নির্বাক হয়ে শুধু তাই ছবি দেখি, সুমুখের দৃশ্যও দেখি, তৃপ্তিভরা প্রসন্ন নয়নে তার দিকেও তাকাই। আজ, তার মুখেও অতি মৃদু হাসি ফোটে। কি জানি কেন, তার দু'চোখ অশ্রু-সজল উজ্জ্বল দেখায়। মুখে তার অপূর্ব যেন দীপ্তি ফোটে। কেউ কোন কথা বলি না। মানুষের মুখের ভাষা সে-যেন মনে হয় প্রগল্‌ভতা। প্রকৃতির দৃশ্য, পটের চিত্র, আর্টিস্টের অস্তিত্ব—সব মিলে যেন একাকার হয়। নিজের মনও যেন বিলীন হয় তারই মাঝে।

কতোক্ষণ সময় কাটে জানি না। মৃদু কণ্ঠে সে বলে, ছবি বুঝি আপনার ভাল লাগে? কিন্তু কিছুই যে আঁকতে পারি না আমি। কতো ছবি এঁকেছি, এইখানে বসে,—কতো ছিঁড়েছি নির্মম হাতে,—মনের মতো ছবি এখনও আঁকা হোল না। তবু রোজই আসি—এইখানে, আবার আঁকি, কেন কী জানি।

—স্তব্ধ হয়ে আবার তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে দিগন্তের পানে।

নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকি আমিও তারই পাশে,—যেন অনন্তকালের কূলে বসে চিরন্তন চিত্রকরের অতৃপ্ত আত্মার তরঙ্গ-কল্লোল শুনি।

॥ ৮ ॥

নাচার ছাড়তে বেলা ২-৪৫ বাজে।

দিব্যদর্শী বলে, দেরি করে রওনা হয়ে ভালই করলেন। এখানে বেশিক্ষণ কাটানো হোল, সে-কথা বলছি না; এখন যে-পথে চলবেন, রোদের তেজ থাকলে কষ্ট পেতেন। দেখবেন, পাহাড়ের রূপ এবার কতো বদলে যাবে। কিন্নর দেশের যে-অংশ ছেড়ে চলেছেন,—সেটা সবুজ, জলবৃষ্টি প্রচুর পায়। এগিয়ে গিয়ে দেখবেন, আরও যতোই ওপর দিকে চলেছেন, চারদিক শুকনো খটখটে হয়ে আসছে—জলবৃষ্টির সঙ্গে যেন কোন সম্পর্কই নেই,—যাকে বলে ঊষর প্রদেশ। হবার কথাও তাই। ক্রমে তিব্বতের সীমানার দিকে এগোনো ত। এই সব উঁচু পাহাড় ডিঙিয়ে এ-দিকের মেঘ ও-দিকে যেতে পারে না।

নাচার ছাড়িয়ে আসার পর দেখি, ঠিক তাই বটে।

এ যেন গাছের ছায়াতল ছেড়ে ধু-ধু করা তেপান্তরের মাঠে নামা। তবে, ধরণীর সুকোমল মৃত্তিকা নয়,—রুক্ষ কঠোর কালো পাথর। বিশাল বিস্তৃতিও নয়,—পাহাড়ের গা বেয়ে একটানা নেমে যাওয়া। গ্রাম ছাড়াতেই বনভূমি বিদায় নেয়, তরুলতাশূন্য ছায়াহীন রৌদ্রতপ্ত উগ্র পথ যেন সজোরে ঠেলা দিয়ে নিয়ে চলে নীচের দিকে। পাথরের পর পাথর, কোথাও বা ধাপের মতন। এমন ভাবে অনবরত পাহাড়ে নেমে চলায় দম ফুরায় না, কিন্তু পায়ে ব্যথা লাগে। বহু নীচের শতদ্রুর ক্ষীণ আকৃতি ক্রমে বড় হতে থাকে। নদীর উপর লোহার ঝোলাপুলও দেখা যায়। নদীর এধারে কয়েকটা চালাঘর, টিনের ছাউনি ও তাঁবু খাটানো। অপর পারেও পুলের শেষে দু'তিনটে ঘর। সেদিকের পাহাড়ের রূপ আরও উগ্র, কঠোর। উপর থেকে দেখায় যেন দুরন্ত নদী খরস্রোতের খড়্গ দিয়ে দু'দিকের পাহাড়ের পাথর কেটে সুড়ঙ্গ-পথ করে। নেমে চলে দুর্জয় বেগে প্রচণ্ড হুঙ্কার তুলে।

জায়গার নাম ওয়াংটু, সেতুর নামও ওয়াংটু ব্রীজ। ৫,৩৬১ ফুট উঁচুতে। নাচার থেকে

তিন মাইল। শতদ্রুর কূল ধরে মোটর চলাচলের যে নতুন পথ তৈরির কথা এ ক'দিন শুনি, এইখানে নেমেই সেই পথের প্রথম দর্শন পাই। মনে পড়ে, সরল স্বচ্ছন্দ গতির প্রলোভন দেখিয়ে এই পথই অশ্বতর-বাহিনীর মন ভুলিয়ে আমাদের হয়রান করেছে।

পূর্ণ উদ্যমে পথ তৈরির কাজ চলে। নদীর দু'ধারেই বহু লোকজন খাটে। ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ভাঙে। প্রচণ্ড শব্দ ওঠে, পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি জাগে। ধোঁয়া, ধূলা, ছিটকে-পড়া পাথরের টুকরায় ক্ষণিক কুজ্‌ঝটিকার সৃষ্টি করে। মনে হয়, ঘুমন্ত সিংহের দল হঠাৎ জেগে কেশর ফুলিয়ে গর্জে ওঠে।

এ-পারে পুলের প্রবেশ-পথের পাশেই দেখি, নোটিশ বোর্ডে লেখা,—হিমাচল প্রদেশ, —অপূর্ব সুন্দর কিন্নর দেশে আপনাকে সু-স্বাগত জানানো হচ্ছে।

গতানুগতিক বিজ্ঞপ্তি। তবু তারই মধ্যে সাদর-সম্ভাষণের আনন্দ-স্বাদ পাই। প্রফুল্ল মনে পুলের উপর দিয়ে অপর পারে এগিয়ে যাই।

ওপারে পুলের মুখে এক প্রহরী।

তখন মনে পড়ে দিব্যদর্শী বলেছিল, ওয়াংটু ব্রীজ-এর নিকটে 'চেকপোস্ট', সেখানে আপনার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করবে। তিব্বত যাবার ত এও একটা পথ, তাই পাহারা দেয়। তবে চিনি যাবার এখনও কোন বাধানিষেধ নেই।

দেখি, ঠিক তাই, পুল ছাড়িয়েই বাঁ দিকে একটা ছাউনি। সেইখানে অফিসার বসে। তাঁর কাছে যেতে হয়। তারপর প্রশ্নোত্তর চলে। অবশ্য বেশি কিছুই নয়। নামধাম, কোথায় চলেছি, কেন আসছি, চিনিতে কোথায় উঠব, জানাশুনা সেখানে কেউ আছে কিনা, কবে ফিরব— ইত্যাদি। একটা বড় খাতায় নাম, ঠিকানা, আসার উদ্দেশ্য আদি লিখতে হয়। এ পর্যন্ত সব কিছুই গতানুগতিক। কিন্তু, তার পরেই তাঁর প্রশ্ন ও ব্যক্তিগত মন্তব্য শুনে কৌতুক বোধ হয়। পাহাড়ে শুধু ঘুরতে আসাই উদ্দেশ্য শুনে তিনি বলেন, এখানে এই যে আপনারা আসেন,— আরও দু'চারজন এ ধরনের দেখেছি—আর আসছেনও সেই কতো দূর থেকে,—খরচাও তো কম নয়—আসার প্রকৃত কারণটা কি, বলুন ত? দেখার আছে কী এখানে? চারদিকে কেবলি উঁচু পাহাড়, কালো কালো পাথর,—আর ঐ একটা ভয়ঙ্কর নদী! তাকালে মনে হয়, পাঁচিল-ঘেরা জেলখানায় বসে। এত কষ্ট করে কি দেখতে এলেন? আর পাবেনই বা কি? আর এগোবেন না, সামনে দুর্দান্ত চড়াই। বাড়ী ফিরে যান এখান থেকেই।

মনে মনে হাসি। ভাবি, এ যেন ময়রা দোকানে বসে বলে, এতো লোক এই যে মিষ্টি কেনে,—করে কী? আমি তো মুখেই দিই না!

অফিসারকে রাগানো চলে না। তাই জিজ্ঞাসা করি, উপদেশটা ভালই দিয়েছেন, কিন্তু একটা খটকা লাগছে, পুলের ওপারে এই যে দেখে এলাম আপনারাই নোটিশ বোর্ডে লিখে স্বাগত জানাচ্ছেন—এই সুন্দর দেশে আসতে! তিনি গম্ভীর হয়ে বলেন, ওঃ! ঐ নোটিশ? ও-সব ঝুটা। লিখতে হয় তাই লেখা। হুকুম হয়েছে, তাই ঝুলিয়ে দেওয়া। এই সরকারী কাজ,— এর সত্যি কতটুকু? বুদ্ধিমানের মত ঘুরে ফিরে যান এইখান থেকেই, আর কষ্ট করবেন না। এ-সব পাহাড়ে ঘোরাঘুরি কেবল হয়রানি!

এতো আক্রোশের কারণ তখনও বুঝি না। তবু হেসে বলি, তাহলে দেখছি বোকামি করেই চলে আসা এইখানে। কিন্তু, চিনিতে কালই পৌঁছে যাবার কথা। এত দূরেই যখন

এলাম— কষ্ট করে তো বটেই—তবে ঐ পর্যন্ত নিজের চোখেই দেখে যাই। দেশে ফিরে সবাইকে জানাতে পারব আপনার অভিমত, আসতে বারণ করব হিমালয়ে বিশেষ করে কিন্নর দেশে।

তিনি শান্ত হয়ে বলেন, হাঁ, তাই করবেন। আজ রাত কাটাবেন কোথায়? টাপরিতে? পৌঁছুতে বেলা যাবে। উঃ! কী ভীষণ গরম দেখেছেন এই জায়গায়! লোকের ধারণা আবার— হিমালয় ঠাণ্ডা!

ভাবি, এই বুঝি আবার কথার ঝড় ওঠে। বলি, এবার তাহলে রওনা হই।

তিনি সাগ্রহে বলেন, দাঁড়ান—এক কাপ চা খেয়ে যান, এখনি আনবে।

বলি, আজ থাক, দেরি হয়ে যাবে। ফেরবার পথে বরং পারি তো বসব।

ওয়াংটু থেকে মোটর-পথ ধরেই আজ এগিয়ে চলা। রাস্তা চওড়া করার কাজ চলেছে। নদীর ধার দিয়ে পথ। পাহাড়ের বাঁক ঘুরে ঘুরে সোজা চলে,—চড়াই উৎরাই নেই। পথের আশেপাশে বিক্ষিপ্ত শিলাস্তূপ। দিব্যদর্শী ঠিকই বলেছিল, এ অঞ্চলের পাহাড়ের সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ। শুষ্ক, কর্কশ। কাঁকর, বালি, পাথর। যেন ভস্মমাখা জটাধারী সন্ন্যাসী। নির্মম, নীরস। সেই রুক্ষ পার্বত্য অঞ্চল ভেদ করেও জলধারা নামে। একটা পাহাড়ী নদী বাঁ দিক থেকে নেমে এসে শতদ্রুতে মেশে। ভাবা নদী। এরই খদ ধরে উপরদেশে গেলে স্পিতিতে পৌঁছানো যায়।

ওয়াংটু থেকে মাইল পাঁচ-ছয় যাবার পর পথের পাশেই খানকয়েক ঘর।

ফেগুরাম বাঁশী হারাবার পর থেকেই ম্রিয়মাণ, উৎসাহহীন। কাছে এসে বলে, এই হোল টাপরি। আর নদীর ওপারে ছোলটু। ঐ যে গাছের মধ্যে বাংলো দেখা যাচ্ছে।

জিজ্ঞাসা করি, ওখানেই আজ রাত কাটাব ত?—নদী পার হওয়া যাবে কি করে?

বলে, সেই কথাই বলছি। পোল আছে। কিন্তু আরও আধ মাইলটাক এগিয়ে। কাল আবারও এইখানেই সকালে ফিরতে হবে,—বাঁ দিকের এই পাহাড়ের ওপর উরনি, বেশ চড়াই। টাপরিতে এখানে থাকলে কাল ভোরে উঠেই চড়াই ওঠা যায়,—ছোলটু যাতায়াতের সময়ও বাঁচে।

বলি, তাই ব্যবস্থা করো।

কিন্তু, খোঁজ নিয়েও এ-পারে রাত কাটাবার জায়গা পাওয়া যায় না। মনে হয়, পেলেই ছিল ভাল। আজকের মত পথ চলাও শেষ হোত; কালকের পথেও এগিয়ে রইতাম।

কিন্তু, আরও হেঁটে পুল পার হয়ে ওপারে বাংলোতে পৌঁছে মনে তৃপ্তি পাই। ভাবি, পরিশ্রম করে পাওয়া আনন্দ কতো মধুর!

হিমালয়ের কোলে শতদ্রুর তীরে এ-যে ঋষিকুলের তপোবন। সমতল ভূমি। চারিপাশে নানারকম ফলফুলের গাছ। কতকগুলি ইউক্যালিপ্‌টাস্ গাছও। হয়ত এককালে কোন উৎসাহী ফরেস্ট অফিসার-এর সযত্নে লাগানো। অতি শান্ত মনোরম পরিবেশ। তারই মাঝে কাঠের সুন্দর বাংলো। জনমানবহীন। চৌকিদারও নেই। তাতে ভাবনাও নেই। ঘরের দরজা খোলা।

ফেগু অনেক সন্ধানের পর ফিরে এসে জানায়, চৌকিদারের দেখা পেলাম না, শুনলাম রাতে ফিরবে। কিন্তু তাজা ঘি পেলাম। পরোটা বানাই?—মুখে যেন তার হাসি ফোটে।

সন্ধ্যা কাটাই ফুলে-আলো-করা বাগানে বসে। রাত কাটে অতি-আরামে একঘুমে।

॥ ৯ ॥

মানুষের মন,—যেন রাতের অনন্ত গগন। অসংখ্য তারার মতন ফোটে তাতে আশার স্বপন। ভোরে উঠে ছোলটু ছেড়ে আবার টাপ্‌রি ফিরি। কিন্তু মনে অতৃপ্ত বাসনার বেদনা বাজে। এই ছোলটুরই অনতিদূরে বস্‌পা নদী। শতদ্রুতে এসে পড়ে। বিদেশী পর্যটকদের লেখায় পড়ি বস্‌পা উপত্যকার সৌন্দর্য অপরিসীম। নদীর জল স্বচ্ছ নীল। ঐ নদী ধরে এগিয়ে গেলে, ঘুরে গঙ্গোত্রীর পথে নামা যায়—ভৈরবঘাটির কিছু আগে। মাঝে অবশ্য বরফ-ঢাকা গিরিপথ অতিক্রম করতে হয়, কিন্তু তাও এমন কিছু ভয়াবহ নয়। সেই অচেনা পথ যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। কিন্তু, না, এবার আর ও-দিকে নয়। ভাবি, ভবিষ্যতে? তাও কি হবে? টাপ্‌রি পর্যন্ত ফিরতে হয় না। অপর পারে খানিক চলার পরেই ফেগু বলে, ডাইনে এক পাকদণ্ডী ধরুন, কিছু ওঠার পরই উরনির রাস্তা পেয়ে যাব।

তাই করি। মোটর-সড়ক ছেড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে সোজা উপরে উঠতে থাকি। শুকনা, নেড়া পাহাড়। কোথাও গাছপালা নেই। তবু মানুষের কী অদম্য উৎসাহ। চারিপাশে ক্ষেত তৈরির প্রচেষ্টা। জল পায় কি করে, তাই ভাবি। উপরে উরনির পথে দু'চারজন লোক যায়, মাথা তুলে দেখতে পাই। তাদের ক্ষুদ্র আকার চড়াই-এর গুরুত্ব প্রচার করে। মাথা নীচু করে আপন মনে ধীরে উঠে চলি। সেই রাস্তায় এসে পড়ি। তারপরও পথ ঘুরে ঘুরে ওঠে। উরনির বাংলোতেও অবশেষে পৌঁছুই। টাপ্‌রি থেকে উর্‌নি চার মাইলের চড়াই। প্রায় তিন হাজার ফুট ওঠা। উর্‌নি—৭,৯০০ ফুট।

যেদিকে তাকাই রমণীয় দৃশ্য। বহু নীচে শতদ্রুর উপত্যকা। আকাশে মাথা তুলে চারিপাশে বরফের চূড়া। পাহাড়ের গায়ে পাইন বন। বনের মধ্যেও মাঝে মাঝে তুষার-স্তূপের অনুপ্রবেশ। অল্প বিশ্রামের পরই বেশ শীত বোধ হয়। বাতাসও হিমশীতল। রৌদ্রে বসে আরাম পাই। একদল ছোট ছেলেমেয়ে বাংলোর বাইরে খেলা করে। টকটকে রঙ। সুন্দর স্বাস্থ্য। মনভরা স্ফূর্তি। অথচ, খেলার উপকরণ—ছোট ছোট পাথর, ধূলাবালি, ফেলে দেওয়া টিনের একটা কৌটা।

বেড়ার উপর আমার খদ্দরের ডুরে-কাটা শার্ট শুকায়। বছর নয়-দশের একটি মেয়ে খেলা ছেড়ে সেদিকে আসে। একমনে শার্টের কাপড়ে হাত দিয়ে কি দেখে। কাছে ডাকি। জিজ্ঞাসা করি। ইশারায় বুঝিয়ে দেয়, দেখছে বোনার ধরনটা কি!—পরনে নিজের হাতে বোনা জামা দেখায়।

পি. ডবলিউ. ডি-র বাংলো। যত্ন নিয়ে রাখা। বিছানাপত্রও সব আছে দেখি।

ফেগুরাম তাড়াতাড়ি রান্না সারে। আহার শেষে ক্ষণিক বিশ্রামের'পর আবার পথচলা।

পাহাড়ের প্রায় আট হাজার ফুট উপর দিয়ে পথ। পাহাড়ের মাথা থেকে খাঁজে খাঁজে জলধারা নেমে আসার খদ। এখন অধিকাংশই জলশূন্য। সাধারণ চড়াই উৎরাই। আবার সমান রাস্তাও। দূরে নীচের দিকে দু'একটা গ্রাম। কখন ধীরে ধীরে চড়াই উঠে পথ চলে

আসে পাহাড়ের মাথার কাছাকাছি। সেখানে গাছপালার চিহ্ন নেই। কেবলই পাথর ও মাটি। যেন, টাক-পড়া মাথা। মাটির ধরন ও রঙ দেখে বোঝা যায়,—এ-সব অঞ্চল প্রায়ই বরফে ঢাকা থাকে। পথের পাশে পাহাড়ের গায়ে পাথরের চাপ ঝুলে থাকে—যেন অনন্তনাগের ফণার বিস্তার। তারই নীচে গুহার মত। প্রয়োজন-কালে পথিকের আশ্রয়-স্থল। দেখিও তাই। সেখানে পাথর সাজিয়ে তৈরি-করা উনান, ছড়িয়ে-পড়ে-থাকা ছাই, মসি-মাখা পাথরের গা। চারিপাশে পাহাড়ের রুক্ষ-শুষ্ক আবহাওয়া ও অনাবৃত দৃশ্য তিব্বতের কথা মনে আনে। একটু এগিয়ে দেখি, সত্যই পথের উপর এক তিব্বতী পরিবার। সেই গাঢ় লাল আলখাল্লা পরনে, মাথায় বেণী, কানে মাকড়ি, গলায় রঙ-বেরঙের পাথরের মালা, দাড়ি-গোঁফ-বিহীন লম্বাটে মুখ, বড় বড় ঝক্‌ঝকে সাদা দাঁতের পাটি। আমাকে দেখে চোখ কুঁচ্‌কে মুখ হাঁ করে হাসে। আমিও হাসি। পথের উপরেই রোদের মধ্যে সংসার পেতেছে। অথচ, দেখে মনেই হয় না—পথে বসেছে। উনুন পেতে রান্না হচ্ছে, তামার পাত্র—উপর অংশ সোনার মত ঝক্‌ঝকে, নীচের দিকে জমাট কালি। মেয়ে-পুরুষ—সহজে তফাৎ বোঝার উপায় নেই,—দুটি বাচ্চা,—এমনি ভাবে জিনিসপত্র ছড়িয়ে বসে—এই যেন, এদের ঘরবাড়ী, চিরকালের নিত্যবাস। সঙ্গে প্রকাণ্ড কালো তিব্বতী কুকুর, ভাগ্যে বেঁধে রাখা, নইলে পথ এগোয়, সাধ্য কার। দেখতে যেমন ভীষণ, ডাকও তেমনি। সামান্য কিছু ব্যবসার মালপত্র নিয়ে নীচের দিকে কোথায় চলেছে,—কথা বলে—একবর্ণও বোঝা গেল না। তবু কথাটুকু বলে সে-ও খুশি, আমারও আনন্দ।

এগিয়ে চলি। পথ এবার পাহাড় ঘুরে ওঠে। জঙ্গলের ভিতর ঢোকে। বড় বড় দেওদার গাছ। হঠাৎ যেন গাছের ডালপালা শিরশিরিয়ে কেঁপে ওঠে। মর্মর গুঞ্জরণ তোলে। তারপরেই বিকট অট্টহাসি। যেন সহস্র বাহুর করতালি দিয়ে মন্দিরা বাজায়। ভাবাবেশে গাছগুলি মাথা দোলায়। কোথা থেকে ঝড়ের মত বাতাস ছুটে আসে। গায়ে যেন হিমশীতল তীক্ষ্ণ বাণ হানে। কিন্তু ক্ষণিকের খেলা। হঠাৎ এসে হঠাৎ-ই চলে যায় মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই।

বোধ হয়, পাহাড়ের হাজার দশ ফুটেরও উপর দিয়ে চলেছি। এর পরই ধীরে ধীরে নামা। রোঘীগ্রামে পৌঁছে যাই। উচ্চতা ৯,৩৬১ ফুট। উর্‌নি থেকে চার-পাঁচ মাইলের বেশি মনে হয় না। কিন্তু কে যেন বলেছিল—দশ মাইল!

এখনও অনেক বেলা রয়েছে। স্বচ্ছন্দে চিনি পৌঁছানো চলে। মাত্র আর মাইল তিনেক দূর। তাও চড়াই তো নেই-ই, সামান্য উৎরাই। কিন্তু সেই সন্তোষ দাস নেগীর সঙ্গে পরিচয় করা, কিন্নর-গৃহে রাত্রি-কাটানোর অভিজ্ঞতা লাভ,—এমন সুযোগ ছাড়া কি যায়? গ্রামের নিকটে পৌঁছে সেই কথাই ভাবি।

রাস্তার উপর এক কিন্নর তরুণের সঙ্গে দেখা। মাথায় সেই কিন্নর-টুপি। পরনেও সেই লম্বা কুর্তা, পা'জামা। কোমরে শুধু সেই কাপড় জড়ানো নেই।

সন্তোষ দাসজির খোঁজ করি। বলে, ডাইনে নেমে ঐদিকে ওঁর বাড়ী। কোথা থেকে আসছেন?

ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হয়। নাম,—ক্ষেমসিং কিন্নর। শহরে পড়াশুনা করেছে। এখানকার স্কুলের শিক্ষক। দেখায়, পথের বাঁ দিকে পাহাড়ের গায়ে ঐ স্কুল ঘর। দোতলা একটা বড় বাড়ীও তৈরি হচ্ছে। গ্রামে একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে,—গান্ধী-আশ্রমের

আদর্শে। তাঁরাই স্কুল চালান। নতুন বাড়ীও তুলছেন। গ্রামের লোকেরাই পাথর, মাটি, কাঠ এনে কাজ করছে, ছেলেরাও সাহায্য করে। ক্ষেমসিং দিল্লী ঘুরে এসেছে। ইংরেজীও কিছু জানে। বাইরের অনেক খবরাখবরও রাখে। দিব্যদর্শীর কথা তাকে বলি। বলে, খুব চিনি তাঁকে। গত বছর এইখানে অনেকদিন ছিলেন। এখন নাচারে। কিন্নরদের সম্বন্ধে সব তথ্য সংগ্রহ করছেন। আমরাও এখন এই কাজে লেগে গেছি। নিজেদের ইতিহাস নিজেদেরই লেখা উচিত। আমি এখন সংগ্রহ করছি কিন্নরদের লোকসঙ্গীত। সময় পেলেই গ্রামে গ্রামে ঘুরি। লোকেদের মুখে মুখে প্রচলিত গান শুনে লিখে নিই। অনেক যোগাড় হয়েছে, তা হলেও যা ছড়িয়ে আছে—তার তুলনায় কিছুই নয়। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন? চলুন্ না ঐ পাথরটার ওপর বসা যাক্,—আমিও যাব দশ মিনিট পরেই গ্রামের মধ্যে—

দুজনে তাই বসি। জিজ্ঞাসা করি, কিন্নর-লোকসঙ্গীতের ছাপা বই নেই কোন?

বলে, তাই তো আমার প্রকাশ করার ইচ্ছা। দিল্লীতে দেখে এলাম, ভারতের অন্য প্রদেশেও এভাবে কাজ চলেছে। কিন্তু, কিন্নরদের গান,—তার প্রসিদ্ধি তো জানেনই। গানই যেন তাদের প্রাণ। অথচ, এই সব গানের কিভাবে রচনা হয়, শুনলে অবাক্ হবেন। কোন একজন বা দুজন কবির রচনা নয়। সাধারণ মেয়েপুরুষেরা মুখে মুখে ছড়ার মত এ-সব গাঁথে। বিশেষ করে মেয়েরাই করে খুব বেশি। যে-কোন একটা বিশেষ ঘটনা গ্রামে ঘটলেই হোল,—তখনি কবিতা রচনা। এখানে নাচগান লেগেই আছে, জানেন। ছেলেমেয়েরা মুখোমুখি দুটো লাইন করে নাচতে শুরু করে। হঠাৎ দলের একটি মেয়ে হয়ত গ্রামের এক ঘটনার বিষয় নিয়ে গানের একটা পদ তখনি মুখে তৈরি করে সুর দিয়ে গেয়ে ওঠে, অন্য মেয়েরাও ধুয়া ধরে। ওরা থামতেই ছেলেদের মধ্যে একজন আর এক পদ বানিয়ে গান ধরে, অন্য ছেলেরাও যোগ দেয়, আবার মেয়েরা গানের অন্য আর এক কলি জোড়ে—এই ভাবে গানেরও সৃষ্টি হয়। গ্রাম্যজীবনের ছোটখাটো ঘটনা,—পরদেশী কোন ছেলের সঙ্গে গ্রামের কোন মেয়ের প্রেম হয়েছে,—প্রবাসী প্রণয়ীর বিরহে কোন এক তরুণীর মর্মব্যথা,—কখন হয়ত কোন শোকগাথা, কোনটা আবার ব্যঙ্গচিত্রও,—সাধারণ জীবনের অতি ছোট ঘটনা, তবু কি সুন্দর ছবি,—তারই মধ্যে আবার প্রকৃতির বর্ণনাও,—পাখীর গান, ফুলের সুবাস, ঝরণাধারার হাসি—কতো কী! সংগ্রহ হলে ছাপাবো। দেখবেন তখন কিন্নরদের খাঁটি জীবনকথা কেমন সাধারণ কিন্নর-কিন্নরী মুখে মুখে রেখে যাচ্ছে—কতোকাল ধরে, কে জানে। আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার কি জানেন? দেখছেন তো পাহাড়ের মধ্যে যাতায়াতের অসুবিধে,—এক প্রান্তের গ্রামের সঙ্গে অন্য প্রান্তের গ্রামবাসীদের যোগাযোগ রাখা কতো কঠিন,—অথচ, যেই কোথাও একটা নতুন ভালো গান তৈরি হোল, দেখতে দেখতে ক'দিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে গ্রামে গ্রামে,—সব ছেলেমেয়েদেরই কণ্ঠে সেই একই গান, একই সুর। যারা রচনা করলে তাদের নামও কেউ জানল না,—শুধু গান থেকে গেল লোকের মুখে মুখে চিরকালের জন্য। আপনি থাকুন দু-চার দিন এখানে, শোনাব এর কিছু।

ভাবি, রেডিও নয়, গ্রামোফোন রেকর্ড নয়, সিনেমাও নয়;—কিন্নর কণ্ঠের সঙ্গীত, হবেই তো এর বৈদ্যুতিক গতি, প্রাণে প্রাণে জ্বালিয়ে দেয় আনন্দের জ্যোতি।

ক্ষেমসিংকে বলি, আজ রাতটুকুই এখানে কাটাবার ইচ্ছে। তাই তো সন্তোষ দাসজির খোঁজ করা। আজ সন্ধ্যায় বা কাল সকালে কিছু শুনিও।

হঠাৎ সে সোৎসাহে বলে, আরে! ঐ তো মনমোহন আসছে—সন্তোষ দাসজির ছেলে। আমার 'অ্যাসিস্ট্যান্ট্'। আশ্রম-স্কুলের আমি ম্যানেজার, ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।

বছর ষোল-সতেরোর একটি ছেলে আসে। সাহেবদের মত দেখতে। টকটকে রঙ। গাল দুটি আপেলের মত।

'অশ্বমুখে'র আভাসও নেই। বেশভূষায়ও কিন্নর বলে চেনবার উপায় নেই। মাথায় বিলাতী ধরণের 'বোলার ক্যাপ'। গায়ে উলের বিচিত্র রঙের বুশসার্ট। ফুল প্যান্ট। চোখে নীল চশমা। কাঁধ থেকে ঝোলা ট্রানজিস্টার। নিকটে আসতে ক্ষেমসিং পরিচয় করিয়ে দেন। সে সাদরে জানায়, চলুন এখনি,—বাবা বাড়ীতেই রয়েছেন।

তার কথা শুনে ও আচরণ দেখে নিশ্চিন্ত হই। যাক, শুধু বাইরের বেশভূষারই পরিবর্তন ঘটেছে। তার কারণও তখনি জানতে পারি। ক'দিন আগে সিমলা থেকে ফিরেছে। তার বাবার সঙ্গে গিয়েছিল। এই প্রথম তার অতো বড় শহরে যাওয়া, তাই আধুনিক সভ্যতার খোলসও পাওয়া।

পথ ছেড়ে তাদের বাড়ীর দিকে নামতে যাব, টুংটাং শব্দ শুনে পথের উপর দিকে তাকাই।

একি! আমাদের সেই খচ্চর-বাহিনী! কোন ভুল নেই। চালকের মাথায় সেই বিরাট পাগড়ি, সেই দাঁত-বার-করা হাসি। হেলে-দুলে এগিয়ে আসে। সঙ্গে জানোয়ারগুলি। গলায় ঝোলা ঘণ্টা টুংটাং শব্দ তোলে। যেন, আনন্দের বোল ফোটে,—কারণ, পিঠ তাদের খালি। আসেও উল্টামুখ থেকে। নেমে চলে চিনি থেকে রামপুরের দিকে। আমাকে দেখে গালভরা হাসির ছটরা ছুঁড়ে এগিয়ে যায় নিশ্চিন্ত মনে। ফেগুকে বলি, শীগগির দাঁড় করাও ওকে,—মালপত্র রেখে এল কোথায়? আবার জ্বালালে দেখছি।

দাঁড় করাবে কাকে? ফেগুকে গ্রাহ্যই করে না। চেঁচিয়ে কি যেন বলতে বলতে বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়। ক্ষেমসিংজীকে তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা বোঝাই। তিনি বলেন, ব্যস্ত হবেন না। চিনির একটা দোকানদারের নাম বলে গেল, সেইখানে মাল আছে, টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নেবেন।—চিনি ঢুকেই সে-দোকান, সবাই চেনে। কোন ভাবনা নেই আপনার। চিনির কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় ওরা ফিরে চলেছে তাড়াতাড়ি।

নিশ্চিন্ত হই। সন্তোষ দাসজির বাড়ীর দিকে সবাই নেমে চলি।

গ্রামের মধ্য দিয়ে পথ। ঘুরে ঘুরে এঁকেবেঁকে নামে। দুদিকে কাঠের বাড়ী। কাঠের উপর কারুকার্য। বাড়ীগুলি পরিচ্ছন্ন, পথও জঞ্জালশূন্য। মাঝে মাঝে ফল-ফুলের গাছ। প্রায় প্রতি গৃহেই আঙুরলতা। চারিপাশে পল্লীশ্রীর আনন্দ ছড়ানো। ঠিক এরই বিপরীত পরিচয় পাই—গাড়োয়ালের গ্রামগুলিতে। সেখানে যেমন দারিদ্র্যের ম্লানিমা, তেমনি গ্রামের পথে-ঘাটে আবর্জনার গ্লানি।

পথের পাশেই সুন্দর ছোট কাঠের বাড়ী। সামনে ঘণ্টা ঝোলে। কোন চূড়া নেই, তবু দেখেই বোঝা যায় গ্রাম-দেবতার মন্দির। তারই পাশে সন্তোষ দাসজির বাড়ী। এখানেও বাড়ীর সুমুখ দিয়ে কাঠের উপর সূক্ষ্ম শিল্পকলার নিদর্শন।

পাহাড়ের গায়ে লম্বা বাড়ী। বহু নীচে—বোধ করি হাজার তিন ফুট হবে—শতদ্রুর উপত্যকা। ওপারে গগনস্পর্শী শৈলশ্রেণী। ঘন বনময়।

খবর পেয়ে সন্তোষ দাসজি বেরিয়ে আসেন। লম্বা দোহারা চেহারা। ছেলের মত রঙ

ফর্সা নয়। মাথায় টুপি নেই। কাঁচা-পাকায় মেশানো চুল। পরনে গরম আচকান—ছুব্‌বা চমু-সুতান—অর্থাৎ পা-জামা। টানা চোখ। শান্ত চাহনি। ধীর স্থির গম্ভীর। দেখেই মনে হয় বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি। ব্যক্তিত্বসম্পন্নও। মুখের গড়ন লম্বাটে ধরনের। 'অশ্বের ন্যায় মুখ'—বলা চলে। দেখেই ভাবি, কিন্নর জাতির প্রতিনিধি হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা ধরেন।

দিব্যদর্শীর চিঠিখানি দিই। পড়ে বলেন, চলে আসুন। অতি উত্তম কথা। কতোদূর থেকে আসছেন, এখানে থাকবেন,—আপনার নিজের কোন অসুবিধে না হলেই হোল। —সাদরে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে চলেন। বুঝতে পারি, ছেলেকে বলে দেন চায়ের ব্যবস্থা করতে।

দোতলায় লম্বা ঘর। কাচের শার্সি বসানো দেওয়াল। বাইরের দৃশ্য দেখা যায় ঘরে বসে। কাঠের মেঝে। উপরে মোটা কম্বল ও তিব্বতী কার্পেট বিছানো। জানলার কাছে মাটিতে নীচু চওড়া চৌকি মতন, তারও উপর কার্পেট পাতা, বসাও চলে, শোয়াও যায়। তারই সামনে অল্প উঁচু কাঠের লম্বা টেবিল। চৌকিতে বসে টেবিলে চা ইত্যাদি খাওয়া চলে। তিব্বতী বাড়ীতে এই ধরণের বসবার আসবাব সর্বত্রই। ঘরের আর এক পাশে উঁচু টেবিল, শহর থেকে আনা ফুলকাটা টেবিলক্লথ। চারপাশে গদি-মোড়া চেয়ার, সোফা সেট-এর মত। সেদিকে আধুনিক রীতিতে বসবার আয়োজন। ঘরখানিতে ঢুকেই মনে হয় পিতাপুত্রের বেশভূষায় যেমন প্রভেদ, বাড়ীর মধ্যে আসবাবপত্রের মধ্যেও তেমনি একটা সংমিশ্রণ। কালক্রমে অশ্বমুখেরও পরিবর্তন ঘটে, আশ্চর্য কি?

ঘরে ঢুকেই বেশ ঘরোয়া আবহাওয়ার স্পর্শ পাই। বাইরে শীত, ঘরের ভিতর মনোরম উত্তাপ। সাধারণ পাহাড়ী বাড়ীর ঘরের মতন অন্ধকার ছমছমে ভাব নয়। স্নিগ্ধোজ্জ্বল, আলোয় ভরা। সন্তোষ দাসজির ও তাঁর পরিবারবর্গের আচরণ ও আপ্যায়নেও সহজ আন্তরিকতা। সবেমাত্র পরিচয়, তবু মনে হয়, কতোকালের জানাশুনা, আপন জন। ছেলে ফিরে এসে প্রশ্ন করে, চা খাবেন, লবণ মাখন দিয়ে, না চিনি-দুধ দিয়ে?—বুঝতে পারি, এ বিষয়েও দু'রকমের ব্যবস্থা—তিব্বতী ও এ-দেশী।

সন্তোষ দাসজি বলে দেন, চিনি নয়। মধু,—এখানকার মধু প্রসিদ্ধ।

মেয়েরা এসে চা, বাদাম-ভাজা, চিঁড়ে-ভাজার মত কি আর এক খাদ্য—নাম বলেন, বুঝতে পারি না—ট্রের উপর সাজিয়ে এনে টেবিলে রাখেন। কিন্নরী বেশভূষা। সুশ্রী, রূপবতী। যেন, সাজসজ্জা করে দেবলোকের নাট্য-মঞ্চে নামবেন। অথচ, এই এঁদের স্বাভাবিক প্রকৃতি-দত্ত রূপ, সাধারণ দৈনন্দিন বেশভূষা। নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করেন, হাসেন।

সন্তোষ দাসজি কথা বলেন কম। ইংরেজিতে টাইপ করা সরকারী চিঠি একখানা বার করে দেখান। বলেন, আজই ডাকে এল। এখনও পড়াই নি। বলুন তো কি লিখেছে?

তখন জানতে পারি, ইংরেজি শেখেন নি। উর্দু, হিন্দী ভালই জানেন। নিজে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা না নিলেও, বাড়ীর পুরুষেরা—ভাই, ছেলে—কলেজে শিক্ষা পেয়েছে, দু'একজন গ্রাজুয়েট-ও হয়েছে। ট্রাইবাল্ অ্যাড্‌ভাইসারি বোর্ডের—উপজাতি-উপদেষ্টা সমিতির ইনি একজন বিশিষ্ট সভ্য। প্রায়ই সিমলায় যেতে হয় সমিতির অধিবেশনে যোগ দিতে। দিল্লীতেও গিয়েছেন। সংসদের আলোচ্য কয়েকটি বিষয়ে তাঁর মতামত জানবার জন্যেই এই চিঠি। পড়ে শোনাই। তখন বুঝতে পারি, কিন্নর দেশের ও লোকেদের উন্নতির জন্য

কতো গভীর চিন্তা করেন ও কতো বিভিন্ন পরিকল্পনা মাথায় খেলে। নিজেদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও তার হিতকর গুণাবলী রক্ষা করার সম্বন্ধে যেমন সচেতন, তেমনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষারও উপকারিতা স্বীকার করেন। নিজের সুস্পষ্ট মতামত প্রাঞ্জল অথচ দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করার সাহস ও ক্ষমতা রাখেন। বলেন, সর্বত্রই যে এক ধরণের সেই একই শিক্ষা পেতে হবে, এ নীতি মানি না। দেশ-কাল ভেদে শিক্ষার ধারারও বিভিন্নতা থাকবে। ঠিক এই নিয়মই খাটে এ-অঞ্চলের চাষবাস, ফসল ফলানো সম্বন্ধেও। সব জমিতে বা সব আবহাওয়ায় কি সব কিছুই হয়? এখানে যা সহজে হয়, আর ভালভাবে হয়—তার ওপরই নজর রাখতে হবে।

ভাবি, এ-ও তো সেই চিরন্তন কাল-প্রবাহের গতিশীল ধর্ম। সেই আর্য-অনার্যের, সেই প্রাচীনতা ও আধুনিকতার সংঘর্ষের ভিন্ন আর এক রূপ!

কিন্নর দেশ সম্পর্কে সন্তোষ দাসজির কাছে অনেক কিছুই শুনি।

রোঘী গ্রাম এ-অঞ্চলে নাম-করা। বিশুদ্ধ আবহাওয়া, শীতের দেশ। তাই, মেওয়া—অর্থাৎ আঙুর, বাদাম, বেদানা, ডালিম প্রভৃতি পুষ্টিকর ফল প্রচুর ফলে। চাষও চলেছে গ্রামের চারিপাশে। এ ছাড়া, চুল্লি (বুনো এপ্রিকট্), বাইমি (জংলী পিচ্), আপেল, নেশপাতি (পিয়ার্), পিচ্, প্লাম্, আখরোট ইত্যাদির ফলন ত আছেই। এর মধ্যে কোন কোন ফল শুকিয়ে মেওয়া করে রাখে। চুল্লি ও বাইমি থেকে তেল তৈরি হয়, ব্যবহারও আছে। সন্তোষ দাসজি বলেন, চলুন দেখাই, কতো রকমের আঙুর এখানে লাগিয়েছি। ফলে যেমন অপর্যাপ্ত, ফলগুলিও তেমনি সুপুষ্ট। এ থেকে দ্রাক্ষারস যা তৈরি হয়, তার চেয়ে ভালো আর কোথাও হয় কিনা সন্দেহ। বিদেশে চালান করার ব্যবস্থা হলে দেশের বহু অর্থ উপার্জন হতে পারে। শুধু এই গ্রামেই নয়, এ-অঞ্চলেই হয় ভাল।

হেসে বলি, তাই কিন্নরীদের কণ্ঠ অতো মধুর, নাচ-গানও অতো প্রিয়।

তিনি মৃদু হাসেন। বলেন, শুনুন—তারপর, চিলগোজা। এ তো সর্বত্রই এখানে।

"চিলগোজা? সে আবার কি?"—কুতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করি।

"ও! আপনাকে কেউ বলেনি বুঝি? চারিদিকে যে বন দেখছেন, মাঝে মাঝে যার মধ্যে দিয়ে এলেনও—"

বলি, হাঁ, দেওদার ও পাইন বন, গাড়োয়ালেও খুব আছে—

তিনি হেসে বলেন, এ গাছগুলো একটা বিশেষ শ্রেণীর। এক রকম পাইন বটে—বিদেশী-ভাষায় কি যেন বলে Pinus Gerardiana—না কী! এই গাছেরই ফল,—এখানে বলে চিলগোজা বা ন্যোজা। বাদাম জাতীয়। অতি সুস্বাদু। ফলগুলা লম্বা। পেকে গেলে ওপরের খোলাটা ফেটে যায়। ভেতরে খোসা সমেত কোয়া বা বীচি তখন পাওয়া যায়। লোকে ভেজে বা পুড়িয়ে খায়। এখানকার মুখরোচক ও অতি-প্রচলিত খাদ্যের মধ্যে এটা। খেয়ে দেখবেন, মেয়েরা খাওয়াবে নিশ্চয়।

বলি হাঁ, দিয়েছিলেন তো চায়ের সঙ্গে। ঐ বুঝি চিলগোজা? চমৎকার খেতে।

রাত্রের আহারের কথা জিজ্ঞাসা করেন। নিরামিষের কথা শুনে চিন্তিত হন। বলেন, মাংস খায় না এমন লোক এখানে নেই বললেই চলে।

ভেড়া ও ছাগলের মাংস এদের প্রিয়খাদ্য শুনি।

রাত্রে তবুও আয়োজন ভালই হয়,—রুটি, আলু-টমাটো-শিম-এর সব্জি, দুধ ও মধু।

গুড়েরও প্রচলন আছে। মাখনও ভাল। তবে, দুখ পাওয়া যায় কমই।

গল্প করতে করতে সন্তোষ দাসজি হেসে বলেন, আমাদের দেশের পুরুষদের ওপর কোনকালে কেউ অভিশাপ দিয়েছিলেন হয়ত, কি জানি। দেখে থাকবেন, এখানকার পুরুষরা অলস, বিশেষ কিছুই কাজ করে না, খাটতেই চায় না। মেয়েরাই সব কিছু করে,—এমন কি চাষের কাজও। শুধু ক্ষেত তৈরি করতে মই-লাঙল দিয়ে দেয় পুরুষরা। বিয়ের প্রথাও হোল— সব ভাই মিলে এক স্ত্রী। পঞ্চপাণ্ডবের যেমন ছিলেন দ্রৌপদী। এককালে এ-নিয়মের হয়ত প্রয়োজনও ছিল। এখন এ-প্রথা প্রায় উঠেই গিয়েছে, পুরুষরাও কাজকর্ম করতে মন দিয়েছে। আজকালকার দিনে না করেই বা উপায় কি?

আমিও হেসে বলি, কিন্নরে এসে পর্যন্ত ঊষা-অনিরুদ্ধের কাহিনী শুনছি। তিনিই হলেন দেবী, এমন কি যুদ্ধ করেও রাজ্য জয় করছেন;—মেয়েদের প্রাধান্য ও কর্ত্রীত্ব এখানে ত হবেই।

কিন্নরদের নাচ-গানের উৎসাহের কথাও বলেন। দু'দিন আগে নতুন কিন্নর জেলার উদ্বোধন ও সেই উপলক্ষে চিনিতে উৎসবাদিরও উল্লেখ করেন।

স্বস্তি প্রকাশ করে জানাই, খবরটা রামপুরেই শুনে এসেছি। ভাগ্যি আগে আসি নি! এ বেশ নিরিবিলি শান্তভাবে দেখে যাচ্ছি এই দেশ।

গল্প করে সময় কাটে। রাত্রে নেয়ারের খাটে সযত্নে পেতে দেওয়া শয্যায় শুই। অতি মোলায়েম কম্বল, তেমনি গরমও। আন্তরিক আতিথেয়তার যেন মূর্ত নিদর্শন।

ভাবি, কোথায় সেই শহর কলকাতা আর কোথায় এই হিমাচলে কিন্নর-গৃহ! বাস্তব, না স্বপ্ন?

॥ ১০ ॥

সকাল হলে ভাবনা জাগে, গ্রামের ভিতর লোকজন ঘোরে, চারিদিক পরিচ্ছন্নও, কাছাকাছি পতিত জমিও নেই,—যাই কোথায়?

অগত্যা সন্তোষ দাসজির ছেলেকে জিজ্ঞাসা করি। সঙ্গে নিয়ে দেখিয়ে দেয় জায়গা। পাহাড়ের ঢালু গায়ে ছোট্ট একটা কাঠের ঘর,—যেন বাড়ীর উপরতলায় ঝোলা কুঠরি। কাঠের মেঝেতে মাঝখানে ফুটা। সেই ফাঁক দিয়ে দেখা যায় অনেকখানি নীচে পাহাড়ের গায়ে প্রকাণ্ড গড়ানে পাথর বহুদূর নেমে গেছে। একটা ঝরণার জলধারাও সেই পাহাড়ের উপর দিয়ে অবিরাম নেমে চলে। কোন কিছু সেখানে পড়ামাত্রই বহু নীচে অদৃশ্য হয়, জলে ধুয়েও চক্‌চকে হয়ে থাকে। পাহাড়ের গ্রামে এমন পরিচ্ছন্ন সুব্যবস্থার মনে মনে প্রশংসা করি।

ভাবি, মানুষের প্রয়োজন নিত্য নূতন কতো উদ্ভাবনের প্ররোচক!

মাস্টার ক্ষেমসিংজি ও তার 'অ্যাসিস্ট্যাণ্ট'-এর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গ্রাম দেখি। তার গানের সংকলনও দেখায়। স্কুলেও যাই। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে শ্লেট ও বই হাতে পড়তে আসে। সকলকে দাঁড় করিয়ে ফটো তুলতে চাই। উৎসাহে সবাই জড় হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষেমসিং সারি বেঁধে দাঁড়াতে শেখায়। তুলতে যাব, হঠাৎ একটি ছোট মেয়ে লাইন ছেড়ে

ছুটে চলে যায়। ক্ষেমসিং ডাকে। সে হাত নেড়ে দেখায়,—আসছি। দু' মিনিট পরেই ফিরে এসে আবার দাঁড়ায়,—কোলে তার ছোট্ট কচি ভাইটি,—যেন, রাঙা টক্‌টকে আপেল। গরবিনী দিদির ঠোঁটের কোণে মৃদু মধুর হাসি।

সকালের জলযোগ করিয়ে তবে সন্তোষ দাসজি ছাড়েন। মনে হয়, কতো কালের বন্ধুর বাড়ি থেকে বিদায় নিই।

আবার পথ চলা। যেন, বহুদিন পরে পথে নামা। তবে, আজ সামান্যই তো হাঁটা,—মাত্র তিন মাইল যাওয়া। তাও আবার চড়াই-উৎরাই নয়। প্রায় সমতল পথ। ধীরে ধীরে অল্প নামা। এ যেন সকালে একটু বেড়াতে বেরুনো। পাহাড়ের গা দিয়ে ন' হাজার ফুটেরও উপর উঁচুতে পথ সমভাবে চলতে থাকে। রোদ-মাখা মধুর প্রভাত। সামনে দূরে বরফের পাহাড়। 'দুর্গম দূর শৈলশিখরের স্তব্ধ তুষার।' কিন্নর-কৈলাস! নাম শুনি বহুকাল ধরে ঃ এ অঞ্চলের গিরিরাজ। Ruldung—রুল্‌ডুং শৈলশ্রেণী।

তিব্বতে মানস-সরোবর-তীরের শ্রীকৈলাস সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু হিমালয়ে আরও যে দু' তিনটি গিরিচূড়া কৈলাস নামে পরিচিত চিনি বা কিন্নর-কৈলাস তারই একটি। অবশ্য হিমালয়ের প্রাচীন সাধুসন্ত তিব্বতের কৈলাসকেও প্রকৃত কৈলাস বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে প্রকৃত কৈলাস সাধারণ মানুষের অগম্য, কোথায় তার অবিস্থিতি লোকের অজানা। আবার এ-ও দেখি, হিমালয়ের অনেক সাধু-সন্ন্যাসী যে-কোন উত্তুঙ্গ শিখর-দেশ থেকে নেমে বলেন,—কৈলাস থেকে নামছি। হিমালয়ের তুষার-শিখর,—সর্বত্রই হরপার্বতীর বাসভূমি—সবই কৈলাস।

কিন্নর-কৈলাসেরও স্বর্গীয় শোভা আছে। বাইশ হাজার ফুট উঁচু। তবু, দেখায় যেন আরো কত বিরাট। এখানেও সেই বাণরাজের কাহিনী। প্রবাদ, এই কিন্নর-কৈলাসের শিখর-দেশে রাক্ষসরাজ বাণ শিবের আরাধনা করেন, দর্শনও পান। বাণের তপস্যার প্রণালীও বিচিত্র। শ্রীমদ্‌ভাগবতে শুকদেব বর্ণনা করেনঃ "বাণঃ পুত্রশতজ্যেষ্ঠো বলেরাসীন্মহাত্মনঃ। সহস্রবাহুর্বাদ্যেন তাণ্ডবে তোষয়ন্মৃড়ম্॥"—মহাত্মা বলিরাজের একশত পুত্র, বাণ তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। তিনি সহস্রবাহু তাণ্ডব নৃত্য বিষয়ে বাদ্য বাজিয়ে মহাদেবকে তুষ্ট করেন।

অবাক হয়ে ভাবি, সে কোন্ যুগের কথা, কোন্ সুদূর অতীতে লেখা!—রাক্ষস-রাজের তপস্যার বর্ণনা। এক হাজার তাঁর বাহু। হাজার রকম বাদ্য তাঁর হাতে। নটরাজ তাণ্ডব-নৃত্যে মত্ত। হাজার হাতে হাজার রকম বাদ্য বাজিয়ে বাণরাজ সংগত রাখেন। সদাশিব আশুতোষ তুষ্ট তো হবেনই। কিন্তু, কিন্নরদেশের রাজা, তাঁরও তো প্রধান সম্বল হবারই কথা নৃত্য-গীত-বাদ্য। বাণরাজ—তিনিও কি কিন্নরই ছিলেন?

লোক-প্রবাদ আরও এগিয়ে চলে। বলে, ঐ শিখরদেশে বাণরাজ এক বিশাল শিবলিঙ্গ স্থাপনা করেন। বলার কারণও আছে। কিন্নর-কৈলাসের চূড়ায় খাড়া একটি পাথর, স্তম্ভের মত প্রকৃতই দেখায়। বহুদূর থেকে চোখে পড়ে—বিশেষত কল্পা বা চিনি থেকে। শুনি, সময়-সময় এরই উপর নানা রঙের আলোর বিচ্ছুরণও দেখা যায়।

এখন পথ চলতে দেখি, শুধু রৌদ্রদীপ্ত তুষার-শিখর। মাথার উপর সূচ্যগ্র স্তম্ভের মতন। পথের বাঁ দিকেও উঁচু পাহাড়। মাথায় সামান্য বরফ-ঢাকা। পাহাড়ের গায়ে বড়

বড় দেওদার গাছের ঘন বন। বন শেষে ঢালু গা যেন ছড়িয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ সমতলভূমির আকারে। সেখানে গাছপালা বিরল। বিশাল মালভূমি। তারই উপর ছড়ানো ঘরবাড়ী। চিনি শহর,—নতুন নাম কল্পা।

দূর থেকে সুন্দর দেখায়। গিরিরাজ যেন শুভ্রকেশ পিতামহ। অঙ্গে সবুজ উত্তরীয় জড়িয়ে কোল পেতে রোদে বসেন। পৌত্রী কল্পা কোলে শোভা পায়। শান্ত, স্তব্ধ, সুখাসীন, সুন্দরী বালিকা। বিস্মিত নয়নে একদৃষ্টে সে যেন তাকিয়ে থাকে দূরে সামনে আকাশ-জোড়া কিন্নর-কৈলাসের দিকে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি, বালিকার না চমক্ ভাঙে।

গ্রাম নিকটে আসে। কর্মময় মানব-জীবনের মৃদু মন্দ তরঙ্গিত প্রবাহ দেখি। ক্ষেত-খামারে মেয়েরা কাজ করে। ঝরণা থেকে জল আনে। সবারই রঙিন বেশ-ভূষা। মাথায় রঙিন টুপি। সুশ্রী চেহারা। মুখে হাসি। মাঝে মাঝে গানের সুর ভেসে আসে। মাঠের মধ্যে কয়েকটা ঝব্বু ও চামরী ঘোরে। যেন তিব্বতের বার্তা আনে। চারিদ্দিক শান্ত সুন্দর। জগৎ যেন শোক-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ-শূন্য। ভাবি সভ্য জগতে অতো বিদ্বেষ বিদ্রোহ যুদ্ধ-বিগ্রহ রক্তারক্তি কেন?

বাড়ীঘর শুরু হয়। দু'একটা দোকান-পাটও। শহরের রাস্তা দিয়ে খচ্চরের দল আসে। দেখেই মনে পড়ে, ঠিক ত? আমাদের মালপত্র? কোন্ দোকান থেকে নিতে হবে?

ফেগুরামকে ডেকে বলি। সন্ধান নিয়ে দোকানও বার হয়। দোকানদার বিদেশী। বড় দোকান। এক কোণে মালপত্র দেখতে পেয়েই পরম নিশ্চিন্ত বোধ করি। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যই। কাগজ দেখিয়ে মাল চাইতেই দোকানদার জানায়,—ত্রিশ টাকা দিন,—মাল নিয়ে যান।

ত্রিশ টাকা! কথা ছিল ত আঠারো! দোকানদারকে বলি।

সে অম্লান বদনে বলে, তা আমি কি করে জানব বলুন? সে লোকটা বলে গেছে, ত্রিশ টাকা নিয়ে মাল দেবে,—পুরো টাকা না পেলে মাল আমি ছাড়ি কি করে?

কাগজটা দেখতে বলি। পড়তে পারে কিনা জানি না, কিন্তু বলে, ত্রিশ টাকাই লেখা আছে।

তবে কি আমারই শোনবার ভুল? না, এরাই কেউ ঠকিয়ে নিচ্ছে? দোকানদারের সেই এক কথা, ত্রিশ টাকা না দিলে মাল দেব না।

অতগ্যা দিতেই হয়। হিন্দীতে রসিদও করিয়ে নিই,—সেই কাগজটারই উপর। কিন্তু মনে খটকা লেগে থাকে হয়ত ঠকিয়েই নিল। রামপুরে যদি শুনতাম, ত্রিশ টাকা লাগবে, কিছু বেশিই মনে হোত না, এতখানি পথ, হয়ত তাই ঠিক রেট। কিন্তু কথা হোল—আঠারো,—আর দিতে হোল ত্রিশ! টাকা হারালে মনে দুঃখ জাগতে পারে, কিন্তু সেই টাকাই কেউ ঠকিয়ে নিলে মনে অস্বস্তিকর গ্লানি ভরে ওঠে।

তাই ব্যাপারটা ভুলি না। ক'দিন পরে রামপুরে ফিরে বলিজির সঙ্গে আবার দেখা হয়, কথাটা তুলিও। তিনিও শুনে আশ্চর্য হন, বলেন, সে কী! আঠারো টাকাই ঠিক হয়েছিল। দেখি কাগজটা—দেখেই বলেন, এই ত আঠারো লেখা। অথচ রসিদ দিচ্ছে এখানে ত্রিশ টাকার। দাঁড়ান, দেখাচ্ছি ব্যাটাকে একবার।

আমি ব্যস্ত হয়ে বলি, থাক,—ও নিয়ে আর অশান্তির সৃষ্টি করবেন না। গেছে ক'টা টাকা,—যেতে দিন।

তিনি ছাড়েন না। চাপরাসী পাঠিয়ে লোকটাকে ডাকিয়ে আনেন। সেই ঝাঁকড়া-চুল লোকটা আসেও। বলা মাত্রই বারোটা টাকা বার করে ফেরত দেয়। বলিজি রেগে ধমক দেন, গালি-গালাজ করেন।

লোকটা কিন্তু তেমনি নির্বিকার, দাঁত বার করে তেমনি হাসে। ভাবটা যেন, এত হৈচৈ কীসের? হয়েছেটো কি? আশ্চর্য মানুষ!

॥ ১১ ॥

পুরানো চিনি গ্রাম ছাড়িয়েই কল্পা। দুটোয় মিলিয়ে বেশ বড় গ্রাম। এখন চিনি নাম উঠে গিয়ে সবটাই কল্পা। পাহাড়ের কোলে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। একদিকে পাহাড় মাথা তুলে শিখরদেশে ওঠে, আর একদিকে পাহাড়ের ঢালু গা গ্রাম ছেড়ে ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামে শতদ্রুর উপত্যকায়। যেন, সোপান বেয়ে। পাহাড়ের সারা বুকে চাষের জমি। খেতের পর খেত ধাপে ধাপে নেমে চলে সেই নদী পর্যন্ত। মাঝে মাঝে ফলের বাগান। ছোট ছোট গ্রাম। পাহাড়ের কোলে নিশ্চিন্ত আরামে যেন ঘুমিয়ে থাকে। নদী থেকে প্রায় তিন হাজার ফুট উপরে কল্পা। উচ্চতা, ৯,২৩৮ ফুট। সিমলা থেকে যে হিন্দুস্থান-তিব্বত-রোড দিয়ে এলাম—তাতে দূরত্ব ১৩৯ মাইল। খোলা জায়গা। তার উপর নদীর অপর পারে সুমুখেই তুষারময় কৈলাস গিরিশ্রেণী। অতি শীতবোধ হওয়া স্বাভাবিকই।

ফরেস্ট রেঞ্জ-অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে সোজা যাই। ভদ্রলোক ঘোড়ার উপরে সওয়ার হচ্ছেন, দেখি। এখনি ট্যুরে রওনা হবেন, দিন সাতেক পরে ফিরবেন। বলি, খুব সময়মত ধরেছি তো? আর এক মিনিট পরে এলেই দেখা পেতাম না।

ঘোড়ার উপর থেকেই কথা বলেন, আর দেখা না হলে আপনার থাকবার ব্যবস্থারও মুশকিল হোত। মিলিটারী ও পুলিসের অফিসাররা অনেকেই এখন এখানে,—ফরেস্ট রেস্ট-হাউস, ডাকবাংলো সবই তাঁদের দখলে। যাক্ আমাকে খুব পেয়ে গেছেন,—আমি তো চললাম এখনি। ঐ ঘর খালি পড়ে থাকবে, খুলে দিতে বলছি। কিন্তু, আমি রইলাম না—ঘোড়া থেকে নামবারও সময় নেই—আপনার দেখাশোনার হয়ত অসুবিধে হবে, অবশ্য আমার যে লোকটা থাকবে এখানে, তাকে বলে যাচ্ছি।

ধন্যবাদ দিয়ে জানাই, থাকবার ব্যবস্থা হয়ে গেল, আবার কি? আপনি থাকলে আলাপ করার আনন্দ পেতাম—কিন্তু আপনাকে আর আট্‌কাবো না, ঘোড়া আপনার বিলম্ব দেখে বিরক্তি প্রকাশ করছে,—রওনা হোন, ভাল ভাবে ঘুরে আসুন।

বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে তিনিও যাত্রা করেন।

নতুন বাড়ী। ঘরটিও পরিচ্ছন্ন। জিনিসপত্র খুলে বসি। ফেণ্ডুকে বলি রুটি, চাউল—যা খুশি বানাও। চমৎকার রোদ বাইরে। ঘণ্টাখানেক ঘুরে আসি।

যাবার বিশেষ উদ্দেশ্যও থাকে। অযথা ঘরে বসে লাভ কি? হাতে সময় রয়েছে।

দিব্যদর্শীর কাছে শুনেছি, এখানে গত বছর এক বাঙালী শিক্ষক ছিলেন স্কুলে ; সম্ভবত এখনও আছেন। লেফ্‌টেনেন্ট মিত্র।

ভাবি, গিয়ে খবর নিই, থাকলে আলাপ করে আসি।

গ্রামের মধ্যে দিয়ে আসার সময় স্কুলবাড়ী দেখেছি। তাই আর খুঁজতে হয় না। খোলা জায়গায় লম্বা দোতলা বাড়ী। সামনে খেলার মাঠ। দুটি ছেলেকে সেখানে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করি, লেফ্‌টেনেন্ট মিত্র—মাস্টারজি?—বলে ভ্রূ কুঁচ্‌কে মাথা উঁচিয়ে বোঝাই,—কোথায়?

দুজনেই সোৎসাহে সঙ্গে করে নিয়ে চলে। লম্বা করিডর। সারি সারি ক্লাসরুম। একটা ঘরের দরজার নিকটে এসে তফাৎ থেকে আঙুল দেখিয়ে পিছন ফিরে পালায়।

দরজার সুমুখে এগিয়ে যাই। ক্লাস চলছে। ছাত্ররা বেঞ্চে বসে। মাস্টারমশাই বোর্ডের কাছে। পেশিবহুল বলিষ্ঠ দেহ। শ্যামবর্ণ। দাড়ি-গোঁফ কামানো। প্যান্ট-কোট পরনে। মুখ দেখে বাঙালী মনে হয়। আমাকে দেখে বেরিয়ে আসেন। হাতে চক্‌-খড়ি। কোন প্রশ্ন করার আগেই বলি, ক্লাস নিচ্ছেন। শেষ হোক। বাইরে অপেক্ষা করি। পরে আলাপ করা যাবে।

আশ্চর্য হয়ে তিনি বলেন, আরে! বাঙালী আপনি? এখানে কোথায়? কোত্থেকে এলেন? গভর্ণমেণ্টের কোন দপ্তরে নিশ্চয়?

"না। এমনি শুধু বেড়াতে। কিন্তু আর কথা নয়,—ক্লাস শেষ করুন আগে, তারপরে পরিচয় করব আপনার ফুরসত বুঝে।"

মুখে চোখে তাঁর আনন্দ ফুটে ওঠে। বলেন, আরে মশাই, ক্লাস তো রোজই নিচ্ছি,—নেবোও,—না নিলেও ছেলেদের কোন লোকসান নেই,—যা পড়বার চাড়! চলুন ওপরে আমার ল্যাবরেটারীতে,—কিন্তু আপনি এসেছেন কবে? উঠেছেন কোথায়? থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে? মিলিটারীর যা ভিড় এখন এখানে—সবই তাদের দখলে। আমি আছি একটা ছোট্ট ঘরে—অবশ্য একা—দরকার বোঝেন তো চলুন, সেইখানেই কোনমতে কাটাবেন—

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে চলেন, ফাঁক দেন না কোন কিছু বলতে।

অগত্যা বাধা দিয়ে বলি, আগে ক্লাসটা শেষ করুন, তারপর কথা হবে। ব্যস্ত হবেন না,—থাকবার ব্যবস্থা ভাল ভাবেই হয়েছে।

তিনি বলেন, না, না,—চলুন ওপরে—কতোকাল পরে দুটো বাংলায় কথা বলা যাক। ক্লাসের জন্যে ভাববেন না,—এইমাত্র বোর্ডে অঙ্ক দিয়েছি—করুক ছেলেরা।

ভিতরে গিয়ে ছেলেদের সেই মত জানিয়ে তখনি ফিরে আসেন। উপরে নিয়ে চলেন। ঘরে ঢুকে বলেন, এই হোল স্কুলের ল্যাবরেটারী,—এই চারটে শিশি, আর কিছুই নেই, গড়ে তোলবার চেষ্টা শুরু হয়েছে, শেষ পর্যন্ত হবে কিনা কেউ বলতে পারে না; এখানকার কর্তারা এখন যাঁরা আছেন, তাঁরা একেবারে—

বাধা দিয়ে বলি, ছেড়ে দিন তাঁদের কথা। আপনার কথা এখন শুনি। এখানে হিমালয়ের এই সুদূর অঞ্চলে এসে পড়লেন কি করে?

এইভাবেই পরিচয় শুরু হয়।

কিন্তু বেশি এগোবার আগেই এক বেয়ারা এসে হাজির।—হেডমাস্টার সেলাম দিয়েছেন—জরুরী তলব।

মিত্রও গম্ভীরভাবে জবাব দেন, বলো গিয়ে আমারও জরুরী কাজ এখানে, যেতে পারব না।

অস্বস্তি বোধ হয়। মোলায়েম ভাবে বলি, আমি বরং একটু অপেক্ষা করছি,—যান না, শুনে আসুন।

তিনি বলেন, ডাকছে নিজেরই গরজে। হঠাৎ সদরে ছুটছেন, নতুন একটা চাকরি বা বদলির তদ্বির করতে। আমাকে চার্জ দিয়ে যেতে চান। আমি যেন নিলেই হোল আর কি! খেয়েদেয়ে কাজ নেই, এখানকার ঝক্কি পোয়াতে হবে আমাকে? কি দরকার মশাই, এ-সব ঝঞ্ঝাটে? নিজের খুশিমত খাইদাই বেড়াই, নিজের এখানকার কাজটুকু করে যাই,—স্কুলের দায়িত্ব আমি বইতে যাব কেন?—তারপর, গলা নামিয়ে বলেন, কোন বিশ্বাস নেই, মশাই, খাতাপত্রে হিসাবে গণ্ডগোল করে পালাচ্ছে কিনা, তাই-বা কে জানে?

বলি, যান, একবার কথা বলে আসুন তাঁর সঙ্গে—হাজার হোক, হেডমাস্টার। আমি বরং এখন উঠি, খাওয়া-দাওয়া সারি। বিকেলে স্কুলের ছুটির পর আমার ওখানে চলে আসুন, একসঙ্গে চা খাওয়া যাবে।

তাই ঠিক হয়। ঘরে ফিরি।

বিকেলবেলা। মিত্র আসেন। হাতে একটা মোড়ক। খুলে টেবিলের উপর রাখেন। এক প্যাকেট রাস্‌ক, আখরোট, বাদাম। বলি, এ-সব কেন? চা খেতে বললাম আমি, আর এ-সব আনলেন আপনি? আমার সঙ্গেও বিস্কুট এনেছি।

তিনি বলেন, এলেন এখানে বেড়াতে। বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখাই উচিত ছিল, কিন্তু এত ছোট জায়গা—দেখবেন পরে আজই—অসুবিধে হোত আপনার। দেশের লোক এলেন,—কিন্তু এ জঙ্গলে কি আর কিছু পাওয়া যায় যে আনব? যা ছিল কাছে—নিয়ে এলাম। আপনার বিস্কুট খরচ করবেন না, রেখে দিন—পরে কাজ দেবে।

চা খেতে খেতে গল্প চলে। কি ভাবে এই দূর দেশে এসে পড়েন, তাও শুনি।

কাশীতে বাড়ী। কলেজে কিছুদূর পড়াশুনার পর শিক্ষকতা শুরু করেন। চাকরি পেয়ে চলে যান যোধপুরে। বলেন, সেখানে একবার প্রাণ হারিয়েছিলাম আর কি! চাকর ছিল একটা দুর্ধর্ষ, হঠাৎ একদিন দিলে আমার পিঠে ছুরি বসিয়ে,—তার পর বেশ কিছুকাল হাসপাতালে পড়ে থাকা, কিন্তু বেঁচে গেলাম। জামা খুললে এখনও দেখতে পাবেন, কি প্রকাণ্ড কাটা দাগ থেকে গেছে।

আমি বলি, আশ্চর্য! লোকটার সাহস কম নয় তো? আপনার এই চেহারা—

তিনি বলেন, শুনুন তার পর। উঠলাম বটে বেঁচে, কিন্তু ওদিকে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল, গাড়োয়াল রাইফেলস রেজিমেন্টে যোগ দিলাম, অফিসারও হলাম। নানান জায়গায় ঘুরতে হয়। একবার পাঠালো সিলোনে—সিংহলে, convict pioneer regiment-এর সঙ্গে।—মশাই, সে রেজিমেন্ট গড়া কিভাবে, শুনবেন? জেলের যতো কয়েদী—তাদের বার করে এনে গড়েছে। চোর, ডাকাত—এ-সব ত আছেই, খুন করেছে এমনও কয়েকজন। একজন ত বুক ফুলিয়ে জাহির করতো—পাঁচ-পাঁচটা মানুষকে কেটে সাবাড় করেছে। লোকগুলোর চেহারা কি! এক-একটা যমদূত। মেজাজও তেমনি। কথায় কথায় মারপিট। আমি থাকতে থাকতেই রেজিমেন্টের মধ্যে দুটো খুন হোল। একটার ধড় আর মুণ্ডু—একেবারে আলাদা,—বীভৎস দৃশ্য—

একটু চুপ করে থেকে যেন শিউরে ওঠেন, আস্তে আস্তে বলেন, খাসা আছি মশাই এখানে। এ-অঞ্চলে কোথাও কখনও ও-সব খুনোখুনির ঘটনা শুনতেই পাবেন না। কি সুন্দর শান্ত লোক এখানকার। যেমন বনজঙ্গল পাহাড় বরফ—তেমনি মানুষও।

বলি, তা এখানে এলেন কি করে?

ওঃ! সেটা মনে হয়, ভাগ্যের কথা। যুদ্ধ থেমে গেল। আর্মির কাজও ছেড়ে দিলাম। হিমাচল প্রদেশে মাস্টারি চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করলাম, পেয়েও গেলাম। এই ত তিনটে বছর কেমন কেটেও গেল। কিন্তু শুনুন—কাজের কথা। কাল বিকেলে এখানে রান্নাবান্না নয়, আমার ওখানে খাবেন।

আপত্তি জানাই, কেন আবার ও হাঙ্গামা করা? নিজেই রাঁধের ত?

মিত্র ছাড়েন না। বলেন, নিজে করি না ত করবে কে? হাঙ্গামা কিছুই নয়। খুব 'সিমপল মেনু'—শুধু ঘি-ভাত আর মাংস। হরিণের মাংস যোগাড় হয়েছে আজই—

মাংস চলে না শুনে নিরাশ হন। বলেন, সে কী! অমন উপাদেয় খাদ্য,—খান্ না? আচ্ছা, তাহলে রাঁধব—mushroom—আপনারা যাকে বলেন, ব্যাঙের ছাতা,—সে ত আর আমিষ নয়? জানেন না নিশ্চয়,—এই চিনি অঞ্চলে একরকম মাশরুম মেলে, এ রকম আর কোথাও পাবেন না। সংগ্রহ করা খুবই শক্ত—পাহাড়ের ওপর দিক থেকে আনা। আবার চেনাও আরও কঠিন। এরই এক শ্রেণী আছে খেলেই দেখতে হবে না—অল্পক্ষণের মধ্যেই সব শেষ!

হেসে ওঠেন। বলেন, না—না, ভয় নেই। ভাল করে দেখেশুনে ও-সব আনাই। পাওয়া যায়ও কম। অনেক মেহনত করে লোকে যোগাড় করে চালান দেয় সিমলায়। সেখানে বড় বড় সাহেবী হোটেলে এ একটা মহা উপাদেয় ও লোভনীয় ডিশ,—দামও নেয় প্রচুর। ঠিক আছে, কাল খাওয়াবো, দেখুন না কেমন! আর মিষ্টিও ত কিছু একটা করতে হয়? সুজি আছে, মোহনভোগও করা যাবে ; খুব ভালো ঘিও যোগাড় করা আছে।

হেসে বলি, নিজে ছুরির ঘা খেয়েও—অমন রেজিমেণ্টে কাটিয়েও—ফিরে এসেছেন, এবার এই অহিংস কিন্নরদেশে আমাকে খাইয়েই সাবাড় করবেন নাকি!

তিনি বলেন, চলুন কাল,—কেমন রাঁধি দেখুন।

দুজনে বিকেলে গ্রামের মধ্যে ঘুরি।

মিত্রকে সবাই 'মাস্টারজি' বলে অভিবাদন করে। তিনি গম্ভীরভাবে হাত তুলে বা ঘাড় নেড়ে প্রত্যভিবাদন জানান। লোকজনের মধ্যে তিব্বতী ও বৌদ্ধ প্রভাব বেশি মনে হয়। পাহাড়ের শুক্‌নো খট্‌খটে আবহাওয়া। তবু তারই মাঝে আপেল নেশপাতির গাছ। শুনি, মোরাভিয়ন মিশনের পাদ্রী ব্রোস্কী এই শতকের প্রথম দিকে এখানে থাকতেন। তিনিই নাকি হল্যাণ্ড থেকে আপেল নেশপাতির চারা এনে বাগানে লাগান, এবং তাই থেকে ক্রমে সারা চিনিতে এই ফলের চাষ ছড়িয়ে পড়ে। চুলি ও চেরি ফলও এখানে প্রচুর হয়।

গ্রামে হাসপাতালও আছে। স্কুলবাড়ী এখন যে জায়গায়, আগে সেখানে একটা দুর্গ ছিল ; এখনও তার চিহ্ন দেখা যায়।

মিত্রকে বলি, এখানে ভাল পশমিনা চাদর পাওয়া যায় শুনেছি। দামও হয়ত কম?

মিত্র বলেন, সে-সব দিন কি আর আছে? এই হিন্দুস্থান-তিব্বত রোড দিয়ে ইয়ারকণ্ড,

খোটান থেকে দলে দলে ব্যবসায়ীরা আসত ভেড়া-ছাগল-ঝব্বুর পিঠে উল পশমিনা নিয়ে,— শিপকি পাশ দিয়ে ভারতে ঢুকে এই রাস্তা ধরত। এখন সে-সব বন্ধ। পশমিনা ও উল এই চিনি-অঞ্চলেও তৈরি হোত। পাওয়াও যেত। এখন সব উল চালান যায় সেই রামপুরে— সেইখানে চাদর ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে, মেলায় খুব বিক্রী হয়।

শুনে নিরাশ হই। তবু বলি, খোঁজ করে একটাও যোগাড় করা যায় না? আমি অবশ্য দেখলেও চিনব না—কেমন জিনিস, দামই বা কি হওয়া উচিত।

মিত্র বলেন, আচ্ছা খোঁজ নেবো,—যদি একটা পাওয়া যায়, দেখি।

পরামর্শ দেন, পরদিন সকালে কোঠিগ্রাম দেখে আসতে। তারপর, বিকেলে তাঁর আস্তানায় চা ও সন্ধ্যায় আহার।

॥ ১২ ॥

বাংলো থেকে কিন্নর-কৈলাসের শোভা দেখি। মন মুগ্ধ হয়। শুধু বাংলো কেন? সারা চিনিগ্রাম থেকেই সুন্দর দেখায়। সকল সময়েই সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে গিরিরাজ; আনত নয়নে তুষারোজ্জ্বল দৃষ্টি।

সকালে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ি কোঠিগ্রামের উদ্দেশে। কল্পা থেকে নামতে হয় শতদ্রুর দিকে। মাইল দুই মাত্র দূর। উপর থেকেই গ্রামের বাড়ী ঘর মন্দির পুষ্করিণী দেখা যায়। সবখানি উৎরাই। তাই পৌঁছুতেও বেশি সময় লাগে না।

নূতন কিন্নর জেলার পত্তন হওয়ায় কোঠিগ্রামের প্রাধান্য বাড়বে মনে হয়। গত সেনসাস রিপোর্টে লেখে—১২৮ ঘর লোকের বাস, জনসংখ্যা ৭৮৬। তাকিয়ে দেখি,—আরও দু'মাইল নীচে শতদ্রু। তারই কোল ঘেঁষে এগিয়ে আসে নতুন-তৈরি বাস্‌পথ। সে-পথও নিয়ে যাবে শিপ্‌কি পাশ-এ তিব্বতের দিকে। তখন উপরে প্রাচীন হিন্দুস্থান-তিব্বত রোড পড়ে থাকবে— পরিত্যক্ত জরাজীর্ণ বৃদ্ধের মত। দীর্ঘ জীবনের কাজ ফুরাবে তার। এদিকে কল্পার চেয়ে কোঠি বাস্‌-পথের নিকটতর হবে। তাই হঠাৎ-হওয়া-বড়লোকের সান্নিধ্য পেয়ে হয়ত তারই মর্যাদা বাড়বে। এ-অঞ্চলের মূল কেন্দ্র গড়ে উঠবে এখানেই। এর এলাকা তখন ছড়িয়ে পড়বে—এই পাহাড়ের বুক জুড়ে ছয় হাজার ফুট থেকে উঠে ন'হাজারেরও বেশি উঁচু পর্যন্ত,—শতদ্রু থেকে সেই কল্পা। নতুন শহর গড়ে তোলার মত স্থানও বটে। পায়ের নীচে শতদ্রু, সুমুখেই পূর্বদিকে কিন্নর-কৈলাস। আবহাওয়া বিশুষ্ক হলেও চারিপাশে খেত। পর্যাপ্ত জল পাওয়ার প্রশ্ন থেকেই যায়। পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে আসা বরফগলা কয়েকটা ঝরণাধারা তাই সম্বল। বৃষ্টি এ-সব অঞ্চলে বিশেষ হয়ই না। কিন্নরের নাচার এলাকা যেমন বর্ষা-প্রধান, ঘনশ্যাম অরণ্যে ছাওয়া রোঘী-চিনি কল্পা-কোঠি অঞ্চল ঠিক তার বিপরীত,—শুষ্ক, রুক্ষ, বর্ষা-বিরল। তবু, মানুষের উদ্যম, উৎসাহ দুর্দমনীয়, প্রাণধারণের আশায় প্রাণান্তকর পরিশ্রম। পাহাড়ের বন্ধুর ভূমি সমতল করে, শিলাস্তূপ সরিয়ে চাষের জমি তৈরি করে, ঝব্বু এনে লাঙল দেয়। খেতে ফসল ফলে—যব, গম, ফাপ্‌রা, ওগ্‌লা। ভুট্টাও হয়। আরও স্থানীয় ফসলের নাম শুনি,—চিনা, কোদা, কালা, বথু ইত্যাদি।

এ-অঞ্চলেও শীতের প্রখরতা। শীতকালে গ্রামবাসীরা কেউ কেউ হিমাচল প্রদেশের নিম্নদেশে—বিলাসপুর, মহাসু, মণ্ডী প্রভৃতি জেলায় নেমে গিয়ে থাকে। সঙ্গে ভেড়া-ছাগলও যায়,—তাদের নিয়েই বেশি ভাবনা,—এখানে তখন চরে খাবার কিছুই থাকে না।

কোঠি থেকে পাহাড়ের উপর দিকে তাকাই। ধাপে ধাপে চাষের খেত,—যেন গিরি-ভাণ্ডারে থাকে থাকে সাজানো শস্যসম্ভার।

পাহাড়ের শুষ্ক নগ্ন দেহে সবুজের শোভা। ভাবি, এ যেন বিভূতি-বিভূষিত, ধ্যানমৌন, নিরাবরণ যোগিরাজ হিমালয়, ভক্তদল তাঁরই নীলকণ্ঠে পরিয়ে দেয় শ্যামস্নিগ্ধ বিল্বপত্রের মাল্যগুচ্ছ।

কোঠিগ্রাম প্রাচীনতার দাবী রাখে। কিন্নর-মুখে নাম শুনি কোষ্ঠাম্পি। এখানকার প্রসিদ্ধ মন্দির,—দেবী চণ্ডিকার। সারা কিন্নর দেশে এঁর বিপুল খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। কোঠিগ্রামবাসিগণের মধ্যে চণ্ডিকাদেবীর এক অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত। তার মধ্যে কোন ঐতিহাসিক তথ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিনা জানি না। তবে দেখা যায়, এ-কাহিনীর মধ্যেও কিন্নর জাতির জন্মকথার মত দেবতা, রাক্ষস ও মানুষের বিচিত্র সংমিশ্রণ। কিন্নর-কিন্নরী—দেবযোনিসম্ভূত, এই প্রবাদ। অথচ আবার কিন্নরদেশের রাজা ছিলেন—রাক্ষসরাজ বাণ। এ-কাহিনীর ধারাও অনুরূপ।

দেবী চণ্ডিকার জন্ম সুংরা গ্রামের নিকটে এক গুহায়। সেই গুহার মধ্যে বাস করত একদ্বেত নামে এক রাক্ষস ও তার স্ত্রী হির্‌মা দেবী। তাদের তিন পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রদের তিনজনেরই পরিচয় মহেসুর নামে। কন্যার নাম চণ্ডিকা। আবার আর এক মতে, চণ্ডিকা মহেসুরদের ভগিনী ছিলেন না। হির্‌মার নাকের ভিতর দিয়ে তাঁর গর্ভে প্রবেশ করেন ও পরে আবির্ভূতা হন।

যাই হোক, পিতা একদ্বেতের মৃত্যুর পর তিন ভাই-এর মধ্যে রাজ্যভাগ নিয়ে বিবাদ বাধে। চণ্ডিকা মহাভারতের কাহিনী শুনিয়ে এ-বিবাদের বিষময় ফল দেখান ও বিবাদ করতে নিষেধ করেন। মহেসুররা চণ্ডিকাকে মধ্যস্থ হয়ে বিষয় ভাগ করে দিতে বলে। সন্ধ্যায় তিন ভাই নেশায় বিভোর। চণ্ডিকা দেবী সেই সুযোগে তিনটে সমান ভাগ করে দেন। সুংরা মহেসুর পেল—আঠার বিশ। ভাবা খদ গেল দ্বিতীয় ভাই-এর কাছে, নাম হোল তার ভাবা মহেসুর। ছোট ভাই পেল রাজগ্রামং। ওদিকে রোঘী, কলপা, কোঠি, পাঙ্গী ইত্যাদি নয়টা গ্রাম চণ্ডিকা দেবী সরিয়ে রাখলেন নিজের জন্যে। দেবী হলে হবে কি? রাক্ষস-গৃহে বাস!

সেই সময়ে কল্‌পাতে দশরাম নামে এক ঠাকুর রাজত্ব করে। তার স্ত্রী তখন সন্তান-সম্ভবা। গণক এসে জানায়, পুত্র জন্মালে শুভফল। কন্যার জন্ম হলে পিতার রাজ্য যাবে। পিতার দুর্ভাগ্য—হলো কন্যাই। ঠাকুর তখনি তাড়াতাড়ি পুঁতে ফেলেন অভাগিনী মেয়েটিকে। কিন্তু অদৃষ্টের লিপি খণ্ডন করে সাধ্য কার? চণ্ডিকা সংবাদ পেয়েই চলে আসেন। মেয়েটিকে উদ্ধার করে প্রাণ বাঁচান। পিতা দশরামের আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেন। কিন্তু, দশরাম শিবের বরপ্রাপ্ত। কোনমতেই তার প্রাণনাশ হয় না; মাথা কাটলেও আবার মাথা গজায়।

দেবী চণ্ডিকা ক্লান্ত হয়ে ভাইদের নিকট সাহায্যভিক্ষা চান। বিষয় ভাগে তাঁর অন্যায়

আচরণ প্রকাশ হয়ে পড়ায় দু'ভাই বিরূপ হয়ে থাকেন, শুধু বড় ভাই সুংরা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। যুদ্ধের সময় সুংরা দেখতে পায় ছিন্ন মুণ্ডের কাছে ভ্রমর ওড়ে ও অমৃতরস এনে দশরামকে বাঁচায়। দেবী সেই ভ্রমরের প্রাণনাশ করেন, দশরামও মরে।

দেবীর তখন দৃষ্টি পড়ে এই কোষ্ঠাম্পির উপর। অতি সুন্দর স্থান, ঐখানে অধিষ্ঠান করলে কেমন হয়? কিন্তু তখন ওখানে থাকেন আর এক অধিপতি, নাম—রৈনায়ং। এবার যুদ্ধ নয়,—দেবী তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। একদিন রাজা ভ্রমণে বার হন। দেবী মায়াজাল বিস্তার করে তাঁর মনে ভ্রান্ত ধারণা করান—তাঁর রাজ্য ও আত্মীয়-পরিজন সবই অগ্নিকাণ্ডে সহসা দগ্ধ হয়ে ভস্মীভূত হয়েছে। শোকে দুঃখে মর্মাহত রাজা সেইখান থেকেই বনবাসে চলে যান। দেবীও কোঠিতে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর বিগ্রহ স্থাপিত হয়ে মন্দিরও ওঠে। দেবী চণ্ডিকার মূর্তির চরণের নিকটে দশরামের সেই পুনর্জীবিতা কন্যার রৌপ্যময় এক প্রতিমূর্তিও স্থান পায়।

দেবী চণ্ডিকা চিরকুমারী।

ভাবি, ভারতের শীর্ষদেশে হিমালয়ে এই কুমারী দেবী। আবার সুদূর দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের তীরেও আর এক দেবী চিরকুমারী,—কুমারিকা। কিন্তু দুই দেবীর আখ্যান আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

কোঠীতে মন্দির একটি নয়। কয়েকটি-ই। আশপাশে ভাঙা মন্দিরের অংশও দেখা যায়। মূল মন্দির চণ্ডিকা দেবীর। কালিকা দেবীও আছেন। পাশেই কুণ্ডের ধারে শিবের ও ভৈরবের মন্দির। ছোট ছোট বহু দেব-দেবীর মূর্তিও দেখি! গণেশ ও সরস্বতী—দেখেই চেনা যায়। আবার, কোথাও বৌদ্ধধর্মচক্রও স্থান পায়। শিবলিঙ্গ ত থাকবেই,—বাণাসুরের দেশ! এ যেন এক বিচিত্রধর্ম-সমন্বয় ক্ষেত্র। কিন্তু, এক সময়ে সনাতন হিন্দুধর্মের যথেষ্ট প্রভাব নানা বিষয়ে পরিস্ফুট,—কতকগুলি দেবদেবীর মূর্তি তো আছেই, তাছাড়া মন্দির-কক্ষগুলির পরিকল্পনা, মন্দির-সংলগ্ন কুণ্ড; মন্দিরের ছাদে জলনিকাশের পথে কীর্তিমুখ, গজমুখের প্রতিকৃতি ইত্যাদি সমতল ভারতের শিল্পকলার কথা স্মরণ করায়। প্রচলিত প্রবাদের মধ্যেও এর ছায়া পাই। কুণ্ডটি পাথর দিয়ে বাঁধানো। লোকে বলে, পাণ্ডবরা এসে প্রতিষ্ঠা করেন। এ-পথে আর কোথাও পাণ্ডবদের কীর্তি-কাহিনী শুনি নি। তাই ভাবি, পাণ্ডবরা আবার হঠাৎ এখানে এলেন কোথা থেকে? চণ্ডিকার কাহিনীর মধ্যে হির্মা—তবে কি ভীমপত্নী হিড়িম্বা?—কিন্তু, তাঁর মন্দির ত দেখেছি কুলুভ্যালিতে মানালীর কাছে!

থাক ও-সব কাহিনী। কোঠির মন্দিরগুলি কাঠের। কারুকার্যও আছে। ঘরের দেওয়ালে রঙিন চিত্র কিছু আছে। কিন্তু চিত্রকরের নৈপুণ্যের প্রমাণ দেয় না। মনে হয়, হাল আমলের। তবে, পাথরের কয়েকটি মূর্তি সুন্দর ও প্রাচীনও। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে খ্রীষ্টাব্দ দশম শতকের শিল্পকলা। তিনি মনে করেন, সম্ভবত তিব্বতের ভোট-সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার পর এখানেও বৌদ্ধ-প্রভাব কমে আসে, এক হিন্দুরাজার রাজত্বেরও এখানে বিস্তার হয়।

ঘুরে ঘুরে মন্দির, মূর্তি সব দেখি। ছবি তুলি। তারপর ফিরে চলি আবার কল্পাতে।

॥ ১৩ ॥

বিকালে মিত্রের ঘরে যাই। গতকাল একবার এসেছিলাম। গলিপথে ঢুকে ঘর। নিকটেই তিব্বতী বস্তী। ঘরের মুখেই মিত্রের সঙ্গে দেখা। বলেন, এই ত! এসে গেছেন? কোঠি দেখে এলেন কেমন?

সাদরে ঘরের ভিতরে নিয়ে বসান। বলেন, এখন এক কাপ করে গরম চা, মন্দ লাগবে না। তারপর সন্ধ্যে হলেই খাওয়া যাবে। আমার সব 'রেডি',—আবার সেই সময়ে একটু গরম করলেই হোল।

কাঠের তৈরি ছোট্ট ঘর। 'প্যাকিং কেস্'-এর বড় একটা বাক্সও বলা চলে। একটি মাত্র দরজা ; জানালা নেই। হাত আষ্টেক লম্বা, হাত পাঁচেক চওড়া। কিন্তু, ছোট হলে হবে কি? গৃহবাসী থাকেন প্রাসাদ-বাসের আনন্দ নিয়ে। ঘরে ঢুকেই তা বোঝা যায়। মেঝেতে বিছানো স্থানীয় তৈরি পুরু কম্বল,—এখানে বলে গুদমা। খুব গরম। বসে আরাম ত আছেই, ঘরও গরম রাখে। যেন, একপাল ভেড়া মেঝে ভরে জড়সড় হয়ে চেপ্‌টে শুয়ে। কম্বলগুলির সুখ্যাতি করায় মিত্র হেসে বলেন, গরম নরম, সবই ঠিক;—কিন্তু পিশুর কামড়টা ত জানেন,—তাঁরাও আরামে আশ্রয় নেন ওরই ভেতর!

দেওয়ালের একপাশে গুটিয়ে রাখা বিছানা। ছোট্ট শেল্‌ফে খানকয়েক বই। দেওয়াল-আলনায় ঝোলানো দু'তিনটে জামা-কাপড়। কোণে একটা ব্যাগ্।

মিত্রও মেঝেতে বসে স্টোভ জ্বালিয়ে চা তৈরি করেন। হাতের কাছেই সব সরঞ্জাম। ঘরের আর এক কোণে দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা দুটো লম্বা কাঠের স্টীকস্। দেখে বলি, ও-দুটো ত "সিয়িং স্টীকস্" (ski-ing sticks)? শখ আছে নাকি?

উৎসাহে বলেন, শখ? ঐ ত আমার নেশা। বরফ পড়লে তখন আর আমাকে এখানে পায় কে? পাহাড়ের ঐ ওপর দিকে যা চমৎকার 'সিয়িং'-এর সুযোগ,—আমাদের দেশে অমন জায়গা বোধ হয় আর কোথাও নেই। তখন—বুঝলেন না—ঐ দুটো পরে বরফের ওপর দিয়ে কি আনন্দেই না দৌড়-ঝাঁপ হয়। একা—কোথাও কেউ নেই—সাদা ধব্‌ধব্ করছে চারিদিক—চোখের পলকে কোথা থেকে কো-থা-য় চলে যাওয়া! বিদ্যুৎ-চমক যাকে বলে! দু পায়ের তলায় ঐ দুটো বাঁধা,—দু হাতে দুটো—ঐ যে দেওয়ালে ঝোলানো লম্বা লাঠির মত, তলার দিকে ছুঁচাল লোহা দেওয়া, তার ওপর দিকে চাকার মত লাগানো,—ছোটার মুখে বরফে ঐ গেঁথে ভার সামলে নেওয়া, চট করে যেদিকে ইচ্ছে ঘোরা—আবার ওরই ওপর হাতের জোর দিয়ে চলার বেগে একেবারে শূন্যে লাফ—কোথায় ক-তো দূরে বরফের ওপর আবার নামা—উঃ! সে কী আনন্দ! সারা দেহে উত্তেজনায় রক্ত যেন টগ্‌বগ্ করে ফুটতে থাকে।

হঠাৎ থেমে যেন সজাগ হয়ে বলেন,—নাঃ,—আপনি দেখছি ঠিকমত করতে দেবেন না,—এ কাপটায় চিনি দিলাম এখনি, নয়?

ছোট ছেলের মত তাঁর মনখোলা আনন্দ ও উৎসাহ দেখে উপভোগ করি, জিজ্ঞাসা করি, এ শিখলেন কোথায়?
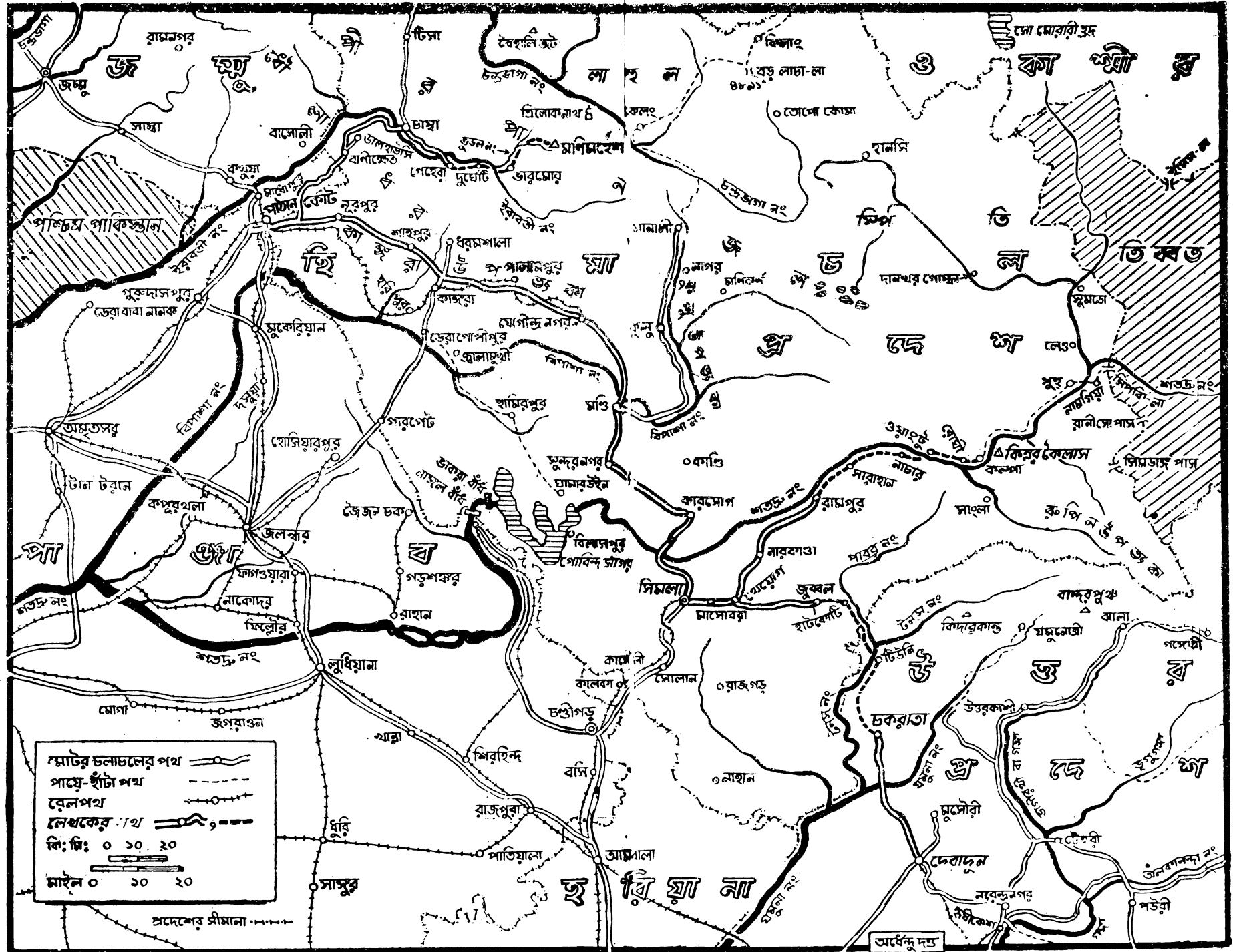
বলেন, এ কি এমনি হয়? শিখতে হয়েছে। বই আনিয়ে রীতিমত শিখেছি, 'প্র্যাক্‌টিস' করেছি, এই দেখুন না—বলে শেল্‌ফ্ থেকে দুটো বই নামিয়ে দেখান। Vivian Caulfield-এর Ski-ing Turns। পুরানো বই, হয়ত এ-বিষয়ে নামকরাও। অপরটি নতুন বই, Peter Lunn-এর।—বলেন, পিছনে বাইরে বারান্দায় গেলে দেখাব,—দুটো নতুন ski-ing sticks নিজের হাতেই তৈরি করছি,—প্রায় হয়ে এসেছে।

কৌতূহল হয়। প্রশ্ন করি, কখনও 'অ্যাক্‌সিডেন্ট' হয় নি?

"হয় নি আবার? দুটো হাঁটুই তো ভাঙা! ক'মাস প্লাসটার করে পড়েছিলাম। বিদেশে কম দুর্ভোগ!"

"তবু এখনও চালাচ্ছেন?"

"বাঃ! প্রাণ ত যায় নি এখনও,—বন্ধ করলেই হোল? ওঃ! যা আনন্দ—মানে 'থ্রিল' পাওয়া যায়! বোঝাই কি করে বলুন! মরতে ত একদিন হবেই। ছুরির ঘা-ও ত একবার খেয়েছি।—এরই ভয়ে ছেড়ে দেব?—ক্ষেপেছেন?"

মনে মনে ভাবি, ক্ষেপেছে কে?

মনে পড়ে, কলকাতায় একবারকার একটা ঘটনা। এক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের—তখন তাঁর সত্তরের কোটায় বয়স—হঠাৎ খুব অসুখ, খবর পাই। কলেরিক ডায়েরিয়া। সঙ্কটজনক অবস্থা। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের দারুণ দুশ্চিন্তায় দু'দিন কাটে। রোগের কারণও শুনি। কাঁটাল খেতে খুব ভালবাসেন। একা একটা মস্ত কাঁটাল শেষ করেছেন। এখন নিজেই শেষ হবার সামিল। ভাগ্য ভাল, কোনরকমে সামলে ওঠেন। আবার কাজকর্মও শুরু করেন। হঠাৎ একদিন দেখা। মাত্র সপ্তাহ দুই পরে। তখনও দুর্বলতা সম্পূর্ণ কাটে নি। হেসে বলি, কাঁটাল খেয়ে কি কাণ্ডটাই না বাধিয়েছেন! অবস্থা শুনে আমরা ত ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। একটা আস্ত কাঁটাল! একা খায় কখনও? দু'চার কোয়ার বেশি খাওয়ার কথাই ত ভাবতে পারি না।

তিনিও হেসে উত্তর দেন, খাব কাঁটাল,—তার আবার দু'চার কোয়া? আনুন না আবার ভাল রসিক কাঁটাল,—এখনি এইখানে বসে একটা কেন?—পুরো দুটো খেয়ে শেষ করব। আঃ, কী খেতে! মরতে তো একদিন হবেই—তার জন্যে কাঁটাল ছাড়ব? ক্ষেপেছেন?

মিত্রকে সেই পশমিনা চাদরের কথা স্মরণ করাই। বলেন, চেয়েছেন যখন পেয়ে যাবেনই। কালই খোঁজ করেছি। ভাগ্য ভাল। এক ছাত্রের বাড়ীতে একটা তৈরি হয়েছে—নিজেদের জন্যেই বোনা—তবে আমি বলেছি বলে দিতে রাজী হয়েছে। এখনি আসবার কথা।

ছাত্রটি আসে একটু পরেই। চমৎকার চাদর। মাখন রঙ, মাখনের মত নরমও। তেমনি মোলায়েম আর গরম। দেখে সন্তুষ্ট হই। জিজ্ঞাসা করি, কতো দিতে হবে—দামটা ঠিক করে দিন।

মিত্র বলেন, ওকেই জিজ্ঞাসা করুন।

ছাত্রটি আশি টাকা চায়।

কলকাতায় এমন জিনিস পাওয়াই যাবে না। যা পাওয়া যাবে তার দাম অনেক

বেশি-ই হবে, জানি। তাই সেদিক থেকে খুব সস্তা হলেও এখানকার দাম সম্বন্ধে কোনই ধারণা নেই। তাই মিত্রকে প্রশ্ন করি, কতো দেব? আশি টাকাই ঠিক নাকি?

তিনি মুখ তুলে বলেন, দেবেন? একশ' টাকা দিয়ে দিন।

চম্‌কে উঠি। শুনতে পান নি নাকি? বলি, ও ত আশি টাকা চাইলে!

তিনি অম্লান মুখে উদারকণ্ঠে জানান, হাঁ হাঁ, তা শুনেছি। চাইছে আশি—আপনি ফেলে দিন একশ'। আমি ঐ ভাবে ওদের টাকা দিই, কোথায় পাবে ওরা টাকা? আর টাকা থাকলেও কি আর সঙ্গে কারও যাবে?

আর কোন কথা না বলে, আশি টাকাই দিয়ে দিই।

সন্ধ্যায় আহার ভালই হয়। সেই ঘি-ভাত, মাশ্‌রুম্‌, মোহনভোগ—বাদাম কিসমিস্‌ দেওয়া। ভদ্রলোক রন্ধনপটু। ভোজন-বিলাসীও। মশলাপাতি দিয়ে মুখরোচক সুখাদ্য প্রস্তুত করেন। তবু, সভয়ে সাবধানে অল্পই খাই। বিদেশ-বিভুঁই, এমন নবাবী খাদ্য নিরীহ উদর সইবে কিনা কি জানি!

॥ ১৪ ॥

পর দিন। সারা সকাল ও দুপুর ঘুরে বেড়াই আনমনে বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে। কখন বড় দেওদারের শান্ত ছায়ায় পাথরের উপর বসি। পলকহীন নয়নে তাকিয়ে থাকি কিন্নর-কৈলাসের দিকে। শুনেছি, তিব্বতের কৈলাসের মত এই কৈলাসেরও পরিক্রমা হয়,—দল বেঁধে যাত্রীরা একসঙ্গে যায়। ভাবি, এ-জীবনে আমার আর হবার নয়। উদাস মনে দেখতে থাকি নীল আকাশের বুকে সেই শুভ্র তুষার শিখর, তারই মাথায় বাতাসে-ভেসে-আসা পুঞ্জিত মেঘের আনাগোনা। বাণাসুরের সেই শিবলিঙ্গের স্তম্ভটিও মাঝে মাঝে স্পষ্ট ফুটে ওঠে, কিন্তু রঙের কোন বৈচিত্র্য দেখি না।

আগামী কাল রামপুরের পথে আবার ফেরবার কথা। মালপত্র পাঠাবার আয়োজন আজই করতে হয়। স্কুলে যাই। মিত্রের সঙ্গে দেখা করি। তিনি শুনেই বলেন, এ ব্যাপারে আমার দ্বারা কিছু হবে না। ও-সব হাঙ্গামার মধ্যে আমি নেই। যা দিন-কাল—কোন মানুষকে বিশ্বাস করবার জো নেই। কোথায় আপনার মালের কি গোলমাল হবে,—কি দরকার আমার ওর মধ্যে থাকবার?

ভরসা দিয়ে বলি, গোলমাল হলে আপনার আবার দোষ কি? এদের ভাষা বুঝি না কিনা, তাই মাঝে দাঁড়িয়ে ব্যবস্থাটা যদি করে দিতেন,—তারপর যা হবার হোত,—এই বলছিলাম আর কি!

তিনি বলেন, ও-কথা বলছেন ত আপনি। কিন্তু মাল হারালে বা কোন কিছু গোলযোগ হলে—আপনার সঙ্গে ত তারপর আর দেখা হবে না—মনে মনে ভাববেন, ঐ মিত্রের জন্যেই এটা হোল। না মশাই, ও-সব অযথা দায়িত্ব ঘাড়ে নেবার মধ্যে আমাকে পাবেন না। খাসা আছি নিজের কাজটুকু নিয়ে। তবে একটা খবর দিয়ে দিই,—সকালেই দেখেছি একদল খচ্চর গেছে ওপর দিকে মিলিটারীর মাল নিয়ে। একটু পরেই তারা হয়ত ফিরবে

রামপুরের দিকে। চলে যান ওপরে বড় রাস্তায়, একটু অপেক্ষা করুন সেখানে, তাদের ধরতে পারবেন।—তবে মালপত্র বেঁধে সঙ্গে নিয়ে যাবেন, নইলে এরা দাঁড়াবে না—'মাল আনছি' বললে।

অগত্যা তাই করতে হয়। ভাবি, সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা ত করলাম। হোল না। যিনি করবার করিয়ে দেবেন নিশ্চয়।

পাঠাবার মালপত্র বড় রাস্তায় ফেগুকে দিয়ে আনিয়ে রাখি। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি পথের পাশে রাস্তার উপর দিকে চেয়ে, তীর্থের কাকের মত, কখন অশ্বতর বাহিনী আসে। ভাবি, আসবেই যে,—তারই বা ঠিক কি? বেলা বেড়ে যায়। তবু, দেখা নেই। হঠাৎ ভাল বেশভূষা পরা, লম্বা-চওড়া এক ভদ্রলোক অদূরে আসেন, দেখি—শহরের দিক থেকে। এগিয়ে এলে মুখ দেখে বোঝা যায় স্থানীয় লোক নন, পশ্চিম ভারতের বাসিন্দা হবেন। আমার দিকে তাকান। আমিও তাকাই। ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি ত এখানকার লোক নন দেখছি, যেমন ভাবে অপেক্ষা করছেন, কোন কিছু সাহায্যের দরকার নাকি?

ভাবি, এমনি অসহায় আমাকে দেখাচ্ছে বুঝি? কিন্তু ইনি কে? দেবদূত?

না। রাজদূত। পরিচয় পুলিস অফিসার।

দাঁড়াবার কারণ শুনে বলেন, একটা দলের এখনি ফেরবার কথা আছে, ঠিকই। ভাববেন না, ব্যবস্থা হয়ে যাবে—হঠাৎ চুপ করে কান খাড়া করে শুনেই বলেন, ঐ ত ঘণ্টার শব্দ! এখনি এসে যাবে।

দেখাও যায় তার পরেই। পথের বাঁকে খচ্চরের দল শব্দ করে এগিয়ে আসে। মনের ভাবনার মেঘ কেটে যেন রোদ ওঠে। কাছে এলে পুলিস অফিসার দলের সর্দারের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে দেন। সোজা রামপুরে নিয়ে যাবে। ভাড়া চায় পনেরো টাকা। অফিসার বলেন, লোকটাকে জানি, বললে দশ টাকাতেও যেতে পারে।

বলি, তা বলবেন কেন? পনেরো চায়,—তাই দেব, কম করার প্রশ্নই ওঠে না। তবে, মালগুলি যাতে রামপুরে পৌঁছেই পাই—ফরেস্ট দপ্তরের সেক্রেটারি বলিজি, তাঁর কাছে এরা মালগুলা জমা দিতে পারে—

তিনি বলেন, নিশ্চিন্ত থাকুন। ঠিক তাই পৌঁছে দেবে, তাঁকে চেনে এরা।

মালগুলি নিয়ে ওরা চলে যায়। আমারও কাঁধের মস্ত বোঝা যেন নামে। দেহ-মন হালকা মনে হয়। কিন্তু মানুষের জীবন-ধারা,—যেমন হিমগিরির বুকে মেঘের খেলা। রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি। এই দেখি সূর্যকরোজ্জ্বল দিন, আবার ঐ ছেয়ে আসে ঘনঘোরঘটা, গুরুগুরু তোলে ডম্বরুধ্বনি।

মাল চলে যাবার পর পুলিস অফিসারের সঙ্গে গল্প চলে।

বলেন, হিমালয় ঘুরতে এসেছিলেন? এমন আনন্দ কি আর কিছুতে আছে? যতোই ঘোরা যাক, দেখার শেষ যেন হয় না। কাজে-কর্মে আমাকে ঘুরতেও হয়ই, এমনিও সুযোগ পেলেই ঘুরি। হিমালয়ের শোভা,—এ কি বলে বোঝাবার? এই কিন্নর-অঞ্চলই দেখুন না,—কতো সুন্দর! ঘুরে ঘুরে দেখবার কতো জায়গা!

হঠাৎ মনে পড়ে ওয়াংটুর সেই পুলিস অফিসারের কথা। তাই হেসে বলি, আপনি বলছেন এই কথা। অথচ, ওয়াংটুতে আপনাদের এক অফিসার ত বার বার উপদেশ

দিলেন ফিরে চলে যেতে। বলেন, কেন কষ্ট করে এখানে আসেন? দেখবার আছে কি এখানে?

ইনি সব শুনে হেসে ওঠেন, বলেন, ও-রকম আছে দু'চারজন। হিমালয়ের সৌন্দর্য বোঝবার ক্ষমতা নেই,—কম দুর্ভাগ্য! তবে এ ব্যাপারটা কি, বুঝতে পারছি। সম্প্রতি যে নতুন সীমান্ত জেলা হোল—ভাইতে কর্মচারীদের কিছু রদবদল করতেই হয়েছে, এতে কারো কারো অসুবিধা হবার কথা, তাদেরই কেউ হয়ত মনের জ্বালাটা এইভাবে প্রকাশ করেছে। কিন্তু ও কথা থাক, আপনি এতোদূর এসে চিনি থেকেই ফিরে চললেন, আরও এগোলেন না কেন? আরও ওপরে গেলে আনন্দ পেতেন, দৃশ্যেরও তফাৎ দেখতেন—তারপরেই ত বরফের রাজ্য,—পাশ পার হলেই তিব্বত। এখান থেকে যতোই এগোবেন ততই দেখবেন তিব্বতী প্রভাব বেড়ে চলেছে, লোকের মুখেও ভোট ভাষা, বেশভূষাও তেমনি। চলুন, যাবেন আমার সঙ্গে? দুদিন পরেই যেতে হবে আমাকে ঐদিকে।

শুনেই মন নেচে ওঠে। একটু আগে খচ্চরের পিঠে মালগুলি পাঠিয়ে দেওয়ায় মনের পরম নিশ্চিন্ত ভাব নিমেষে মিলিয়ে যায়, অনুশোচনায় মন ভরে ওঠে। বলি, প্রস্তাবটা একটু আগে করলেন না? বিছানা, কাপড়-জামা সব চলে গেল, না হলে এমন সুযোগ কখনও ছাড়ি?

তাকিয়ে দেখি বহু নীচে শতদ্রুর উপত্যকার পানে। ধীরে ধীরে বলি, কতো কীই না দেখা বাকি রয়ে গেল! তবে দুঃখ নেই তাতে। এরপর যাঁরা আসবেন, ঐ নীচে সাট্‌লেজের ধার দিয়ে—মোটরে চড়ে—সিমলা থেকে হয়ত একদিনেই এগিয়ে যাবেন আরও ওপরে, অনেক কিছু দেখে দুদিনেই আবার সিমলা পৌঁছে যাবেন আরামে। তারপর থেমে বলি, তাঁরা দেখবেন নিশ্চয়ই বেশি, কিন্তু এ-পথে এমনভাবে হেঁটে আসার আনন্দের স্বাদ কি তাঁরা আর পাবেন?

থাক এখন ও-সব মিথ্যা ভাবনা, তিব্বতের সামান্য অভিজ্ঞতার যে পুঁজিটুকু আছে, তাই সম্বল রইল।

অফিসার হঠাৎ প্রশ্ন করেন, বৈষ্ণো দেবী গেছেন নিশ্চয়?

"বৈষ্ণো দেবী! সে আবার কোথায়?"

"হিমালয়ে ঘোরেন, বৈষ্ণো দেবী দর্শন করেন নি! অবাক করলেন যে! আমি তো প্রতি বছরেই যাই। শুধু আমি কেন? এ-রকম হাজার হাজার লোক পাবেন, যাঁরা ফি বছর যান-ই। অদ্ভুত স্থান। সে কী অনুভূতি! গিয়ে দেখে আসুন। জম্মু থেকে যেতে হয় পাহাড়ের ওপর। বিচিত্র এক গুহা। তারই মধ্যে দেবীর অধিষ্ঠান।

বলি, এবার যখন যাবেন, একটা পোস্টকার্ড লিখে জানাবেন, যেখানে বলবেন সেইখানে গিয়ে যোগ দেব, দেখে আসা যাবে।

তিনিও সানন্দে রাজী হন। কাগজ পেনসিল বার করে দেন, বলেন, দিন আপনার নাম-ঠিকানা লিখে, খবর পাবেন ঠিক।

লিখে দিই। কিন্তু, এতো বছর গেলেও খবর কোন আসে নি। জানি না, তিনি আছেন কিনা, বা কি কারণে লেখেন নি।

অবশ্য বৈষ্ণো দেবীর দর্শনলাভ তার কয়েক বছর পরেই আমার ঘটে যায়। যাত্রায়

প্রকৃতই আনন্দ পাই ; সেই অফিসারের কথা স্মরণও করি। কিন্তু সে কাহিনী এখন থাক।

সেই নাম-ঠিকানা লেখা কাগজখানি তাঁর হাতে যেতে যা ঘটে তাই লিখি।

লেখাটা পড়েই আমার দিকে চোখ তুলে তাকান। সাগ্রহে প্রশ্ন করেন কিছু মনে করবেন না, ব্যক্তিগত একটা প্রশ্ন করছি,—ডাক্তার মুখার্জি আপনার কেউ হতেন? নামের মিল দেখেই কথাটা মনে হোল।

তাঁকে সম্পর্ক জানাই। বলি, পরিচয় ছিল নাকি?

তাঁর মুখমণ্ডল সহসা গম্ভীর হয়। চোখে-মুখে কীসের যেন ছায়া নামে। কণ্ঠস্বরও মৃদু হয়। ধীরে ধীরে বলেন, পরিচয়? তাঁকে চিনতো না, এমন কে আছে? দূর থেকে দেখতাম, বক্তৃতাও শুনেছি,—দূর থেকেই শ্রদ্ধা জানাতাম,—দেশের অতো বড় সত্যিকারের বন্ধু। কিন্তু সে কথা নয়;—একবারই তাঁর অতি নিকটে আসার সৌভাগ্য হয়,—অথচ, সেইটেই যে জীবনের এত বড় হয়ে থাকবে, তা কি জানি! আপনাকে বলব? হাঁ, তাই বলি, নইলে আপনার সঙ্গে এমনভাবে এখানে দেখাই বা আজ হয় কেন?

চুপ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে শুনতে থাকি।

তিনি তেমনি ধীরে ধীরে বলতে থাকেন, সেদিনের ঘটনা—এখনও চোখের সামনে ভাসে।

কাশ্মীরে চলেছেন তিনি। তাঁর সেই শেষ যাত্রা। তখন কি আর তা জানি! হুকুম পেয়েছি, পথে ট্রেনে তাঁর কামরায় তাই উঠতে হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে। কী প্রাণবন্ত বিরাট পুরুষ! ডাঃ মুখার্জি আমাদের দেখেই হেসে বলেন, কি? ওয়ারেণ্ট আছে—অ্যারেস্ট করার?—আমরাও হেসে তাঁকে জানাই, না, না,—হুকুম এসেছে, আপনার কাশ্মীর যাত্রার কোন অসুবিধে না হয়, তারই খোঁজখবর নেওয়ার।—তিনি সাদরে বসতে বলেন। অথচ, আমরা তখন জানি, কাশ্মীরে ঢোকা মাত্রই তাঁকে আটক করা হবে,—সব বন্দোবস্ত তৈরি।

তিনি চুপ করেন। আবার অস্ফুটস্বরে বলেন, এত বড় মর্মান্তিক ছলনা! জীবনে এ প্রচণ্ড দুঃখ ঘোচবার নয়।

নির্বাক হয়ে শুনি। স্তম্ভিত হয়ে ভাবি, জগৎ কতোটুকু! কোথাকার হাওয়া কোথায় ভেসে আসে! কাশ্মীরের বন্দীগৃহ থেকে মেজদাদার মরদেহ যখন কলকাতায় ফিরে আসে, সেই সঙ্গে তাঁর সামান্য কিছু কাগজপত্রও পাওয়া যায়। তারই মধ্যে তাঁর লেখা এক বিবরণীতে এই রকমই এক ঘটনার ইঙ্গিত ছিল বটে।

মাথা নত করে অফিসার দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলেন, আসবেন আমার ডেরায়—এই নিকটেই?

তাই যাই।

সন্ধ্যায় ফেরবার সময় বাংলো পর্যন্ত এগিয়ে দেন। বলেন, বিছানাপত্র ত সব পাঠিয়ে দিলেন, কি কাছে রেখেছেন জানি না। তাই দুখানা কম্বল আপনার ঘরে ইতিমধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছি,—শীত রয়েছে বেশ,—কোন কষ্ট না হয় আপনার।

॥ ১৫ ॥

ভোরে ফিরে চলি।

আলো ফোটে। কিন্তু পথে লোক নামে নি। অলস শয়নে গ্রাম যেন এখনও চোখ বুজে শুয়ে।

মিত্রের গলিপথের নিকট চলি। ভাবি, যাবার আগে শেষ বিদায় নিয়ে যাই। যদিও কালই ঐ পালা সাঙ্গ করেছি। তখন বলি, অতো ভোরে আর সময় হবে না।

তবু, মন টানে। ঘরের সামনে দাঁড়াই। দরজা বন্ধ। হয়ত ঘুম ভাঙে নি। সঙ্কোচভরে আস্তে ডাকি। তখনি সাড়া দিয়ে বেরিয়ে আসেন। উল্লসিত হয়ে বলেন, এই ত! এসে গেছেন! একেবারে তৈরি হয়ে বার হয়েছেন নাকি? আমারও ঘুম ভেঙেছে আজ অনেক আগে। ভাবছি হয়ত চলে গেলেন এতক্ষণ। আর দেখাই হবে না কখনও। কি আর করি? সেই স্টীক দুটো তৈরি হতে আর অল্পই বাকি, চা খেয়ে তাই সেরে ফেলি। গরম জল রেডি—চলে আসুন ভেতরে, চা খাইয়ে তবে ছাড়ব।

বলি, না, দেরি হয়ে যাবে। চা খেয়েই যাত্রা করেছি।

কোনমতেই শোনেন না। তখনি চা তৈরি করেন। নতুন এক প্যাকেট বিস্কুট খুলে খেতে দেন। ফেণ্ডুকেও ডেকে খাওয়ান। আবার বিদায় নিয়ে রওনা হবার সময় জোর করে বিস্কুটের প্যাকেটটা ফেণ্ডুর পিঠের ঝোলার মধ্যে ঢুকিয়ে দেন, বলেন, পথে কোথায় কী পাচ্ছেন? পাহাড়ে চলবেন, খিদে পাবে—খাবেন কি?

থাকুক সঙ্গে। ক'টাই বা আছে ওতে? ভাবি, প্রীতির দান,......কখনও কি তার পরিমাপ থাকে!

গ্রাম ছেড়ে এগিয়ে চলি। ফিরে ফিরে তাকাই। গ্রামের দিকে নয়। মাথা তুলে দেখি দূরে কিন্নর-কৈলাসের পানে। প্রভাতে সুনীল উদার আকাশ। শুচিশুভ্র তুষার-শিখর। মহামৌনী ধ্যানমগ্ন যোগীবর। জ্যোতির্ময়, অচল, অটল।—মাথা নত করে প্রণতি জানাই।

আবার চলতে থাকি। আবার ফিরেও দেখি। পাহাড়ের অন্তরালে বোধ করি সূর্য ওঠার সময় হয়। দিকে দিকে আলোর আহ্বান ছোটে। নীল আকাশে সাদা মেঘ ভেসে আসে। নীল সাগরে পাল তুলে যেন নৌকোর বাহিনী চলে। শিখরদেশের আশেপাশে ঘিরে থাকে।

হঠাৎ দেখে চমকে উঠি। বাণ রাজের শিবলিঙ্গের মাথায় কে যেন দীপ জ্বালে! থর-থর রাঙা শিখা কাঁপে। প্রদীপ আড়াল করে ঐ বুঝি বা কেউ শিবের গলায় ফুলের মালা পড়ায়! গোলাপী, নীল, বেগুনী—কতো রঙের দীপ্তি!

পরম বিস্ময়ে দেখতে থাকি। সেই স্তম্ভের উপর রঙের বিচিত্র খেলা। ফেন স্ফটিকের মধ্যে রঞ্জন-রশ্মির বিচ্ছুরণ। স্বপ্ন নয়। মায়া নয়। বিশ্বশিল্পীর আলোক-লীলা। সারা-দেহে রোমাঞ্চ জাগে।

মনে আসে কবি বিহারীলালের লেখা ঃ

হিমাদ্রিশিখর পরে
আচম্বিতে আলো করে
অপরূপ জ্যোতি ওই পুণ্য তপোবনে!

ভাবি, এ কয়দিন ত এমন রূপ দেখা যায় নি! কি জানি হয়ত, আলোক, মেঘ, আবহাওয়া—সব-কিছুর যথাযথ সমাবেশই এই অপূর্ব দেবারতির আয়োজন করে।

দেবতার এই উৎসব-প্রাঙ্গণের সুদূর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকি। আনন্দ-সজল নয়নে নির্নিমিখ দেখতে থাকি এই দিব্যদৃশ্যের দিকে।

প্রাণে যেন শুনি, আলোর ভাষায় কী যেন আশার বাণী। চারিদিকে হিমালয়ের উত্তুঙ্গ পর্বত,—সীমাহীন উত্তাল সাগর। সহস্র তরঙ্গের উচ্ছ্বাস তুলে অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে থাকে। সেই মহাসমুদ্রে আকাশের কোলে আলোকস্তম্ভে জ্বলে ওঠে অভয়-আলোক-শিখা,—পথভ্রান্ত যাত্রীর বুকে সাহস জাগায়, দিশাহারা মানুষকে পথের সন্ধান দেখায়।

সেই জ্যোতির্দেবতার চরণে রেখে আসি আমার প্রণাম।